নেফার অরণ্য

বাসুদেব বসু

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা বারো

প্রথম প্রকাশ : ফাল্গুন ১৩৫৭

প্রকাশক
ময়ূখ বসু
বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

মুদ্রাকর :
শ্রীঅনিলকুমার ঘোষ
শ্রীহরি প্রেস
১৩৫-এ, মুক্তারামবাবু স্ট্রীট
কলিকাতা-৭

প্রচ্ছদ :
মৃত্যুঞ্জয় মুখার্জী

শ্রদ্ধেয়

ডঃ প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত

করকমলেষু

প্রথম পরিচ্ছেদ

নেফার সিয়াং ডিভিসানের ইয়ামবুং জঙ্গলে আবহাওয়াটা কেমন যেন অস্বস্তিকর। অরণ্য আর অরণ্য। নেফার সারাটা বুক জুড়েই অরণ্য। পাহাড় আর পর্বত। রৌদ্রে ঝলসে যাচ্ছে পথ প্রান্তর। গুমোট আর ভ্যাপসা গরমে কুকুরের মতো ধুঁকছে আর হাফাচ্ছে। এদিকে সঙ্গী দুশমনটা গর্জাচ্ছে। মাঝে মাঝেই হাঁক ডাক ছাড়ছে। দুপুরের রৌদ্রদীপ্ত আকাশটায় সন্ধানী দৃষ্টি চালিয়ে এফোড় ওফোড় করে ফেলছে মনুষ্যরূপী দৈত্যটা। গায়ে-গতরে ইয়া দশাসই চেহারা। জোয়ান, জাঁদরেল, আর গাট্টাগোট্টা। বিরাট আর বীভৎস। শাণিত চক্ষুর ছটা ঘুরোচ্ছে এধার থেকে ওধার। নজর হানছে সারাটা আকাশের চত্বরে, বিশাল বারিধির বুক জুড়ে বিরাজমান নিকষ কালোর পরদা ভেদ করে। মসীলিপ্ত অবগুণ্ঠনের ভেতর দিয়ে জাহাজের সারেঙ যেমন সার্চ লাইটের দীপ্তিছটা ঘুরোয় এধার থেকে ওধারে। সন্ধান করে তটভূমির; এও ঠিক তেমনি। নীলিমায় নীল আকাশটার বুক জুড়ে ভেসে বেড়াচ্ছে মেঘগুলো। পেঁজা সাদা তুলোর রাশি। তারই আড়ালে আবডালে চলছে লুকোচুরি খেলা। দুটো ফুটকি। একটা বেশ বড়ো। আর একটা খুবই ছোট। ফুটকি দুটো কখনো ঘুরপাক খাচ্ছে। কখনো ডিগবাজী খাচ্ছে। গোত্তা মেরে কয়েক শ ফুট নীচে নেমেই আবার হুট্ করে ওপরে উঠে যাচ্ছে। অদৃশ্য হচ্ছে মেঘের ফাঁকে। পরমুহূর্তে বেরিয়ে আসছে। চোখ দুটো হাতের পাতা দিয়ে আড়াল করে দূরবীন্ দৃষ্টি চালাচ্ছে দৈত্যটা। মুখের রেখা বলয়ের ভাঁজে ভাঁজে আত্মপ্রত্যয়ের ছাপ। প্রতি পদক্ষেপে দৃঢ়তা পরিস্ফুট। চলনে বলনে দৈত্যই বটে।

চনচনে রৌদ্র পথে-ঘাটে, মাঠে-প্রান্তরে আগুন ছড়াচ্ছে। জঙ্গলের পথে অনেকটা দূর পাড়ি দিয়েছি। আমি শ্রান্ত, ক্লান্ত। পেটে আমার চনমনে ক্ষিদে। নিস্তব্ধ, নিঝুম মধ্যাহ্ন। ক্লান্তি আর অবসাদ যেন অরণ্যের গায়ে লেপটে রয়েছে। জড়িয়ে রয়েছে বন্য জন্তুজানোয়ারগুলোর মুখে চোখে। দৈত্যটার পরনে ব্যাঘ্র ছাল। মাথায় আকন্দফুলের মুকুট। গলায় রক্তজবার মালা। বেতের খাপে ঝকঝকে দা। বেতের ষ্ট্র্যাপ্‌ শরীরের সঙ্গে অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ। এরা দা' এর এক কোপে চিতাবাঘের গলা দুফাঁক করে দেয়। কখনো অজগরকে কুচিকুচি করে। বনের পথে এগুতে গিয়ে ওটার সাহায্যে আগাছা আর বন্য লতাপাতার জঙ্গল সাফ করে নেয়। আমি ওর সঙ্গে ধুঁকতে ধুঁকতে চলেছি। আমাকে সঙ্গে নিয়ে দৈত্যটা জঙ্গলের একটা প্রকাণ্ড অংশ প্রায় চষে ফেলেছে। ইয়ামবুং জঙ্গলটা ঘুরে ফিরে দেখবো মনে এই সাধ নিয়ে ওর সঙ্গী হয়েছিলাম। সার্কেল অফিসার সমাদ্দার সাহেব ওর হাতে আমাকে সঁপে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছিলো। জঙ্গলের পথে ও ছিলো আমার গাইড। আমি কিন্তু হাড়ে-হাড়ে টের পেয়েছিলাম কার হাতে পড়েছি। ভালো করেই চিনেছিলাম আমার সঙ্গীটিকে। জঙ্গলের পথে যেখানে প্রতি পদক্ষেপে ডিঙোতে হয় বাধা বিঘ্ন, সেখানে হরিণের চাইতে ওর ক্ষিপ্রগতি। বাঘের চাইতে ও কম দুর্ধর্ষ নয়। ওর শরীরে বাইসনের শক্তি। জঙ্গলটা যেন ওর জমিদারী। আমি এ জঙ্গলে টুরিস্ট নই। আমি যেন এসেছি ওর তাঁবেদারি করতে। ওর সঙ্গে অন্তরঙ্গতা গড়ে তোলা অসম্ভব। মোকাবিলা চিন্তার বাইরে। নেহাতই দুঃস্বপ্ন। ও চলতে চলতে সামান্য কারণে বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। আবার অতি সামান্য কারণে উল্লসিত হয়ে ওঠে। শুধু রক্ষে দুঁদে অফিসার সমাদ্দার সাহেব ওকে বলে কয়ে দিয়েছিলো। সামনে যতোদূর দৃষ্টি যায় শুধু দিগন্ত প্রসারিত জঙ্গল। জনমানবহীন। লোকালয়ের

কোনো চিহ্ন নেই। পাথরের বুকে প্রতি পদক্ষেপে চমকে উঠি। ওর ছোটো ছোটো চোখ দুটো অনবরত ঘুরপাক খাচ্ছে। শাণিত দৃষ্টি। কানের বিরাট ফুটো দুটোর ভেতর পশুপাখীর হাড় গোঁজা রয়েছে। পুরু ঠোঁট দুটোর আড়ালে মাঝে মাঝে হাসির ঝিলিক খেলে যায়। আমার অসহায় অবস্থা দেখে কিনা কে জানে। ওর গুম্ফদেশ কেশ বিরল। সেখানে দাঁড়িয়ে দু-চারটে হাওয়ায় আন্দোলিত হচ্ছে। বেলাভূমিতে লোকবিরল প্রান্তরে দু-চারটে খেজুর আর নারকেল গাছ হাওয়ায় যেমন আন্দোলিত হয়। দাদে দাদে ছেয়ে গেছে গোটা শরীরটা, কণ্ডূয়নের দাপটে দেহ চৌচির আর রক্তাক্ত। পায়ের নীচেকার রুক্ষ লাল মাটির মতো। অসমতল মৃত্তিকা রোদে তেতে-ফেটে ওঠা। টুটি ফাটা। দীর্ণবিদীর্ণ কুমীরের পিঠের মতো অনেকটা। সারা অঙ্গে ঘা নিয়ে ঘেয়ো কুকুরটার মতো। এ অঞ্চলটায় আদিদের বাস, আদিদের অনেক শাখা-প্রশাখা। এ লোকটা কোন্ শাখার অন্তর্ভুক্ত বলা মুস্কিল। এ মিনিয়ঙ্ না পদম্? পাশি না পাঙ্গি। সিমঙ্ না বরি। আশিঙ্ না তান্গাম্। বলা মুস্কিল। আরো অনেক ট্রাইব রয়েছে। গালঙ্, রমো, বোকার আর পালিকেশ। ওর মাথায় বাটি ছাঁট। চুল ছোট ছোট করে ছাঁটা। দেখলে বেশ বোঝা যায় যে ও গালঙদের শ্রেণীভুক্ত নয়। গালঙ্ ট্রাইবের লোকেরা মাথায় লম্বা চুল রাখে। মাথায় ঝুঁটিবাধা লোকেরও অভাব নেই। জঙ্গলের পথে অনেক দূর থেকে পায়ে হেঁটে ওরা এসে উপস্থিত হয়। পাড়ি জমায় নিশ্চিন্ত নির্ভয়ে। বেশ আরামে আর আয়াসে। দুদিকে সুউচ্চ পাহাড়ের মাঝখানে এ উপত্যকা। আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের সময় উত্তপ্ত লাভা বেরিয়ে আসার পথে বাধা পেয়ে ভূত্বকের নীচে জমা হতে হতে উঁচু হয়ে ওঠে। তারই ফলে ওই স্থানের কতক অংশ মাটি থেকে উঁচু হয়ে সৃষ্টি করে স্তূপাকৃতি পর্বতের। মরা বিশীর্ণ

নদীটা মুখ থুবড়ে পড়ে কাঁদছে। অনেকটা লোক দেখানো কান্নার মতো। ও ভালো করেই জানে ঘণ্টাকয়েক পরে বরফগলা জলে আর বৃষ্টির জলে ও ষোলোকলা পূর্ণ হয়ে উঠবে। পাহাড়ী নদীর ধারা আর রীতিনীতিই ওই রকম। এখন ওর শুষ্ক চোখ। জলের নিতান্ত অভাব। বিগতযৌবনা নারী কণ্ঠে নুড়ির হার জড়িয়ে কাঁদতে সুরু করে দিয়েছিলো। কোনো এক সময়ে ক্ষুব্ধ আক্রোশে আর অভিমানে ছিঁড়ে ফেলেছে কণ্ঠের হার। নুড়িগুলো এলোপাথাড়ি ইতস্তত ছুঁড়ে মেরেছে। সীমারেখা আর শৃঙ্খলার ধার ধারেনি।

ছড়িয়ে ছিটিয়ে একাকার। বৃহৎ, ছোট আর মাঝারি। নানা আকারের পাথর, শেওলা যার অঙ্গপ্রত্যঙ্গে লেপটে রয়েছে। আষ্ঠে-পৃষ্ঠে মেখেছে প্রাগঐতিহাসিক জন্তু জানোয়ারের পদছাপ। শম্বরকে তাড়া করেছে চিতাবাঘ। প্রাণভয়ে শম্বর দৌড়ুচ্ছে। প্রস্তরের বুকে তুলেছে পদধ্বনি। গাছের গুঁড়িতে প্রকাণ্ড শিং ঘষছে বাইসন। শিং-এ জড়ানো লতাপাতা থেকে মুক্ত হবার জন্যে না আক্রোশে? কে জানে? অজগরের কঠিন নিষ্পেষণে শূকর ছানার চোখ আর জিহ্বা বেরিয়ে এসেছে। চূর্ণ হচ্ছে হাড়।

চড়াই আর উতরাই। উতরাই আর চড়াই। ভাঙতে হচ্ছে ঘন ঘন। গাছগুলো পায়ে চলা পথের ওপরে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে। বনের গর্ভে কোথাও অন্ধকার। গাছে গাছে ঢেকে ফেলেছে চারধার। সূর্যের আলো পথ না পেয়ে হয়রানি হচ্ছে। উৎরাই নেমে এলো একটা ঝরণার ধারে। ঝরণাটা প্রায় হাজার খানেক ফিট ওপর থেকে সশব্দে নীচে আছড়ে পড়ছে। গম্ভীর গর্জন তুলে নীচে পড়ে ছড়াচ্ছে হাজারো জলবিন্দু। মুক্তোরই সামিল। ছুটোচ্ছে এদিক ওদিক। সূর্যের আলো পড়ে নানা রঙবেরঙের সৃষ্টি করছে। ঝর্ণা থেকে জল গড়িয়ে এসে পাথরের পাশে পথ খুঁজে নিয়ে জমা হয়েছে খানিকটা দূরে। জল জমে

আছে অনেকটা জায়গা জুড়ে। বেরোবার পথ নেই। নিথর কালো জল। কতোটা গভীর কে জানে। পাহাড়ের সারি চারদিক ঘিরে রয়েছে। শেওলার আচ্ছাদনে ঢাকা পাহাড়গুলো জলের ওপর ছায়া ফেলেছে।

কোনো স্থানে জলের ওপর পাহাড়ের চূড়োগুলো জেগে রয়েছে। শান্ত, সমাহিত, অতন্দ্র পাহারায় নিমগ্ন। বন্‌জ সম্পদের অভাব নেই। হাজার হাজার কলাগাছ জঙ্গলের ভেতর বেড়ে উঠেছে। কলার কাঁদি থেকে কলাগুলো পেকে পচে মাটিতে ঝরে পড়ছে। পাকা কাঁঠালের গন্ধে বনভূমি আমোদিত। আম, জাম, জামরুলের গাছ। বনের পশুপাখী ছাড়া খাবার লোক নেই। মুখ কালো আর শরীরের পেছন দিকটা লাল দু'দল হনুমান একটা খোলা জায়গায় সমবেত হয়েছে। ফুস্‌ছে, গর্জাচ্ছে। বিচিত্র মুখভঙ্গী করছে। বুক চাপড়াচ্ছে। লাঙ্গুল আছড়াচ্ছে। পরস্পর পরস্পরকে যুদ্ধে আহ্বান করছে। দু'দলের ভেতর সংঘর্ষ বেঁধে ওঠবার আর বেশী দেরী নেই। সংঘর্ষ বেঁধেছে এক সুন্দরীকে নিয়ে। সুন্দরীশ্রেষ্ঠা মেয়ে হনুমান। যুবকদের চোখের মণি মিস্‌ ইয়ামবুং। পরম উদাসীনভাবে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে। ওদের চ্যালেঞ্জ, গজরানি, কাতরানি সব উপেক্ষা এবং তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে পরম নির্বিকার অবস্থায় গা, বগল, হাঁটু চুলকোচ্ছে। লোমের ভেতর থেকে উকুন আর নানারকম পোকামাকড় বের করছে আর টপাটপ্‌ গিলছে। এদেরই পূর্ব্বপুরুষদের বংশধর ক্লিওপেট্রা, হেলেন অব ট্রয়, সীতা, দ্রৌপদী, সংযুক্তা, পদ্মিনী, মমতাজ, নূরজাহান, রাণী অব ঝান্সি, এলিজাবেথ টেলর এবং মিস্‌ ইউনির্ভাস্‌, ১৯৭০। মানুষগুলোও কম যায় না। জিভ চাটতে। নখ দিয়ে খিমচোতে, তোষামোদ আর চাটুকারিতায় পুরোপুরি অভ্যস্ত। হস্তী যূথপতি বাঁশ ঝাড় থেকে বাঁশ ওপড়াচ্ছে। তার নিনাদে বনভূমি মুখরিত। মট্‌মট্‌ শব্দ করে ডালপালা ভাঙ্গছে। চড়াইয়ের নীচে পাহাড়ের

পাদদেশে বাঁশের ঘরটাতে দৈত্যটা আমাকে নিয়ে এসে থেমেছে। সেখানে নিভু নিভু আগুনটাকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে বাঁশ, খড়, কাঠ, লতাপাতা গুঁজে গনগনে করে তোলার চেষ্টা চলছে। দৈত্যটার সাথী-সঙ্গী রয়েছে নিশ্চয়। যাবার আগে আগুনটাকে জ্বালিয়ে রেখে গেছে। শূকরটার ছাল ছাড়িয়ে রেখে গেছে। ছাল ছাড়ানো শূকরটাকে দৈত্যটা আগুনের আঁচে বেশ করে ঝলসিয়ে নিচ্ছে। ওর সঙ্গে রয়েছে বাঁশের চোঙএ আপঙ (স্থানীয় মদ)। দৈত্যটা আকাশের দিকে দূরবীন্ দৃষ্টি চালিয়ে যাচ্ছে। কালো ফুটকি দুটো ক্রমশ বড়ো হচ্ছে। বেশ বোঝা যায় আকাশের বুকে দুটো পাখী তীব্রগতিতে উড়ে যাচ্ছে। পাখী দুটো বড়ো হচ্ছে ক্রমশ। ঈগলটা প্রবল বিক্রমে চিলটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। চিলটা বৃথাই চেষ্টা করলো পালিয়ে যাবার। এতক্ষণ সে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছিলো। ফাঁকি দিচ্ছিলো ক্রুদ্ধ ঈগল পাখীটাকে। ঈগলটার আওতার বাইরে বেরিয়ে যাবার জন্যে বৃথাই চেষ্টা করছিলো। আত্মরক্ষার জন্যে আকাশের বুকে যতোরকম ছলচাতুরীর চেষ্টা তা সে করবার কসুর করেনি। চিলটা কখনো কখনো মেঘের আড়ালে আত্মগোপন করবার চেষ্টা করেছে। পারেনি। কখনো গোত্তা খেয়ে মুহূর্তে শ কয়েক ফিট নীচে নেমে পরক্ষণেই শ কয়েক ফিট ওপরে উঠে গেছে। উদ্দেশ্য ঈগলটাকে হয়রানি করে মারা। ঈগলটার বিরাট দেহ নিয়ে অসুবিধে রয়েছে অনেক। চিলটার সে অসুবিধে নেই। তবু সে সুবিধে করতে পারেনি। ঈগলটার গতিবেগের কাছে সে হার মানতে বাধ্য হয়েছে। এর পর ঈগলটার চারদিকে সে চক্রাকারে ঘুরতে চেষ্টা করেছে। কিন্তু ঈগলটা অনেক বেশী ক্ষিপ্র। ওড়বার, গোত্তা খাবার, ডানায় ভর করে আকাশের গায়ে সাঁতরিয়ে বেড়াবার শক্তি তার অসাধারণ। চিলটা আত্মরক্ষা করতে শেষ পর্যন্ত অসমর্থ হয়েছে। আকাশের বুকে ঈগলটা নির্মম আক্রোশে চিলটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। আর

পড়েই ধারালো সুতীক্ষ্ণ চঞ্চু দিয়ে ওর টুঁটি চিপে ধরেছে। নখে বিদ্ধ করেছে দেহটা। আর ওই অবস্থায় ডিগবাজী খেতে খেতে আকাশ পথে বায়ুস্তর ভেদ করে ক্ষিপ্রগতিতে নেমে এসেছে। তীব্র তার গতি। দৈত্যটা ঘন ঘন দূরবীন্ দৃষ্টি চালাচ্ছে। ওর সারা মুখ প্রশান্ত হাসিতে ভরে উঠেছে। ওর মুখ থেকে তীব্র হুইসেল ধ্বনি নির্গত হয়ে বাতাসকে খান্ খান্ করে দিচ্ছে। হুইসেলের তীব্র কর্কশ ধ্বনি বাতাসের স্তর ভেদ করেছে আর সেই শব্দতরঙ্গ ভরসা করে গোত্তা খেতে খেতে, ঘুরপাক দিতে দিতে ঈগলটা নামছে। নামছে আর নামছে। চঞ্চু আর নখে বিদ্ধ রয়েছে চিলটা। তার কাছে দেখাচ্ছে এই এতোটুকুন। সঙ্কেতধ্বনিতে ঈগলটা পথের নিশানা পেয়েছে। গন্তব্য স্থানে পৌঁছুতে আর অসুবিধে কোথায় ? অরণ্যের গাছপালার মাথা ডিঙ্গিয়ে মিনিট কয়েকের ভেতর ঈগলটা এসে দৈত্যটার পায়ের কাছে ঝুপ করে নেমে পড়ে। মাটিতে দাঁড়িয়ে ডানা ঝটপট্ করতে থাকে। সোনালী ঈগল। প্রকাণ্ড ডানা। বিস্তার করলে ডানার পরিধি একদিকে সাড়ে তিন ফিটের কম হবে না। ঈগলটার চোখ আর নাকের কাছটা হলুদ। শরীরের কোথাও ধূসর আর বাদামীর সংমিশ্রণ রয়েছে। বাকীটা শরীরে যেন কাঁচা সোনা ঢেলে দেওয়া হয়েছে। নখে বিদ্ধ চিলটা যন্ত্রণায় ছটফট করছে। চেষ্টা করছে ঈগলটার নাগপাশ থেকে নিজেকে মুক্ত করতে। নখ আর ঠোঁটে চিলটা জখম হয়েছে বটে। কিন্তু জখম গুরুতর নয়। গলার কাছে পালকে আর পাখনায় কয়েক ফোঁটা রক্ত জমাট বেঁধেছে। ঈগলটা পোষ মেনেছে। আর পোষ মেনে দৈত্যটার আদেশ মতো তার ইচ্ছানুযায়ী কাজ হাসিল করছে। শিকার খুঁজে বেড়াছে ইয়ামবুংএর ঝোপেঝাড়ে। আকাশে বাতাসে। দৈত্যটা চিলটার পায়ে লতার বাঁধন পরিয়ে দিয়ে ওকে বন্দী করেছে। চিলটার চোখেমুখে শঙ্কা আর ত্রাস। ভয় আর দুর্ভাবনা। ঈগলটাকে হাতের কব্জীর ওপর বসিয়ে দৈত্যটা আদর

করছে ঘন ঘন। আরামে ঈগলটার চোখ বুঝে এসেছে। আদর আপ্যায়নের ধূম পড়ে গেছে। ঈগলটা মাঝে মাঝে চোখ খুলে আমাকে দেখছে। ঝাঁপিয়ে পড়বে নাকি আমার ওপর? শুধু অপেক্ষা ইঙ্গিত আর ইসারার। দৈত্যটা গলায় আপঙ্‌ ঢালছে ঘন ঘন। ঝলসানো শূকরের ঠ্যাং চিবোচ্ছে। আমাকে সেধেছিলো। আমি আপত্তি জানিয়েছি। পোড়া মাংসের গন্ধে বাতাসে কেমন যেন একটা বোঁটকা গন্ধ। আমার বমি হবার উপক্রম। ঈগলটাকে দৈত্যটা একটা বাঁশের ওপর বসিয়ে দিয়েছে। পাখীটা ঘন ঘন ডানার ঝাপটা মারছে। শাণিত নখ ঘষছে বাঁশের গায়ে। এরপর দৈত্যটা একটা অদ্ভুত কাণ্ড করলে। মুখ থেকে "সু" "সু" করে একটা শব্দ বের করতে সুরু করলে। মনে হলো কাউকে সে আহ্বান করছে। হাতের আঙুল মেলে ধরে কাকে যেন সে ডাকছে। আমি ঘুরে তাকালাম। যা দেখতে পেলাম তাতে রক্ত আমার জমাট বাঁধার অবস্থা। আমার হার্টটা যেন মুহূর্তমধ্যে থেমে যাবে। প্রায় আট ফিট লম্বা, মিশমিশে কালো, কালোর মাঝে মাঝে হলুদের ছোপ, তেল মসৃণ পিচ্ছিল দেহ নিয়ে কালনাগিনী বুকের ওপর ভর করে গড়িয়ে গড়িয়ে দৈত্যটার দিকে এগুচ্ছে। মাঝে মাঝে মাথা তুলে দেখে নিচ্ছে আশপাশ। আমি ততোক্ষণে একদৌড়ে প্রায় হাত বিশেক দূরে নাগালের বাইরে চলে গেছি। তাকিয়ে রয়েছি অবাক বিস্ময়ে। ফণীরাজের ফণার বহর দেখে চমৎকৃত হয়েছি। কিং কোবরা। ওর এক ছোবলে বনের হাতীকে দুদিন বিষের জ্বালায় জর্জরিত হয়ে সারাটা জঙ্গলে উন্মাদ অবস্থায় ছুটোছুটি করতে দেখেছি। ছুটোছুটি করে এক সময় ভূমিশয্যা নিয়েছে। ভুজঙ্গম বুকের ওপর ভর করে এগিয়ে এসে দৈত্যটার পা বেয়ে শরীরের ওপরের দিকে উঠছে। দৈত্যটার কোনো ভয় ভাবনা নেই। সাপটা দৈত্যটার সারা দেহ নিজের দেহ দিয়ে পেছিয়ে পেছিয়ে ওপরে উঠছে। দৈত্যটা নির্বিকার,

মুখে হাসি। চিত্ত চাঞ্চল্যের সামান্য লক্ষণটুকুও নেই। আমার ভয়ে সারা শরীর বেয়ে ঘাম ঝরছে। ফণীরাজ ততোক্ষণে ওর সারা দেহে পাক দিতে দিতে মাথার ওপর বিরাট এবং ভয়াবহ ফণা বিস্তার করে এদিক থেকে ওদিকে দুলছে। দৈত্যটা ওর সারা দেহে, বুক, পিঠ, মাজায় হাত বোলাচ্ছে। দৈত্যটার যেন সন্তান বাৎসল্য উথলিয়ে উঠেছে। আদরের বন্যা বইয়ে দিচ্ছে। চুমোয় চুমোয় ওর হিমশীতল দেহটা ভরিয়ে দিচ্ছে। কালনাগিনীর বড্ডো গজরানি। বড্ডো ফোস্ ফোসানি। জিহ্বাটা আগুনের শিখার মতো একবার বেরুচ্ছে—আবার ভেতরে ঢুকছে। ততোক্ষণে একরাশ আশঙ্কা আর উৎকণ্ঠা আমার মনে ছুটোপুটি সুরু করেছে। দৈত্যটার নাম এক সময় জিজ্ঞাসা করে জেনে নিয়েছিলাম। ওর নাম ছিলো কমোজামো। ওর সঙ্গে বাতচিত সব অসমীয়া ভাষার মাধ্যমে হয়েছিলো। কালনাগিনীর মাথায় পিঠে হাত বোলাতে বোলাতে কমোজামো বলেছিলো, 'তোদের রেঞ্জার সাহেবের বড্ডো বাড় বেড়েছে।'

'কেন হয়েছে কি?' বলি আমি। যথেষ্ট দূরত্ব বজায় রেখে দাঁড়িয়ে রয়েছি। ভয়ে ভাবনায় বিপর্যস্ত আমি।

'না বলছিলাম কি খেয়ালখুশী মতো চলছে তোদের রেঞ্জার সাহেব। অন্য কারো মন মেজাজের তোয়াক্কা না রেখে। ঘুষ খেয়ে খেয়ে সাহেবটার কেঁদো বাঘের মতো অবস্থা। ফুলে ফেঁপে একাকার। খালি তাগাদা আর ধন্না। আজ বাঘের ছাল। কাল শম্বরের চামড়া। পরশু হাতীর দাঁত। হুকুমের আর অন্ত নেই। পাইক, পেয়াদা, খালিখালি চোখরাঙ্গানি। ও ভেবেছে কি বলতে পারিস্। কতোদিন এ অত্যাচার সহ্য করবো বলতে পারিস?'

'তুমি আপত্তি জানাও না কেন?'

'আপত্তি করলে শোনে নাকি কথা। শাসায়, চোখ রাঙায়, হুমকি ছাড়ে, দাপট্ দেখায়। বলে মাল না পেলে পিঠের ছাল তুলে নেবো। রাত বেরোতে এসে উপদ্রব সুরু করে।'

'বাঘের আর হরিণের ছাল নিয়ে কি করে ?' প্রশ্ন করি আমি।

'চড়া দামে বেচে দেয় ডিব্রুগড়ের বাজারে। সাহেবদের চেলা চামুণ্ডেরা জঙ্গলের আশেপাশে ঘোরাফেরা করে। ওৎ পেতে থাকে ছাল চামড়ার জন্যে।'

'তুমি ওদের কথা শোনো কেন ?'

'ওরে বাপ্। না শুনে উপায় আছে নাকি ? পাইক, পেয়াদা পাঠিয়ে জোর করে ধরে নিয়ে যায়। এই ছাখ্ না।' মিথোনের ছালের (ষাঁড়ের মতো দেখতে জন্তু) তৈরী জামাটা খুলে পিঠটা দেখায় কমোজামু। পিঠে কালসিটে পড়েছে।

'চাবুক মেরেছে। লোহা গরম করে ছ্যাকা দিয়েছে। পাজী, শয়তান, নেমকহারাম।'

'এরকম করলে কেন ?' আমি প্রশ্ন করি।

'হাতীর দাঁত বড্ডো তুষ্প্রাপ্য বস্তু। সংগ্রহ করতে পারিনি, তাতেই এ অবস্থা। ও ভেবেছে আমি ফাঁকি দিয়েছি। ওর বড্ডা বাড় বেড়েছে।'

'তুমি পাশিঘাটে গিয়ে নালিশ জানাও না কেন ?'

'কার কাছে নালিশ জানাবো। সব বজ্জাতের দল। রেঞ্জার আগেভাগে টাকা দিয়ে কর্তাদের হাত করে রেখেছে। ভালো মন্দ বিচার করবার শক্তি আছে নাকি ওদের। ওদের ওপর আমার এতোটুকুনও বিশ্বাস নেই।' একরাশ থুতু ছিটোয় কমোজামু। বিদ্বেষ আর উপেক্ষা, অবজ্ঞা আর ঘৃণা থুতুর সঙ্গে চারপাশে ছিটিয়ে দেয়। সাপটা কোমো জামোর মাথার ওপর ফণা বিস্তার করে তুলছে। কোমোকে দেখে মনে হচ্ছিলো জটাজুট-শোভিত, ব্যাঘ্রছালে আচ্ছাদিত, ভস্মলেপন করে শিব ধ্যানে বসেছেন। গলা জড়িয়ে তাঁর মাথার ওপর তুলছে ফণীরাজ।

'তোদের রেঞ্জারবাবু আর তার সাকরেদদের হাতে লাঠি থাকে। আর লাঠির মাথা থেকে আগুন বেরোয়। লাঠি যার দিকে তাক্

করে, আগুন আর শব্দ বের হয়ে তখুনি তাকে ঘায়েল করে। রক্তে ভেসে যায় মাটি। লাঠি বড্ডো তেজ ধরে রে।'

বাঁশের ওপর বসে ঈগলটা ঝিমুচ্ছে। চিলটা পাখা আর পালকে তল্লাসী চালিয়ে পোকামাকড় গিলছে। বাইরে গুমোট গরম। ভ্যাপসা আবহাওয়া। গল্‌গল্‌ করে ঘাম ঝরছে। দৈত্যটা শূয়োরের মাংস আগুনে ঝলসে খাচ্ছে।

'তা ছাখ্। পিরকু পিন্‌টের নামে শপথ নিচ্ছি। আর নয়, এর একটা ফয়শালা আর হিল্লে করবো। হুমকি আর মেজাজের আর পরোয়া করবো না।'

এরি মধ্যে কমোজামো সোনালী রঙের একটা পাতা বেটে আপঙের সঙ্গে মিশিয়েছে। নির্যাস ধরেছে সাপটার মুখের কাছে। সাপটা চুক্ চুক্ করে রস পান করছে। আর সবটুকু পান করে বেশ চাঙ্গা হয়ে উঠেছে।

'জঙ্গলের নিয়মকানুন অনুসারে আমরা পুঁইমে পুজো করি। চেষ্টা করি সাপদের খোস মেজাজ আর বহাল তবিয়তে রাখতে। তা রেঞ্জারসাহেব টিট্‌কিরী দিলো। রগড় জমালো। পুঁইমে পুজোর জন্যে এক ভাঁড় মধু রেখেছিলাম, সে মধু তার চাই। কতো মিনতি জানালাম। শুনলে না, লাঠির ভয় দেখিয়ে নিয়ে গেলো। পুজোর একটা মাটির সরা পা দিয়ে ভেঙ্গে চুরমার করলে। কতো বারণ করলাম। তবুও এ অপকর্ম করলে। বললে কি জানিস? বললে, পুঁইমে পুজোর সময় দলে দলে সাপ প্রান্তরে মাঠে ঘাটে বেরিয়ে এলে তুই তোর ব্যবসা সুরু করে দিবি। গোটা কয়েক ধরে এনে ছাল ছাড়িয়ে ব্যবসা শুরু করে দিবি। চামড়া বিক্রী করবি। ওতে জুতো, ব্যাগ অনেক কিছু হবে। অনেক পয়সা কমো। ব্যবসায় নামলে লাল হয়ে যাবি। এ সুযোগ হেলায় হারাস্ নে। কোনো ঝুঁকি নেই। শুধু সাপ ধরবি আর ঝুলিতে ভরবি। ওদের ছাল চামড়া ছাড়িয়ে আমার হাতে তুলে দিবি। তোকে ফাঁকি

দেবো না কমো। চড়া দামে বাজারে ছাড়বো। আধাআধি বখরা। রসিয়ে রসিয়ে কথা বলে তোদের রেঞ্জারসাহেবটা। ওর কথাবার্তা শুনে আমার আপাদমস্তক জ্বলে যায়। ছাখ, কাণ্ডটা। পুজোপার্বণ নিয়ে ঠাট্টা আর মস্করা। দেবতা, দানো, পিশাচ নিয়ে হেলা তুচ্ছ।' অপমান আর রোষে দৈত্যটা গর্জাচ্ছে। রেঞ্জার-সাহেবকে পেলে যেন ছিঁড়ে ফেলবে। এরকম একটা ভাব।

'বলি বাপু, আমাদের পুজো পার্বণে তোদের নাক গলাবার দরকার কি শুনি।' বলে কমো।

'ঠিক কথা।' আমি সায় দিই।

'পুঁইমে পুজো নিয়ে ছেলেখেলা কেন? তোদের শহুরে মানুষগুলোর পুজোপার্বণ নেই?' প্রশ্ন করে কমো।

আমাকে বলতে হয়, হ্যাঁ আছে, সর্প উপাসনার প্রসিদ্ধতম উৎসবের নাম নাগপঞ্চমী। শ্রাবণ মাসের পঞ্চমী তিথিতে এই উৎসব পালিত হয়। বাংলার মনসামঙ্গল কাব্যের ইতিহাস উজ্জ্বল রূপে চিত্রিত হয়ে রয়েছে। সর্পদেবী মনসার মাহাত্ম্য ও পুজা প্রচারই মনসামঙ্গল কাব্যের বিষয়বস্তু। চাঁদ সদাগর মনসাপুজার ঘট পদাঘাতে ভেঙ্গে দিলেন। বিবাহের রাত্রে মনসার কোপে লখিন্দর সর্পদংশনে মারা গেলো। এর পর আসে বেহুলার কথা। কোমোজামোকে বলেছিলাম সব কিছু। খুব খুশী কমোজামো।

'তবে ছাখ দিকিন্। আমাদের পুজো নিয়ে ঠাট্টা কেন? তুই সব বুঝিস্। মুখার্জীবাবু সব বোঝে। ওই লোকটা রেঞ্জার সাহেবটা বুঝতে চায়না কেনরে?'

কি জবাব দেবো আমি। কমোজামো সাপটার মুখের কাছে নির্যাসের আঁধারটি ধরে। সে বলে, 'খেয়ে নে বেটী। আমার দিকে তাকিয়ে কি দেখছিস্। সবটুকু পান করে নে। শরীরে তাগদ্ হবে। নেশা হবে।' এরপর আমার দিকে তাকিয়ে বলে—জানো এরকম জোয়ান যুবতী এ তল্লাটে আর দুটি নেই। ও

আশেপাশের নাগদের মনে রঙ ধরায়। দেখছো ওর শরীরে জৌলুষের বাহার।' কি একটা পাতা বেঁটে ওরই খানিকটা লাল নির্যাস দিয়ে ও সাপটার মাথাটা চিত্রিত করে।

'কেমন দেখাচ্ছে ওকে বলো দেখি?' কমো প্রশ্ন করে। কমো ভাবটা দেখাচ্ছে সাপটা যেন কোনো ঘরের বউ ঝি, আর ও তার একজন এ্যাডমায়ারার। 'ওর মরদটাকে যদি দেখিস্। পেল্লাই চেহারা, জাঁদরেল পুরুষ। বারো তেরো হাত তো বটেই। এ তল্লাটে ওরকম রাজগোখরা সাপ আর দুটি নেই। পুরুষটার ফণাটা যদি দেখিস্ একবার! দেখিস্ যদি ওর শরীরে রংএর বাহার। কাছে পিঠে রয়েছে হয়তো। পাহাড়টার ফাটলে গহ্বরে ঢুকে ইঁদুর, ব্যাঙ, আর কাঠবিড়ালী খুঁজছে হয়তো। ডাকবো নাকি?' হাত জোড় করে ওকে ডাকতে বারণ করি। ওকে দেখবার সামান্যতম বাসনা আমার মনে নেই।

'বেটি আমার মিলনের জন্যে পাগল হয়েছে। আনন্দে ওর ডগমগ ডগমগ ভাব। ছাখো, ঠিক বুঝেছে আমার কথা। ফণা দোলাচ্ছে এদিক থেকে ওদিকে।' কোমো সাপটার মাথায় পিঠে বুকে সোহাগ করছে। হাত বোলাচ্ছে ঘন ঘন।

'ওর ভবিষ্যত স্বামী খাঁটী রাজ গোখুরা সাপ, বনেদী বংশ। আমার বেটীর জন্যে সারাটা ইয়ামবুং জঙ্গল ঘুরে জামাই জোগাড় করেছি। বেটির সাধ আহ্লাদের জন্যে আমি সব কিছু করতে পারি।' হা হা হা করে দৈত্যটা হাসতে থাকে। আর সে হাসির দমকে ইয়ামবুং অরণ্য কেঁপে কেঁপে ওঠে। পরে জেনেছিলাম কমোজামো ছিলো ওঝা এবং বেদে। চিলের নখ আর ঠোঁটের প্রয়োজন হবে ঝাড়ফুঁকের জন্যে। মেয়েছেলের চুল, চিলের নখ, ভালুকের চোখ দিয়ে নাকি সে তৈরী করবে বশীকরণ তাবিজ, কবচ। কন্যার শরীরে ছুঁইয়ে দিলে কন্যা তোমার আমার হাতের মুঠোয় এসে যাবে। মনে মনে ভাবি নেফা সত্যি তুমি রহস্যময়ী।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

নেফা, আমি কোনোদিন তোমাকে ভুলতে পারবো না। অনেক দিন হলো তোমাকে ছেড়ে চলে এসেছি। কিন্তু তোমাকে ভুলতে পারলাম কই? আজ ফিরে গেলে হয়তো আমার অবস্থা রিপ্ ভ্যান্ উইংকলের মতোই হবে। আজ হয়তো দেখতে পাবো নেফার এক অদ্ভুত পরিবর্ত্তন। আমার মনে কিন্তু তোমার সেই পুরোণো রূপটি অক্ষয় হয়ে আছে। মলিন হয়নি এতোটুকুন। তোমার ওখানে সভ্যতা এগুচ্ছে। এগুচ্ছে ধীর পদক্ষেপে। নেফা বড্ডো লাজুক। বড্ডো মুখচোরা। সহজে সে সভ্যতার হাতে ধরা দিতে চায় না, নেফার-সিয়াং, সুবণসিরি, টিরাপ, কামেঙ আজো আমাকে হাতছানি দেয়। ডেকে বলে—'ওরে ফিরে আয়। ফিরে আয় আমার কোলে।' সিয়াং, ব্রহ্মপুত্র, ডিহং, ডিবং লোহিত, ডিগারু, কুণ্ডিলপানী, কামলঙ পানী। আরো কতো অসংখ্য নদী রয়েছে। ভোলা যায় কখনো তাদের? তীরে তীরে কতো গল্প, কতো কাহিনী ছড়ানো ছিটানো রয়েছে। কে তার হিসেব রাখে। এ হোয়াংহো, ইয়াংসিকিয়াং-এর গল্প নয়। ইউফ্রেটিস, টাইগ্রিস্, কঙ্গো আর আমাজানের গল্প বলতে বসিনি। রাইন্, নাইল, নীপার, নীষ্টর। সে যে অনেক অনেক দূর। ওদের তুলনায় নেফা ঘরের কাছে। তবু প্রতিবেশীর খবর আমরা কতোটুকুন রাখি। মাডাগাস্কার, কঙ্গো, হনোলুলু, মেক্সিকোর লোকদের কথা ভেবে আমরা মাথা ঘামাই। ঘরের কাছে মানুষগুলো থেকে যায় আমাদের কাছে অজানা আর অচেনা। আমাদের ঘরের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে রয়েছে নেফা। সেদিন পর্যন্ত যার পরিচিতি ছিলো তিমিরাচ্ছন্ন দেশ বলে। পা বাড়ালেই যেমন রাস্তা। গলি পেরুলেই যেমন রাজপথ। ঠিক তেমনি চোখ

খুললে আর দৃষ্টি ফেললেই পাত্তা মিলবে নেফার। নেফা ধীরে ধীরে সভ্যতার আলোকে নিজেকে উদ্ভাসিত করছে। নিজেকে গড়ে পিটে তোলবার সাধনায় মেতেছে। পথ দুর্গম দুরূহ সন্দেহ নেই। তবুও এগিয়ে যাবার সঙ্কল্প সে নিয়েছে। নেফা, আমি তোমার পাহাড় পর্বতে, বনে প্রান্তরে, উপত্যকা, মালভূমিতে কান পেতেছিলাম। কান পেতে শুনতে চেয়েছিলাম ফেলে আসা অতীত যুগের কাহিনী। আমার মনে হয়েছিলো এক অতি প্রাচীন সভ্যতা, বহু যুগ, বহু শতাব্দীর আগেকার এক প্রাচীন সভ্যতা নেফার মাটির নীচে চাপা পড়ে গুমরিয়ে গুমরিয়ে কাঁদছে। হয়তো আত্মপ্রকাশের জন্যে হা পিত্যেস্ করছে। বনজঙ্গলে সমাচ্ছন্ন নেফা। তিমিরে ঢাকা নেফা। আমি জানি এ নেফার আসল রূপ নয়। আমার মন বলছে নেফা তুমি তোমার ঐতিহ্য, সংস্কৃতি নিয়ে একদিন মহান ছিলে। তুমি হারিয়ে যাওনি। তুমি একদিন জেগে উঠবে। সভ্যতাকে তুমি আবার সমৃদ্ধ করবে। কোথায় হারিয়ে গেলো তোমার সেই উজ্জ্বল দিনগুলো? তুমি কি সত্যি সত্যি মহান আর গরীয়সী ছিলে না? ওরা বলে লোহিতের বিশ্‌মাক্ নগর নাকি রাজা বিশ্‌মাকের ছিলো, যার মেয়ে রুক্মিণী বিয়ের পূর্বে কৃষ্ণ কর্তৃক অপহৃত হয়েছিলো। ভারতের ঐতিহ্য আর সংস্কৃতি তা হিন্দুধর্মেরই হোক্ আর বৌদ্ধ-ধর্মেরই হোক্, ভারতের বাইরে কতো মহাদেশ, দেশ আর প্রদেশে, কতো ধ্বংসস্তূপের আড়ালে আত্মগোপন করে ছিলো আর রয়েছে কে তার খোঁজ রাখে। ভাবলেও শরীর রোমাঞ্চিত হয়। কতো কাহিনী কতো ঘটনা। শিল্পীর রঙ আর তুলি, ভাস্করের বাটালী আর হাতুড়ীর স্বাক্ষর বহন করে দাঁড়িয়ে রয়েছে কতো চৈত্যে আর স্তূপে, তোরণ আর স্তম্ভে। মূর্তি আর মঠে। বিহার আর মন্দিরে। কিছু রয়েছে মাটির ওপরে। বাকী সব ভগ্নাবশেষের রূপ নিয়ে মাটির নীচে। রয়েছে সম্পূর্ণ আত্মগোপন করে। রয়েছে সিংহলে।

রয়েছে ভারতের উত্তর-পশ্চিমে পুরোনো দিনের তক্ষশিলায়। আফগানীস্তানের রামিয়ানে। মধ্য এশিয়ার খোটানে। সেখানে ইট, কাঠ, পাথর, দেয়াল, খিলান শোনাবে তোমাকে অনেক অনেক কাহিনী। শুধু শোনবার কান থাকা চাই। নেফাতে ও পর্বতে গুহাতে লুকানো রয়েছে কতো কাহিনী। পুরোনো দিনের কতো ইতিহাস। কামেং ডিভিসনের ভরেলী নদীর তীরে ভালুক পাঙ্ নাকি আকাদের পূর্ব পুরুষ-ভালুকের আদি নিবাস। বান্ রাজার নাতি এই ভলুক যাকে কৃষ্ণ তেজপুরের যুদ্ধে হারিয়েছিলেন। কলিতা রাজা রামচন্দ্র নিজের দেশ থেকে বিতাড়িত হয়ে ডাফলা পর্বতে মায়াপোর রাজ্য স্থাপন করেছিলো। ইটাহিলে যার ধ্বংসাবশেষ এখনো ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। সুবণসিরির দইমুখ থেকে এর দূরত্ব খুব বেশী নয়। ইন্দোনেশিয়ার জাভা দ্বীপে বোরোবোতুর মন্দিরের আশে-পাশের অঞ্চলে ভগ্নস্তূপের আর ধ্বংসাবশেষের ভেতর, দেয়াল গাত্রে ভারতের ঐতিহ্য আর সংস্কৃতি গা জড়াজড়ি করে রয়েছে। সেখানে রয়েছে সংস্কৃত শ্লোকের ছড়াছড়ি। রামায়ণের কতো কাহিনী। ব্যাখ্যা আর বিন্যাস। মন্দিরের গায়ে রামায়ণের কাহিনী উৎকীর্ণ করা রয়েছে। নেফার সঙ্গে ভারতের নিশ্চয়ই ছিলো নাড়ীর বন্ধন। নেফার লোহিতে তামেশ্বরীর মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আজো রয়েছে। লিকাবালির ফুট হিলস্এ রয়েছে দেবী দশভূজার একটি ভগ্ন মন্দির। দেবীর নাম মালিনী। লোহিতের ব্রহ্মকুণ্ড যেখানে কুঠারাঘাতে পরশুরাম কুণ্ডের সৃষ্টি করেছিলো, আজো হয়ে রয়েছে হিন্দুদের পবিত্র তীর্থস্থান। অরণ্যে ঢাকা শ্বাপদসঙ্কুল ভয়াবহ টিরাপের বিভিন্ন অঞ্চলে নক্টে নামে ট্রাইবদের ভেতর এখনো রয়েছে অনেক বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী লোক। ভারতের সভ্যতা অনেক দেশে, গ্রামে, সহরে ছড়িয়ে রয়েছে। কম্বোডিয়ায় হিন্দু সভ্যতা নানা হিন্দু-দেবদেবীর মন্দিরে প্রতিফলিত হয়ে রয়েছে। আজো মনে প্রশ্ন জাগে কারা এ সভ্যতা ভারত থেকে বহন করে এনেছিলো ?

সেখানে রয়েছে প্রাচীন পরিত্যক্ত রাজধানী আংকোর থাম। রাজ প্রাসাদ ও নানা হিন্দুমন্দিরে আকীর্ণ খাম জাতির প্রাচীন ও পরিত্যক্ত রাজধানী। খ্রীস্টীয় নবম শতাব্দীতে রাজা জয় বর্মন কম্বোজের তৎকালীন রাজধানী আংকোর থাম প্রতিষ্ঠা করেন। ওখানে ভারতীয় অধিবাসীরা প্রতিষ্ঠিত করেছিলো ভারতীয় সভ্যতা। ভারত থেকে সম্ভবত তারা বহন করে নিয়ে গিয়েছিলো ব্রাহ্মণ্য ধর্ম আর সংস্কৃতি। সেখানে মন্দির গাত্রে রয়েছে ব্রহ্মা, শিব আর বিষ্ণুর মূর্ত্তি। গভীর জঙ্গলে মাটির নীচে একদিন হারিয়ে গিয়েছিলো মন্দিরগুলো, যারা আংকোর ভাট নামে পরিচিত। ভাগ্যিস্ ফরাসী পুরাতাত্ত্বিক গভীর জঙ্গলে লুক্কায়িত শিলাখণ্ডে হোঁচট খেয়েছিলো। হারিয়ে যাওয়া ভারতীয় সভ্যতা নূতন করে আবিষ্কৃত হলো। মনে মনে ভাবি নেফার জঙ্গলে কেউ যদি এমনি করে হোঁচট খেতো। বেরিয়ে পড়তো একটা লুকোনো সভ্যতা। আমার যে কি হয় আমি ঠিক বোঝাতে পারিনে। ভগ্নস্তূপের ওপর দাঁড়িয়ে আমি সম্পূর্ণ আত্মবিস্মৃত হই। কান পেতে শুনি অনেক করুণ কাহিনী। কারা যেন ফিস্ ফিস্ করে কথা বলে আমার আশেপাশে। গল্প আর কিংবদন্তী, ইতিহাস আর কাহিনী রূপ পরিগ্রহ করে এসে আমার সামনে ধরা দেয়। নিশুতি রাতে আমি এসে দাঁড়াই কলকাতার রাইটার্স বিল্ডিং এর ধারে। লোকজন শূন্য ডালহৌসী স্কোয়ার। কর্মব্যস্ত নগরীর লোকগুলো ঘুমোচ্ছে, অট্টালিকার অভ্যন্তরে আর ফুটপাতের ওপর। নিস্তব্ধ আর নিঝুম রাজপথ। আমি ভেবে রোমাঞ্চিত বোধ করি যে আজ যেখানে রাইটার্স বিল্ডিং দাঁড়িয়ে রয়েছে সেখানে খুব বেশী দিনের কথা নয়. একদিন দাঁড়িয়ে ছিলো ইংরেজদের এই এতোটুকুন একটা কুঠি। ওইখানে সিরাজদ্দৌল্লার বাহিনীর সঙ্গে ইংরেজদের বেধেছিলো তুমুল সংগ্রাম। আর্ত্তনাদে কেঁপে কেঁপে উঠেছিলো আকাশ বাতাস। দুশো আড়াই শো বছরের ভেতর কতো পরিবর্ত্তন।

আজ যেখানে জি. পি. ও (জেনারেল পোস্ট অফিস), সেখানে সেদিন পোস্ট অফিসের চিহ্নমাত্র ছিলো না। সেখানে ছিলো জল। তীরে ঢেউ আছড়িয়ে পড়তো। নদীর ঘাটে নৌকো বাধা। তরী ভিড়েছে। নৌকোর ছইএর ওপর বসে লালমুখো, গালে ইয়া বড়ো জুল্পী নিয়ে সাহেবটা গান ধরেছে। লা, লা, লা। অমাবস্যার রাত্রিরে আর গভীর নিশুতি রাতে আমি:যখন কালীঘাট মন্দির চত্বরে, চাতালে এসে দাঁড়াই বা রাসবিহারীর ধারে কালী মন্দিরে এসে বসি তখন যেন স্পষ্ট দেখতে পাই ডাকাতরা মা কালীর পুজোর পর কপালে সিঁদুর লেপে মদ্যপান করে, ঝকঝকে খাঁড়া উঁচিয়ে প্রস্তুত হচ্ছে তাদের শিকারের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বার জন্যে। আজ যেখানে চৌরঙ্গী সেদিন সেখানে দুর্ভেদ্য জঙ্গল। সেই জঙ্গলের ভেতর পায়ে হাঁটা পথে এগিয়ে আসছে পুণ্য লোভাতুর যাত্রীর দল। তারা চলেছে কালীঘাটে কালীমাতা দর্শনে। চোখেমুখে তাদের ভয় ভাবনা আর সন্ত্রাস্। ঠগীদের ভয়ে সারাটা অঞ্চল হয়ে রয়েছে আতঙ্কিত। ঘন অরণ্যানী বুকে ধরে দাঁড়িয়ে রয়েছে আজকের গড়ের মাঠ। শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্য। আমি যেন স্পষ্ট দেখতে পাই এল্‌গিন্ রোডের কাছে ক্যাথাড্রেলের আশেপাশে হাতীগুলো শুঁড় উঁচিয়ে চলেছে। হাওদায় বন্দুক উঁচিয়ে বড়লাট বাহাদুর বসে আছেন। আহত ব্যাঘ্র কাছের বাঁশ ঝোপে আত্মগোপন করেছে। আমি ট্রামে বাসে ঝিমোতে সুরু করলেই আমার সামনে থেকে নূতন জগতটা কর্পূরের মতো উবে যায়। জেগে ওঠে হারিয়ে যাওয়া সেদিনের পুরোনো জগতটা। বৌবাজারের কোন এক গাছতলায় দাড়ি-গোঁফে ডালচালের গুঁড়ো মেখে তেল-নুন মাপতো আমাদের জবচার্ণক। কলকাতার প্রতিষ্ঠাতা। আর গার্ষ্টিন্ প্লেসে আমি যে অফিস ঘরটায় বস্‌তাম তার কয়েক গজের ভেতর যে বাড়ীটা দাঁড়িয়ে রয়েছে তার দোতলার ঘরে এক সময় বসতেন ওয়ারেন হেষ্টিংস্। ভারতের

প্রথম গভর্ণর জেনারেল। বর্ষণমুখর রাত্রিরে খোলা জানালা দিয়ে আমি তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতাম। আমি যেন স্পষ্ট দেখতে পেতাম ওয়ারেন হেষ্টিংস সাহেব মাথা নীচু করে কলম চালাচ্ছেন। পাইপ টান্ছেন। ফাইল নাড়াচাড়া করছেন। ভারতকে কি করে সাম্রাজ্যের কঠিন রজ্জুতে আষ্ঠেপৃষ্ঠে বাধা যায় তারই হিসেব নিকেশ করছেন। কাশিম বাজারের কবরখানায় বসে আমি শুনেছি ওয়ারেন হেষ্টিংসের প্রথম পত্নীর চাপা দীর্ঘশ্বাস, শিশুকন্যার ক্রন্দন। কাশিম বাজারের কাছে বহরমপুরে ব্রহ্মদেশের শেষ নৃপতি থিবরের কবরের পাশে আমি চুপ করে বসে শুনেছি তার চাপা দীর্ঘশ্বাস। থিব ছিলো ইংরেজদের বন্দী। থিব ও তার পরিবারবর্গের অনেকেই ঐ জঙ্গলের ভেতর কবরে চিরনিদ্রায় শায়িত। ব্রহ্মদেশের নৃপতি যেন ফিস্ ফিস্ করে বলেছিলো—'জানো, আমি ব্রহ্মদেশের শেষ নৃপতি, শুয়ে রয়েছি তোমার দেশের মাটিতে। আর আমার দেশের মাটিতে শুয়ে রয়েছে তোমাদের দেশের শেষ নৃপতি, মোঘল সম্রাট বাহাদুর শাহ।' কোনো এক চাঁদনি রাতে শাহ সুজা কর্তৃক নির্মিত গৌড়ের লুকোচুরি দরওয়াজার পাশে আমি কান পেতেছিলাম। শুনেছিলাম চটুল, লাস্যময়ী নটীর নূপুর নিক্বণ। স্পষ্ট দেখেছিলাম রূপসীদের অবগুণ্ঠনে ঢাকা মুখগুলো, মোম দিয়ে গড়া দেহগুলো। বিলোল কটাক্ষ হানছে এদিক ওদিকে। হাসির ঝরণা বইয়ে দিচ্ছে। আমার যে কি হয়। মনে আছে একদিন সারা আকাশ জুড়ে কালো মেঘের দস্যিপনা, মাতন আর ছুটোপুটি, ঝড়ের তাণ্ডব নৃত্য। দিনের বেলা ঘুটেঘুটে অন্ধকার। মুহুর্মুহু বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। আশেপাশে কোথায় যেন বাজ পড়লো। কানে তালা লাগবার যোগাড়। আমি এসে দাঁড়িয়েছি দিল্লীর লালকেল্লার ভেতর দেওয়ানী খাসে। সারাটা অঞ্চল জনমানবহীন। অনেক আগেই এখানে পৌঁছুবো বলে ভেবেছিলাম। কেল্লার গেটের কাছে সাহেবটার সঙ্গে গল্পগুজবে মেতে উঠেছিলাম। আমেরিকান

ট্যুরিস্ট। সখ আর সাধে ভরপুর। দুহাতে টাকা ওড়াচ্ছে। রেঁস্তোরায় বসে প্রচুর খাওয়ালে। হ্যাঁ, ড্রিঙ্কস্এর বন্দোবস্তও ছিলো। এর পর সাহেবটা আমাকে একটা সিগারেট টানতে দিয়েছিলো। সাধারণ সিগারেটের চাইতে আকারে অনেক দীর্ঘ। আমার বিশ্বাস সিগারেটটার ভেতর শুধুমাত্র ট্যোবাকো লিফ্ ছিলো না। ওর ভেতরে নিশ্চয় ছিলো সরস, জোরালো, সতেজ সব বস্তুর সংমিশ্রণ। নাম বলতে পারবো না। তবে গাঁজা, ভাং, চরস্, মারজুনা যাই থাক না কেন, প্রচণ্ড নেশা হয়েছিলো। মিঠে নেশা, মনমেজাজ স্ফূর্তিতে ভরিয়ে তুলেছিলো। দেহটা অসম্ভব হালকা মনে হচ্ছিলো। দেহটা যেন বাতাসে ভাসছে। সাহেবটার কাছ থেকে যেমন করে হোক আর একটা সিগারেট যোগাড় করবার বাসনা জেগে উঠেছিলো। কিন্তু অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন নয়। সাহেবটা কোথায় যেন সরে পড়েছিলো। আমার জোর নেশা হয়েছিলো। কিন্তু সেই সঙ্গে ছিলো টনটনে জ্ঞান। বৃষ্টির ফোঁটা পড়বার আগেই লাহোরী গেট্ দিয়ে ঢুকে দেওয়ানী খাসে আশ্রয় নিয়েছি। দেওয়ানী খাস্ জনমানবহীন। একটা আশ্রয় পেয়ে গেছি। এখন দুনিয়া রসাতলে গেলেও আমি আর ভাবছিনে। এক লাফে শ্বেত পাথরটার ওপর চেপে বসলাম। জোড় আসন হয়ে বসলাম। এ পাথরটার ওপরই নাকি সাত ফুট উঁচু ময়ূর সিংহাসন বা পিকক্ থ্রোনটা বসানো ছিলো। ১৭৩৯ সালে নাদির শাহের আক্রমণ আর লুঠতরাজের সময় সিংহাসনটা লুণ্ঠিত এবং অপহৃত হয়েছিলো। এখন নাকি রয়েছে পারস্য দেশে, বর্তমানের ইরাণে। ছ ফুট লম্বা চার ফুট চওড়া সিংহাসনে ভেতর নাকি অসংখ্য মণিমুক্তো বসানো ছিলো। সিংহাসনে ছিলো দুটি সোনার তৈরী ময়ূর। তাছাড়া স্যাফায়ার, রুবি, পার্ল, এমারল্ড এবং আরো বিচিত্র সব মণিমুক্তো। সিংহাসনের খরচ পড়েছিলো সাড়ে ছয় মিলিয়ন পাউণ্ড। ফরাসী ভ্রমণকারী ট্রাভারনিয়ার দেওয়ানী খাসের মূল্য নির্ধারণ করেছিলো

সাতাশ মিলিয়ন ফ্রাঁ। সিংহাসনটা নেই, কিন্তু যে পাথরের ওপর সিংহাসনটা বসানো ছিলো সেটা রয়েছে। বাইরে বৃষ্টি সুরু হয়েছে। আমি যে অঞ্চলের মানুষ শাহজাহানের আমলে সে অঞ্চলের প্রচুর প্রতাপ ছিলো। গৌড়, কাশিমবাজার, মুরশিদাবাদ, আর জাহাঙ্গীর নগর। ঐশ্বর্য আর সমৃদ্ধিতে ভরপুর ছিলো ওসব নগর। শাহজাহানের সময় বাংলার সুবাদার ছিলো ইসলাম খাঁ। নিস্তব্ধ পাষাণ পুরীতে দরদী মন নিয়ে আমি সব খুঁটিয়ে নাটিয়ে দেখছি। দেওয়ানী খাসের সিলিংটা নাকি আগাগোড়া সোনার পাতে মোড়া ছিলো। আমি কিছুক্ষণের জন্যে ফিরে গেছি সেই পুরোনো আমলে। সব কিছু যেন আমার চোখের সামনে স্পষ্ট। দরবার কক্ষে একটু বেশী রাত্রিতে গুপ্ত অধিবেশন বসেছে। দূরে সানাইতে বাজছে দরবারী কানাড়া। দরদালানে ঘুরছে সেপাই সান্ত্রীর দল। দরজাগুলিতে প্রহরারত ভীষণ দর্শন খোজার দল। তাদের হাতে শাণিত খোলা তলোয়ার। সব জোয়ান মরদের দল। আমীর ওমরাহদের দল ঘন ঘন গুম্ফ মর্দ্দন করছে। হুকুম পেলে শয়তানকে নিমেষের মধ্যে জাহান্নামের পথে পাঠাতে পারে। নাজিম আর নাজিরের দল এদিক সেদিক ঘোরাফেরা করছে। তাদের মদিরা আরক্ত নয়ন। দেওয়ানী আম দিনের বেলা থাকে কর্মব্যস্ত, প্রাণ চঞ্চল।

মুর্দ্দাফরাশ সন্ত্রস্থ আর শঙ্কিত দৃষ্টি ফেলে মসলন্দের আশেপাশে ঘোরাফেরা করছে। তাম্বুল রাগে ওষ্ঠাধর রঞ্জিত করে, কানে পাখীর পালকের কলম গুঁজে, মেরজাই পরিধান করে চোখ ঠারছে মুন্‌শীর দল। ওদের কাছে রয়েছে সরাইখানার চাবি। কাগজে দস্তখত করলে মিলবে মুসাফিরদের রাতের আশ্রয়। ওদের মরজির ওপরে নির্ভর করছে অনেক কিছু। তবে মোহাব্বত তো এমনি এমনি হয় না। খানিকটা টালবাহানা করতে হবে বৈকি। মেহমানদের সঙ্গে যখন মোলাকাত হয়েছেই

তখন সমস্ত মুশ্‌কিল আসান করে মেহেরবানি বিতরণের দায়দায়িত্ব তাদের। তবে নজরানা দিতে হবে বৈকি। না হলে কি কাজ হয়। সব যুগেই যে ওটার দরকার। দরদালানে সেপাই সান্ত্রীদের চলাচলে গুম্‌গুম্‌ শব্দ উঠছে ঘন ঘন। সন্ধ্যেবেলা গুম্বজে গুম্বজে আজানের ধ্বনি তুলছে মোল্লা আর মৌলবীরা। সচকিত হয়ে উঠছে সারাটা দুর্গ। রূপোপজীবীনীরা ময়ূরপঙ্খী নাও থেকে যমুনার তীরে নেমে সোজা চলে এসেছে দুর্গের ভেতর। কাশ্মীর ওদের ভেট পাঠিয়েছে। ওদের অঙ্গ সজ্জায় রয়েছে কতো বৈচিত্র্য। ময়ূরকণ্ঠী আর মলিদা। এছাড়া মসলিনের ওড়না, সোনালী আর রূপোলী সুতোয় কাজ করা কুরতা, রূপোর সাতনরী, লাল ঘাগরা, নাকছাবি, সিঁথি, মল, ঘুঙুর, চুনী, পান্না মরকতের দ্যুতি ক্ষণে ক্ষণে দেহবল্লরী নয় যেন আকাশের গায়ে বিদ্যুতের ঝিলিক। ওদের চটুল দৃষ্টি পুরুষগুলোর মনে কামনার বহ্নি জ্বালায়। আওরাতের দল আজ রাতে রঙমহলে মেহমানদের মনে রঙের নেশা ধরাবে; দিলগুলো চুরচুর হবে। আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি মুষ্টিবদ্ধ হাতদুটো পেছনে রেখে, সারা মুখে চিন্তার ছায়া ছড়িয়ে একটা আহত শার্দূলের মতো বাদশা শাহজাহান দেওয়ানী খাসের ঘরে বারান্দায়, সিঁড়ি পৈঠায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন। লালকেল্লার নির্মাতা ভারত ঈশ্বর শাহজাহান। পুত্র বিদ্রোহী। মনে মনে ভাবি—আচ্ছা আপনিই না আপনার দুহিতার প্রেমাস্পদকে বিষাক্ত পান খাইয়ে মৃত্যুর কোলে সঁপে দিয়েছিলেন? সব কিছু লিখে গেছে ফরাসী পর্য্যটক বার্ণিয়ার সাহেব। ওই তো খানিকটা দূরে দেওয়ানী খাসের গা ঘেঁষে ছোট্ট এতোটুকুন মসজিদ। মতি মসজিদ। ঔরঙ্গজেব বানিয়েছিলেন। সিংহাসন চাই। পিতাকে বন্দী করো, ভ্রাতার রক্তে হাত রঞ্জিত করো। আমার যে করে হোক্‌ সিংহাসন চাই। ভারত সম্রাট ঔরঙ্গজেব নামাজ পড়বার জন্যে হাঁটু গেড়ে বসেছেন। আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। ভ্রুকুঞ্চিত করে উনি

কি যেন শুনতে চাইছেন। দুর্গপ্রাকারের ওধারের কোলাহল কি এখানেও পৌঁছে গেলো। ওই গোলমালের জন্যেই যে তিনি জুম্মা মসজিদে নমাজ পড়তে যাওয়া বন্ধ করেছেন। এইটুকুন পথ পার হলেই যে জুম্মা মসজিদ্। দশবছরে দশকোটি মুদ্রা ব্যয়ে তৈরী। কিন্তু যাবেন কি। বিভিন্ন ধরণের রাজকর থেকে মুক্ত হবার জন্যে হিন্দুজনতার আবেদন নিবেদন। কোলাহল গোলমাল। খোদাতালাকে যে একমনে একটু ডাকবেন সে সুযোগটুকুও লোকগুলো দিতে রাজী নয়। জুম্মামসজিদ শাহজাহান আর ঔরঙ্গজেবের যৌথ প্রচেষ্টায় তৈরী। আমি আরো দেখতে পাচ্ছি। শুনতে পাচ্ছি অনেক কিছু। বাহাদুর শাহ দেওয়ানী খাসে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। থর থর করে বৃদ্ধ কাঁপছেন। শেষ মোগল নৃপতি। তৈমুর রাজবংশের শেষ প্রদীপ জ্বলছে। নিভু নিভু অবস্থা, শীর্ণ দেহ। দেহ বয়সের ভারে নুইয়ে পড়েছে। পাশেই পরদার আড়ালে দুটি জলে ভেজা চোখ। বাদশার রূপসী যুবতী বেগম জিন্নতমহলের দুটি ডাগর চোখ। ১৮৫৭ সালে জনতা দেওয়ানী আমে গর্জে উঠেছে। তারা চায় বাহাদুর শাহ তাদের নেতৃত্ব-ভার গ্রহণ করুক। আমি উল্লসিত, চীৎকাররত, আবেগে ভরপুর জনতাকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। দেখতে পাচ্ছি ভারতের শেষ মোগল সম্রাটকে। বৃদ্ধ কি স্বপ্ন দেখছেন? গরু কাটার বিরুদ্ধে সম্রাট যেদিন ফারমান বের করেছিলেন সেদিন হিন্দুজনতা ঠিক ওইরকম জয়োল্লাসে ফেটে পড়েছিলো। বৃদ্ধ থর থর করে কাঁপছেন। ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ দমনের পর লেফটানেন্ট হড্‌সন্ সাহেব মোগল প্রিন্সদের একত্রিশটি দেহচ্যুত মুণ্ড নিয়ে এসে সম্রাটের সঙ্গে দেওয়ানী খাসের প্রাঙ্গণে দেখা করে। মুণ্ডগুলো থেকে রক্ত ঝরছিলো। বাদশার বিস্ফারিত দৃষ্টি। এই সেই পৃথিবী বিখ্যাত দেওয়ানী খাস। যার থাম, বারান্দা, দেয়াল, মেঝে হীরা, মাণিক্য, মরকতে মোড়া ছিলো। পাশের রঙমহলে উঠতো নূপুর নিক্কন।

সুগন্ধি জলের ফোয়ারা ঘরের মেঝে থেকে ওপরে উঠে চারিদিকে ছড়িয়ে দিতো বিভিন্ন ফুলের নির্যাস। দেওয়ানী খাসে লেখা রয়েছে—'স্বর্গ যদি কোনোখানে থাকে তবে এইখানে।' গুপ্ত সুড়ঙ্গপথে যমুনা থেকে জল বয়ে এসে ঠাণ্ডা রাখতো রঙমহল আর দেওয়ানী খাস। আমি যেন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি দেওয়ানী খাস সংলগ্ন গোসলখানার মেঝেতে স্নানরত শাহজাহানকে। ঠাণ্ডা গরম জল ঢালছে বাঁদীর দল। এক সময় সুরু হলো দানব আর দস্যুদের লুণ্ঠন। মাটি, দেওয়াল, ভিত খুঁড়ে খুঁড়ে সামান্য সোনাদানাটুকুও তারা নিয়ে চলে গেছে। দেওয়ানী খাসকে আজ মনে হয় এক অতি সাধারণ ভগ্ন দালান। দেওয়ানী খাস সংলগ্ন প্রায় অন্ধকার কুঠুরীগুলো দেখে বিশ্বাসই হয় না যে একদিন ওর ভেতর ঘুরে বেড়িয়েছে বেগম আর বাদশাজাদীরা। রূপ আর যৌবন নিয়ে চোখ ধাঁধিয়ে দিয়েছে যারা। বিলোল কটাক্ষ যারা হেনেছে এধার থেকে ওধার। আমি খুঁজে বেড়াই সেই অন্ধকার ছোট্ট কুঠুরী দুটো যেখানে বৃটিশরা বাহাদুর শাহ আর জিন্নতমহলকে বন্দী করে রেখেছিলো। দেওয়ানী খাস আর রঙমহলে চলেছিলো তাদের উৎসব। ডিনার, নাচ গান। মদের স্রোত বয়ে গিয়েছিলো সেদিন। বন্দী শাহজাহানের মতো বন্দী বাহাদুর শা পলকহীন দৃষ্টি নিয়ে দেয়ালের দিকে তাকিয়েছিলেন।

হঠাৎ ভেসে এলো কান্নার শব্দ। এসময়ে, এখানে, দেওয়ানী খাসের অভ্যন্তরে, প্রায় অন্ধকার ঘরে বসে কে কাঁদে? মুহূর্তে আমার চিন্তাধারাগুলো ভেঙ্গে গুড়িয়ে যায়। নেশার আমেজটা তখনো পুরোপুরি রয়েছে। চেঁচিয়ে ডাকলাম—'এই কোই হ্যায়?' আমারই কথার প্রতিধ্বনি ঘাত প্রতিঘাতের পর ফিরে এলো আজ দুপুরে দেওয়ানী খাসের এই মেহমানের কাছে। এই দরবেশের দরজায় কেউ কুর্নিশ্ করে বললে না—'বন্দেগী জাঁহাপনা।' আবার সেই কঁকিয়ে কান্না। বল্লাম—'কে কাঁদছো? জবাব দাও,

নইলে কোতল করবো, গর্দ্দান নেবো।' আমি তখনো পাথরটার ওপর বসে রয়েছি। যে পাথরটার ওপর এক সময় বসানো ছিলো ময়ূর সিংহাসন। নেশায় আরক্ত আমার দুই নয়ন। লাঠি ঠুক্ ঠুক্ করতে করতে এক বৃদ্ধ এসে আমার কাছে দাঁড়ালো। জীর্ণ, শীর্ণ, বয়সের ভারে নুইয়ে পড়েছে। শ্বেত শ্মশ্রু মাটি প্রায় স্পর্শ করেছে।

'তুমি কে?' প্রশ্ন করি।

'আলী হোসেন।' বৃদ্ধ জবাব দেয়।

'এখানে কেন এসেছিলে? কি করো তুমি?'

'আমি দেওয়ানী খাসের অন্ধকার কুঠরীগুলোতে ম্যাচ কাঠি জ্বালাই। সঙ্গে সঙ্গে চিরাগ জ্বলে ওঠে ওপরের হাজারো কাঁচের টুকরোতে। রোশনাই দেখে সাহেব বিবিরা আমার ঝুলিতে পয়সা ছুঁড়ে দেয়। যেখানে এক সময় ছিলো শুধু হীরে, মুক্তো, পান্না, চুণী আর মরকত। সেখানে আজ সব কাঁচ। হায় আল্লা! শকুনীরা চেটে পুটে সব খেয়েছে। সাহেব, আমি এখানকার প্রতিটি কামরার খবর রাখি। জেনেছি খুন, জখম, বেইমানী আর শয়তানীর কাহিনী। শুনবে তুমি? বলবো তোমাকে সব?'

'তুমি জানলে কি করে?' 'আমি জানবো না। আমার বাপ-ঠাকুর্দ্দা তার বাপঠাকুর্দ্দা, সবাই ছিলো মোগল বাদশাদের দরজী। আমি এক বেয়াকুব। সব ছেড়ে ছুড়ে এই কাজ করছি।' বৃদ্ধ কাঁপতে কাঁপতে বলে।

'তা তুমি কাঁদছিলে কেন?' আমি প্রশ্ন করি।

'দুদিন না খেয়ে আছি। ভুখে মরছি। একটা মাত্র মেয়ে। বউ মারা গেছে অনেককাল। মেয়েটার সাদী হয়নি। মেয়েটাই রোজগার করে খাওয়াতো। তা ইদানীং মেয়েটা বেঁকে বসেছে। রোজগারে বেরুতে চায় না।'

'মেয়েটা কি কাজ করতো?' প্রশ্ন করি।

'সাহেব, মেম, বাবু আর বিবিদের ঘুরিয়ে আনতো সারাটা

দিল্লী শহর। মস্‌জিদ, কেল্লা ঘুরিয়ে দেখাতো। সব কাহিনী শোনাতো, সারারাত কাটাতো বাবু আর সাহেবদের সঙ্গে। ভালো পয়সা পেতো, এখন আর যেতে চায় না।'

'কেন?'

'ওই নতুন যুগের হাওয়া। নতুন সব বুলি শিখেছে। ময়নার মতো আওড়ায়। মাথার ঠিক নেই। ইন্‌কিলাব। পার্টি আর এওনিয়ান্‌। নিশান, জমায়েত হওয়া, চীৎকার আর সড়কে সড়কে ঘুরে বেড়ানো। আগের দিনের কাজ আর করতে চায় না। আমি বুড়ো মানুষ। চিরাগ জ্বালিয়ে আমার আর কতো আয়। আজ দুদিন ভুখে মরে যাচ্ছি।'

মাণিব্যাগ থেকে টাকা বের করে বুড়োর হাতে গুঁজে দিই। দিলাম মোগল বাদশাহদের দরজীকে। বাবর, হুমায়ুন, আকবর, জাহাঙ্গীর, শাহজাহান, ঔরঙ্গজেব। সর্বশেষ বাহাদুর শাহ। এই দরজী বুড়ো জানেনা যে বাদশা বেগমের গল্প এখন আর কেউ শুনতে চায় না। কুর্ণিশের দিন ফুরিয়েছে অনেককাল। দেওয়ানী খাস্‌ ছেড়ে চলে আসবার সময় চোখের জল মুছতে মুছতে বাহাদুর শা'কে উদ্দেশ করে বলেছিলাম।

'জানো বাদশা। আমার অঞ্চলের একটি মানুষ। না, না, তুমি তাকে চিনবে কি করে। ভবিষ্যতের মানুষগুলোর কাছে ইতিহাস তাকে তুলে ধরবে। ভাত-মাছ খাওয়া, ধুতি-পাঞ্জাবী পরা, সেই মানুষটা ব্রহ্মদেশে তোমার সমাধির পাশে দাঁড়িয়ে গর্জে উঠেছিলো। বলেছিলো—'এ অন্যায়ের প্রতিশোধ আমি নেবো।' সে যে কি কাণ্ডটাই করলে। কাঁপিয়ে ছাড়লে চারদিক। তুমি তাকে দেখলে খুব খুশী হতে। তার মাথায় রাজমুকুট ছিলো না। রাজচ্ছত্র ছিলো না। তুমি তাকে সারাটা ভারতবর্ষ জায়গীর হিসেবে দান করলেও সে সুখী হতো না। সে ছিলো যোগী, সন্ন্যাসী, মহাপুরুষ। সর্বস্ব ত্যাগেই তার আনন্দ। সে আমাদের নেতাজী।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

নেফার সিয়াং ডিভিসানে রটুং প্রান্তরে মেলা বসেছে। এ মেলা আমাদের দেশের মেলা নয়। এ মেলায় বাউল একতারা বাজিয়ে গান করে না। রামায়ণের পট দেখিয়ে গ্রামের পটুয়া গান ধরে না। নাগর দোলায় পাক লাগায় না কেউ। মাটির ভাড়ে চায়ে চুমুক দেয় না। রঙীন মালা সাজিয়ে বসেনি কোনো পসারিনী। নেই গুড়ের হাঁড়ি, নেই মাটির কলসী, পোড়া মাটির পুতুলের রাশি নেই, নেই কাঁচের ফুলদানী, নেই চামড়ার জিনিষপত্র। আরো কতো কিছু নেই। নেই তেলে ভাজা পাঁপড়, কীর্ত্তনীয়ার খোল নেই, নেই যাত্রার পালাগান, নেই আতসবাজির রোশনাই আর ফুলঝুরি। কোথায় পাওয়া যাবে কাঁচাগোল্লা, সর ভাজা, মোয়া আর পাটালিগুড়ের সন্দেশ। মেলার প্রান্তরে নেই কবিগান, যাত্রা আর সার্কাস, নেই কবি গানে দু দলের মধ্যে সেই প্রতিযোগীতা বা কবির লড়াই। কবিওয়ালা আসরে নেমে মুখে মুখে গান বাঁধে। একদল অপরদলের উদ্দেশ্যে প্রশ্ন রাখে। এর নাম 'চাপান'। অপর দল আসরে নেমে তার উত্তর দেয়। তার নাম 'উতোর'। এভাবে চাপান ও উতোরে আসর সরগরম হয়ে ওঠে। এখানকার মেলার ছবিটা কিন্তু অন্য রকম। শুঁটকি মাছ, সাপের, শূকরের, কাঠবিড়ালী আর গিরগিটির পোড়া মাংসের গন্ধ সারাটা তল্লাট আমোদ করেছে। স্বল্প কাপড় পরিহিত লোকগুলো কেউ জড়িয়েছে ভালুক বা চিতা বাঘের ছাল, কেউ আচ্ছাদিত করেছে নিজেকে বৃক্ষ বল্কলে। কেউ বা স্রেফ ঘাস দূর্বা, লতাপাতা দিয়ে লজ্জা নিবারণ করেছে। ওরা পশুপাখীর দাঁত, নখ, ঠোঁট, চামড়া নিয়ে বসেছে। চলেছে ঝাড়ফুক্, তন্ত্রমন্ত্র। গাছের শিকড় বাকড় বেটে গিরগিটির সেদ্ধ পাকস্থলীর সঙ্গে

মিশিয়ে চিকিৎসা চলেছে। বন্য কুকুরের কামড়ে আহত রোগী চেঁচাচ্ছে। মুখ দিয়ে তার ফেণা গড়াচ্ছে। জল দেখে আতঙ্কিত হয়ে উঠছে কেউ, কেউবা হাত পা ছুঁড়ছে, খিঁচুনি বাড়ছে ক্রমশ। পিরকু পিন্‌টে অপদেবতাকে খুশী করবার জন্যে চলেছে মুখোশ নৃত্য। গয়টার রোগে আক্রান্ত রোগীর ছড়াছড়ি। প্রতি তিনজন লোকের ভেতর একজন গয়টার বা গলগণ্ডে ভুগছে। ওর তীব্র প্রকোপে হয়েছে বধির। এ ছাড়া রয়েছে মারাত্মক ধরণের সিফিলিস, চর্মরোগ, যক্ষ্মা আর কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত সব রোগী। সুযোগের সদ্ব্যবহার করছে ওঝা আর গ্রামের হাতুড়ে ডাক্তার। শিকড় বাকড়ের পাহাড় সাজিয়ে বসেছে ওরা। গণ্ডারের শিং চূর্ণ করে, ওরই প্রস্রাব, মধু আর নানা রকম গাছ গাছড়ার সংমিশ্রণে তৈরী করেছে অব্যর্থ ওষুধ। পিশাচ সিদ্ধ পুরুষ মুখে হাতে পায়ে উল্কী কেটে নিজেকে যতোটা সম্ভব কিম্ভূতাকার বানিয়ে নখ দর্পণে ভূত ভবিষ্যত বলছে। মাটিতে ধূলোর ওপর রেখা আর গণ্ডী টেনে মন্ত্র আওড়াচ্ছে। কোনোখানে বিক্রী হচ্ছে প্যান্থার, লেপার্ড আর হরিণের চামড়া। গিরগিটির মাংস হাড়, মজ্জা পুড়িয়ে তার তেলে কেউ সারাচ্ছে দরদ। বেদনা বিষের উপশম করছে। নেশায় লোকগুলো টং। আপঙের বন্যা বয়ে যাচ্ছে। গাঁজা টানছে কেউ। আফিং খেয়ে বুদ হয়ে অনেকে পড়ে আছে। বিরাট বিরাট গাছগুলোর তলায় তলায় সমবেত লোকগুলো আমোদ আহ্লাদে মাতোয়ারা। পোকা খাওয়া দাঁত। মঙ্গোলিয়ান ফিচার্স। মাথার চুল ছোট ছোট করে ছাঁটা। তাম্বূলে রঞ্জিত ওষ্ঠধর। স্বল্পবস্ত্রে স্ত্রী পুরুষে আকৃতি প্রকৃতিতে বিশেষ কোনো পার্থক্য চোখে পড়ে না। শুধু কদলী আকৃতি, উন্মুক্ত, আব্রুবিহীন, ঝুলে পড়া স্তনগুলো প্রভেদটা ধরিয়ে দেয়। মেয়ের:দলও কম নেশা করেনি।:আনন্দের আতিশয্যে এ ওর গায়ে ঢলে পড়ছে। পিঠ সংলগ্ন বেতের ঝুড়ির ভেতর থেকে ক্ষুদে

ক্ষুদে চোখ নিয়ে উঁকি ঝুকি দিচ্ছে মানব সন্তান। শিশুগুলো যে কি করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা চুবড়ীর ভেতর থেকে যায় ভাবলেও আশ্চর্য লাগে। কাঁদে না, চীৎকার করে না, সোরগোলে বাড়ী মাথায় করে না। আয়া, ঝি চাকরের জন্যে বায়না ধরে না। ঝুড়িবন্দী হয়ে গরমে আর ঘামে আলু সেদ্ধ হয়। মিনিয়ঙ্, পদম্, পাশি, পাঙ্গি, সিমঙ্গ, বরি, আশিঙ্ আর টাঙ্গাম্ ট্রাইবের লোকগুলো মেলায় এসে উৎসবে মেতেছে। মেলায় আসবার আগে মিথোন কেটে তার রক্ত ওরা সিয়াং নদীর জলে ঢেলেছে, দেবতা ডইনিপোলোর উদ্দেশ্যে মাংস উৎসর্গ করেছে। বলেছে —'তুমি সব কিছু দেখতে পাও। রাত কিংবা দিনে সব সময় তোমার সতর্ক চক্ষু আমাদের পাহারা দিচ্ছে। তুমি আমাদের ভালো কাজটা মনে রেখো। মন্দ কাজ দেখতে পেয়েও ভুলে যেও।' মেলায় আসার আগে অনেক স্রোতস্বিনীর জলে তারা পশুর তাজা রক্ত ঢেলেছে। মিথোনের রক্ত আর মাংস ছড়িয়েছে শিবকরণ, সিলে, সিরকি, লিম্বুকরণ আর ছুরাকরণের জলে। মৃত আত্মীয়স্বজনের আত্মাদের ডেকে ওই জল পান করতে বলেছে। গ্রহণ করতে বলেছে মিথোনের রক্ত আর মাংস। প্রার্থনা করেছে একান্তভাবে। মৃত্যুর পরেও যেন তাদের এরকম শান্তিপূর্ণ এবং আনন্দের জীবন হয়। সিয়াং ডিভিসানের রটুং প্রান্তরে চলেছে ভালুকের নাচ, বানরের খেলা, মিথুনের রেস্, হাতীর শক্তির পরীক্ষা। বয়ে যাচ্ছে আমোদ আর স্ফূর্তির ঢেউ। সব কিছুতেই চাপা উত্তেজনা। জুয়োতে মেতে উঠেছে মেয়ে পুরুষগুলো। টাকা পয়সার বদলে জিনিষপত্রের আদান-প্রদান চলেছে। নেফার আদি ট্রাইবের লোকগুলো চিরদিনই উদ্ধত প্রকৃতির ছিলো। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে বৃটিশদের দ্বারা আয়োজিত সদিয়ার মেলায় ট্রাইবস্‌দের ভেতর আদিরাই সর্বশেষ যোগ দিয়েছিলো। প্রকাণ্ড আর জাঁদরেল ভালুকটা দুপায়ের ওপর ভর

করে নাচছে। নাচার তালে হেলছে আর দুলছে। ভালুকটা মহুয়ার রস পান করেছে নয়তো ওকেও গিলিয়েছে আপঙ্। ধনুকে তীর যোজনা করে লক্ষ্যভেদের প্রতিযোগিতা চলেছে এদিকে ওদিকে। ওখানেও রয়েছে জুয়ো! লক্ষ্যভেদের সঙ্গে সঙ্গে চীৎকার উঠছে ঘন ঘন। জুয়োতে মেতে ওরা বচসা বাধাচ্ছে ঘন ঘন। তীর চলছে শন্ শন্ শব্দ তুলে। ছুটছে বাতাস ভেদ করে।

এই তীরের মাথায়ই ওরা মাখিয়ে নেয় বৃক্ষের বিষাক্ত নির্যাস। লক্ষ্যবস্তু তীরবিদ্ধ হয়ে বিষের প্রকোপে জর্জরিত হয়ে ধুঁকতে ধুঁকতে মারা পড়ে। হাতী, বাঘ, অজগর কারুরই এ বিষ থেকে পরিত্রাণ নেই। রটুং প্রান্তরে জুয়োর আড্ডায় টরা ময়াংকে দেখেছিলাম। ধনুকে তীর যোজনা করে সে লক্ষ্যভেদ করতে উদ্যত। টরা ময়াং এর সঙ্গে আমার আগেই আলাপ হয়েছিলো। ময়াং কিন্তু আমাকে দেখতে পায়নি। রটুং প্রান্তরে ভ্যাপসা গরম। আমার গায়ের জামাটা ঘামে ভিজে জ্যাব্ জ্যাব্ করছে। হাতী আর মিথোনের রেসে শুকনো লাল ধুলো উড়ছে বিস্তর। ধুলোতে শ্বাসরোধ হয়। হাওয়া নেই মোটেও, গাছের পাতাগুলো নড়ছে না। টরা ময়াংএর পাশে লোকদুটো আপঙ খেয়ে বমি করে ভাসিয়েছে। তার ওপর মাছি ভন্‌ভন্ করে শব্দ তুলে উড়ছে। হাতী আর মিথোনে নাদা ফেলছে গাদা গাদা। শূকরের দল মাটি খুঁটে খুঁটে কিসের যেন সন্ধান করছে। থিয়েটার নেই, যাত্রা নেই, চোখ ঝলসানো বিপনি নেই। ক্রয় বিক্রয়ের ঝামেলা নেই। কুটির শিল্পজাত দ্রব্যের চটক নেই। এ মেলার উদ্যোগ আর আয়োজন ট্রাইবসএর লোকেরা নিজেরাই করে থাকে। এ্যাড্‌মিনিস্‌ট্রেশনের কর্মকর্তাদের এতে বলবার কইবার কিছুই নেই। আমারও করবার কিছু নেই। উদ্দেশ্যবিহীন অবস্থায় প্রান্তরটা টহল দিচ্ছি। ঘুরতে ঘুরতে আবার প্রায় টরা ময়াং-এর

কাছাকাছি এসে পৌঁছেছি। তীর বেধার খেলায় ময়াং ভালো করে মেতেছে। সে গলায় আপঙ্ ঢালছে ঘন ঘন।

আজ কিছুদিন ধরে দেখছি রেঙ্গিন থেকে রটুং পর্য্যন্ত বিস্তৃত জঙ্গলের ভেতর রাস্তা হচ্ছে। ডিনামাইটে পাহাড়ের চাক্‌লা খসে পড়ছে ঘন ঘন। ধোঁয়া ধূলোয় প্রান্তর ঢেকে যাচ্ছে। ডিনামাইট ফাটার সঙ্গে মুহুর্মুহু রেঙ্গিনের অরণ্য কেঁপে কেঁপে উঠছে। বুলডোজারের ঘর ঘর নির্ঘোষের সঙ্গে সঙ্গে বিরাট বিরাট মহীরুহ মাটিতে লুটিয়ে পড়ছে। অরণ্যের মাটি চুম্বন করছে শেষ বারের মতো। সভ্যতার আলোর রশ্মি একটু একটু করে ঢুকছে নেফার অভ্যন্তরে। পা পা করে এগুচ্ছে। নেফাকে এতোদিন পর্য্যন্ত বলা হতো হিডেন্ ল্যাণ্ড বলে। শুধু সিয়াং ডিভিসানে নয়। সভ্যতা ঢুকছে কামেঙ্, সুবণসিরি, টিরাপ আর লোহিতে। সভ্যতার দাপট্, এ্যাড্‌মিনিস্ট্রেসনের প্রতাপ কোথাও বেশী, কোথাও কম। আজকের দিনে এক পাশে সরে দাঁড়িয়ে, বিশ্রামসুখ উপভোগ করবার অধিকার কারো নেই। জঙ্গল পরিষ্কার করে সেখানে ওরা গড়ে তুলবে সুরম্য অট্টালিকা, বিপণী, নগরী আর মনুষ্য উপনিবেশ। নদীগুলোর ওপর আর ঝুলবে না বিরাট বিরাট বেতের তৈরী সাঁকো। এদিক্ থেকে ওদিক্। সেখানে ব্রীজ হবে। ব্রীজগুলো সগর্বে মাথা তুলে দাঁড়াবে লোহা, পাথর আর কংক্রিটের ওপর ভর করে।

বাঁশের বাসা বাড়ীতে থুতনীতে হাত চেপে আঁক কষছে আর মাপ-ঝোক চালাচ্ছে সি. পি. ডবলু. ডির এ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনীয়ার। জঙ্গল সাফ করা রাস্তাঘাট বানানোর দায় দায়িত্ব সব তার। মহীশূরের অধিবাসী, তরুণ ইঞ্জিনীয়ার। চাকরির খাতিরে পাড়ি দিয়েছে অনেক দূরের পথ। মহীশূরের এক গ্রামে পড়ে রয়েছে তার স্ত্রী-পুত্র। বিকেল পর্য্যন্ত ইঞ্জিনীয়ার মন দিয়ে কাজকর্ম করে। সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এলে গভীর অরণ্যে সে বড্ডো

নিঃসঙ্গ জীবনযাপন করে। রাত কাটায় এই বাঁশের তৈরী বাড়ীগুলোতে যেগুলোকে এখানে "বাসা" বলে। এক বড্ডো অস্বস্তিকর পরিবেশ। জনমানবহীন অরণ্য। সম্প্রতি একটা নেকড়ে বাঘের দল বড্ডো উত্যক্ত করছে। গার্ডদের বলে কয়েও কিছু হয়নি। কয়েকদিন আগে আরদালীর ঘরে সন্ধ্যের পর ঢুকে একটি মানব শিশুকে মুখে করে পালিয়েছে। হাড় চামড়া দূরের কথা। এক ফোঁটা রক্তের সন্ধানও কেউ পায়নি। আরদালী আর তার স্ত্রী ট্রাইবদেরই লোক। স্ত্রীর এবং আরদালীর বিশ্বাস তাদের সন্তানকে নেকড়ের দল খায়নি। কি করেছে তা তারা মুখে বলে না। শুধু একটা আশা বুকে চেপে ধরে ওরা দিন কাটাচ্ছে। কিছুদিন আগে বেশ একটা চাঞ্চল্য জেগেছিলো। নেকড়ে বাঘের ডেনে একটি মনুষ্য শিশুকে দেখা গেছে। হাতে পায়ে ভর করে মনুষ্য সন্তানটি হাঁটছিলো। সন্ধ্যের অন্ধকারে গভীর জঙ্গলে কাঠ কাটতে গিয়ে যে দেখেছিলো সে এর বেশী আর কিছু বলতে পারেনি। কেউ বিশ্বাস করেছে। কেউ করেনি। মনুষ্য শিশুটির আর কোনো খোঁজ খবর পাওয়া যায়নি। নেকড়ের ডেন্ এবং মনুষ্য শিশুর সন্ধানে কটা দিন তারা বৃথাই পরিশ্রম করেছে। কোনো হদিশ মেলেনি। আরদালী আর তার স্ত্রীর মনে আশা হয়তো তাদের সন্তান বেঁচে রয়েছে। নেকড়েদের নাকি সন্তান লালন পালনের অসীম আগ্রহ রয়েছে। তা সে নিজেরই হোক্ কিংবা মানব সন্তান হোক্। কিছু যায় আসে না। ইঞ্জিনীয়ার নিজে সারাটা তল্লাটে তল্লাশি চালিয়ে মানব শিশুর কোনো সন্ধান পায়নি। আমি ঠাট্টা করে বলেছিলাম—'কোনোদিন হয়তো টারজানের সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে তোমার।' হেসেছিলো মহীশূরের ইঞ্জিনীয়ার। আমাকে পেয়ে ও আর ছাড়তে চায় না। দুরাত্রি ওর সঙ্গে গল্প গুজব করেছি। কতো খুশী হয়েছে ছেলেটি। কতো গল্প, কতো ঠাট্টা তামাশা আর হাস্য

পরিহাস। সঙ্গী পেয়ে ও যেন বেঁচে গেছে। আমাকে বলেছিলো —'পাশিঘাটের ডি. সি. কে আমার কথা বলবে তোমার সঙ্গে শুনেছি ডিসির খুব হৃদ্যতা রয়েছে। তুমি কিছু বললে তোমার কথা উনি ফেলতে পারবেন না। ডেপুটি কমিশনার একটু তদ্বির করলেই আমার পাশিঘাটে বদলীটা হয়ে যায়। চাই কি নেফার বাইরেও বদলীটা হয়ে যেতে পারে। আমাদের অফিস বস্ ডিসিকে খুব ভক্তি শ্রদ্ধা করেন।'

ওকে আমি কথা দিয়েছিলাম যে পাশিঘাটে ফিরে গিয়ে ডিসিকে ওর সম্বন্ধে বলবো। ইঞ্জিনীয়ার ছেলেটি রাত্রিবেলা আমাকে মহীশূরের গল্প বলেছিলো। আমি তাকে শুনিয়েছিলাম পূর্ব বাঙলার ইতিহাস। দুজনের অন্তঃকরণ দুঃখ, বেদনা, পুলকে বার বার মোচড় দিয়ে উঠেছিলো। কিছু সময়ের জন্যে আমরা নেফার কথা ভুলে ছিলাম। মহীশূরের অধিবাসী ইঞ্জিনীয়ার ছেলেটি শুনিয়েছিলো মৌর্য্য, গঙ্গ আর চোলদের ইতিহাস। ওর স্ত্রী নাকি প্রতি সপ্তাহে চামুণ্ডী পাহাড়ে পূজো দিতে যায়। মহিষাসুরের নাম থেকেই মহীশূর। চামুণ্ডা দেবী একে নিধন করেন। পুরোণো দিনের কর্ণাটক আজকের মহীশূরের চারদিকে ছড়ানো ছিটোনো রয়েছে। ইতিহাস আর ইতিহাস। শ্রীরঙ্গপট্টমের আশেপাশে কোনো এক জায়গায় থেকে ওর বাবা কনট্রাক্টারি করে। ইঞ্জিনীয়ারের স্ত্রীর সঙ্গে ইঞ্জিনীয়ারের বাবা-মার বনিবনা নেই। ছেলেটির ধারণা দোষটা ওর বাবা-মার। শ্বশুর শ্বাশুড়ীর গৃহে স্ত্রী থাকে না। সে আট বছরের ছেলেকে নিয়ে থাকে অন্যখানে। ইঞ্জিনীয়ারের বাবা নাতি পাগল। সপ্তাহে একদিন বুড়ো চলে আসে নাতির কাছে। সেখানে বুড়ো বধূমাতার সঙ্গে বাক্যালাপ পর্য্যন্ত করে না। জল গ্রহণ করে না ইঞ্জিনীয়ারের স্ত্রীর শত অনুরোধ সত্ত্বেও। নাতিকে সঙ্গে নিয়ে এদিক ওদিকে সারাটা দিন ঘুরে বেড়ায়। তারপর ইঞ্জিনীয়ারের বাবা ঘরে ফিরে আসে

অশ্রু-সিক্ত নয়নে, কয়েক ক্রোশের পথ পাড়ি দিয়ে। সব কথা বলতে বলতে ইঞ্জিনীয়ার কেমন যেন উদাস হয়ে যায়।

'জানো ছেলেটাকে একটু দেখতে ইচ্ছে করে। শ্রীরঙ্গপট্টমে মন্দির দেখে ছেলে চিঠি লিখেছে কান্নাড়ী ভাষায়।' কোটের পকেট থেকে সযত্নে চিঠিখানা বের করে ইঞ্জিনীয়ার সাহেব। 'মন্দির দেখে অনন্ত শয়নে বিষ্ণুর শায়িত মূর্ত্তি দেখে আর অন্যান্য অনেক কিছু ছ্যাখো দেখে ছেলে কি চমৎকার বর্ণনা দিয়েছে।'

বলে ইঞ্জিনীয়ার চিঠির ভাঁজ খুলে আমাকে দেখায়। অশান্ত পিতৃহৃদয়। আর একদিন অশান্ত হয়ে উঠেছিলো শ্রীরঙ্গপট্টম। টিপুর বলবীর্য্যে কেঁপে উঠেছিলো ভারতের বৃটিশ শাসনকর্ত্তার দল। কিন্তু সেই এক ইতিহাস। ভারতের ইতিহাস অন্য রকম হতে পারে না। কোনোদিন পারেনি। একদিকে পেশোয়া, নিজাম আর ইংরেজ, অন্য দিকে টিপু। আমিও পুব বাঙলার অনেক কাহিনী ওকে শুনিয়েছিলাম। সেদিন আমার খুব বেশী করে মনে পড়েছিলো পুব বাঙলার নদী-নালা, শ্যামল প্রান্তর, আর নীল আকাশ। পুকুর ঘাটে স্নানরতা বধূদের সলজ্জ মিষ্টি হাসি। বাতাসে ভেসে আসা পাকা ধানের গন্ধ। গ্রামের পথে একতারা বাজিয়ে বৈরাগীর গান। দুর্গোপূজোর উৎসবে ঢাকঢোলের শব্দ। আরো অনেক অনেক কিছু মনে পড়েছিলো। বেশী মনে পড়ে লাভটা কি! অন্তঃকরণ মোচড় দেবে। একটা ব্যথা মোচড় দিতে দিতে ওপরে উঠবে। ওরা আইন করে, শীলমোহরের ছাপ দিয়ে চুক্তিপত্র পাকা করেছে। আমাকে সব কিছু ভুলতে বলেছে। আমাকে ভুলতেই হবে। আমি ভুলতে চেষ্টা করছি। সত্যি করে বলছি আমি ধীরে ধীরে ভুলছি। দোহাই তোমাদের, আমাকে শুধু একটু সময় দাও। আর একটু সময়, মার কথা কি কেউ চট্ করে ভুলতে পারে।

যাক্ যা বলছিলাম, টরা ময়াংএর কথা বলতে সুরু করেছিলাম।

কিন্তু তার আগে আর একটু বলে নিই, খুব অল্পই বলবো। মহীশূরের বাসিন্দা, সি. পি. ডবলু, ডির ইঞ্জিনীয়ারের বদলীর জন্যে ডিসিকে অনুরোধ করেছিলাম। পাশিঘাটের ডিসি আমাকে কথা দিয়েছিলেন। কিন্তু তার আগেই অঘটন ঘটলো, সব শেষ হয়ে গেলো। ছোট্ট জীপের ভেতর ওরা দুজন ইঞ্জিনীয়ার বসেছিলো। জীপটা জঙ্গলা পথে একটু একটু করে অগ্রসর হচ্ছিলো। হঠাৎ সামনে প্রকাণ্ড হাতীর পাল পড়লো। জীপের এগুবার পথ নেই। পেছোবার উপায় নেই। হাতীর পালের ভেতর ষণ্ডামার্কা হাতীটা, আয়তনে প্রকাণ্ড, ওদের দলপতি হবে বোধকরি। ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে শুঁড় দিয়ে গোটা জীপটাকে বেষ্টন করলো। তারপর ছোট্ট জীপটাকে অনায়াসে শূন্যে তুলে শিশুর খেলনার মতো দেড়হাজার ফিট্ ওপর থেকে পাহাড়ের নীচে খাদের মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দিলো।

ইঞ্জিনীয়ারদের হাড়ের সন্ধানও মেলেনি। আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি চামুণ্ডী পাহাড়ে একটি কিশোরী পূজো দিতে চলেছে। স্বামীর কল্যাণ, পুত্রের কল্যাণের জন্য। পুত্র ক্রমাগত জিজ্ঞাসা করছে—'বাবা কবে ফিরবে?' বড্ডো ভালোবাসে সে বাবাকে। না, এসব বলতে আর ভালো লাগছে না। ফিরে যাই টরা ময়াংএর কাছে।

টরা ময়াং একটা গাছের নীচে বসে আছে। সে প্রায় উলঙ্গ, একফালি ন্যাকড়া সামনের দিকে ঝুলছে। লজ্জা নিবারণের সামান্য প্রচেষ্টা। মাটি কাটা হচ্ছে, আর পাহাড়ী পথে মাটি ভর্তি ঝুড়ি মাথায় বহন করে একস্থান থেকে অন্যস্থানে নিয়ে যাচ্ছে টরা ময়াং এবং তার মতো আরো অনেকে। স্ত্রী আর পুরুষের দল, সারি দিয়ে পাহাড়ী পথে ওঠানামা করছে মজদুরের দল। স্ত্রী পুরুষের জীবনে নূতন অভিজ্ঞতা। সভ্যতার নূতন স্বাদ আস্বাদন করছে ওরা। ওদের শ্রমের বিনিময়ে ওরা পয়সা পাবে না। পাবে বস্ত্র এবং আরো নানারকম প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র।

টরা ময়াং এক বোঝা ক্লান্তি নিয়ে গাছতলায় বসে জিরুচ্ছে। চর্মরোগে সারাটা শরীর ছেয়ে গেছে। ডানদিকের চোখের ডিমটা প্রকাণ্ড। গর্ত থেকে ঠেলে বেরিয়ে এসেছে। বাঁ চোখটাকে বসন্ত রোগে খেয়েছে। একটি গর্ত হা করে রয়েছে। গয়টারের তীব্র আক্রোশে গলাটা অসম্ভব রকম স্ফীত। টরা ময়াংএর পিঠে একটা কুঁজ। ডান গালের ওপর থেকে কে যেন এক খাবলা মাংস তুলে নিয়েছিলো। মাংস নিয়ে রেখে গেছে একটি ক্ষত আর বীভৎসতা। একটা বাবলা গাছের নীচে বসে কুৎসিৎ আর কদাকার চেহারার টরা ময়াং পাইপ টানছে। আফিং খেয়ে বুঁদ হয়ে আছে।

আশেপাশে অরণ্যে ডালিয়ার বর্ণবৈচিত্র্য। মাউনটেন্ এবনির উজ্জ্বল ছটা। লেডিজ লেসের অপূর্ব শোভা। পাহাড়ের ঢালে বন্দুক হাতে গোটা তিনেক শাস্ত্রী দণ্ডায়মান। পাহারা দিচ্ছে। বেয়নেটের ফলাগুলো সূর্য্যের আলো পড়ে ঝক্‌মক্ করছে। কখন পাহাড়ী লোকগুলো একটা কাণ্ড বাধিয়ে বসে তার ঠিকঠিকানা নেই। তোশাখানায় ঢুকে না একটা অনর্থ বাধায়। লুটপাটে মন দেয়। তাই সশস্ত্র এবং সতর্ক প্রহরীর ব্যবস্থা। স্বাস্থ্যবতী পাহাড়ী মেয়েগুলো পাহাড়ী পথে ওঠানামা করছে। অসমান, বন্ধুর পথে দেহভার না রাখতে পেরে ঘন ঘন পা পিছলে হুমড়ী খেয়ে পড়ছে। বেশবাস হচ্ছে অসংযত।

মুহুর্মুহু বুকের আবরণ যাচ্ছে সরে। উত্তাল, ফেনিল সমুদ্র যেমনটি তীরভূমে আছড়ে পড়ে সেই রকমই বুকের তটভূমিতে উত্তাল, উদ্দাম মাংসপিণ্ড দুটো আছড়ে পড়ছে। প্রতি প্রদক্ষেপে নাচছে, দুলছে এধার থেকে ওধার। হাঁটুর ওপর থেকে উঁকি দেয় সুডোল জঙ্ঘাদেশ। কালো, মসৃণ, সুপুষ্ট, মাংসল আর তৈল পিচ্ছিল।

সান্ত্রীদের হাতের মুঠোয় ধরা রাইফেলগুলো আলগা হয়। তাদের রক্তে লাগে দোলা, চোখে নেশা ধরায়। পায়ের

পাতাশুদ্ধ ভারী বুটজোড়া সচল হতে চায়। সান্ত্রী পা আর বুট দুই-ই মাটিতে চেপে ধরে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে জনমানবহীন অরণ্যে তাকে অসহ্য সেক্স নিপীড়ন সহ্য করতে হয়। দাঁতে দাঁত চেপে সে প্রহর গুনতে থাকে। রাতের অন্ধকারে এর মোকাবিলা আর ফয়শালা করবার দৃঢ় সঙ্কল্প নেয়।

পূর্বজন্মের ইতিহাস অবলীলাক্রমে বলতে পারে এমন অনেক জাতিস্মরের সন্ধান পাওয়া যায়। টরা ময়াং তাদেরই একজন। টরা ময়াং খুব সহজভাবেই তার পূর্বজন্মের ইতিহাস আমাকে বলেছিলো। টরা যখন মারা যায় তখন টরা ময়াংএর বৌয়ের বয়স পনেরো। মৃত্যুর বছরখানেক পরেই টরা অন্য ঘরে জন্ম নিলে। অন্য ঘরে নূতন জন্ম নিলে কি হয় পূর্বজন্মের সব কিছু টরার মনে রয়েছে। আগের জন্মের সমস্ত খুঁটিনাটি তার নখদর্পণে। তার বউ নাকি থাকে মেবো গ্রামে। বউএর বয়স এখন সাইত্রিশ আর তার বিশ। বউ এখন অন্যের হেপাজতে আছে। জিজ্ঞেস করলাম—'তুমি গেলে মেবো গ্রামে?'

'যাবো না কেন? আমার বউ, দাবী করবো না তাকে। না হয় মরে গিয়ে নতুন জন্ম নিয়েছি। সব কিছু আমার মনে রয়েছে। তাই চলে গেলাম বউ যেখানে থাকে সেই মেবো গ্রামে।' টরা ভাঙ্গাভাঙ্গা হিন্দী আর অসমীয়া ভাষা মিলিয়ে কথা বলছিলো।

'কি বললে তুমি?'

'বললাম বউটা আমার। যুদ্ধ করে আমি প্রাণ হারিয়েছি সত্যি। কিন্তু আবার জন্মেছি আমি। এবার আমার বউ ফেরত নিতে এসেছি।'

'বউ তো এতদিনে তোমার চাইতে বয়সে প্রায় দ্বিগুণ হয়ে গেছে।' আমি বলি।

'তাতে হয়েছে কি। বয়সে বড়ো হোক ক্ষতিটা কিসের।

তবু তো আমার আগের জন্মের বউ। তাছাড়া বউটা এখন যার কাছে রয়েছে, যার হেপাজতে রয়েছে সে বউটার চাইতে অনেক ছোট।' বলে টয়া।

'তা যাক্ গিয়ে। বউএর স্বামী কি বললে?' আমি প্রশ্ন করি।

'লোকটা বউটার স্বামী হতে যাবে কোন দুঃখে। ওকে সাদি করেছে নাকি যে মেয়েটা ওর বউ বনে যাবে। তাছাড়া লোকটার এমনিতে তিনটে বিয়ে করা বউ রয়েছে। লোকটা যুদ্ধে জিতে ছিলো। তাই পেয়ে গেলো কয়েকটা দাস আর দাসী। ক্রীতদাসী হয়ে রইলো আমার বউটা। আর ক্রীতদাসী হয়ে টিঁকে রইলো ওর সংসারে।'

আমার চট করে মনে পড়লো নেফাতে দাসপ্রথা চালু ছিলো। ধীরে ধীরে এ প্রথা লোপ পাচ্ছে। সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে, শিক্ষা প্রসারের দরুণ এবং এ্যাড্‌মিনিষ্ট্রেসনের চাপে পড়ে দাসপ্রথা ধীরে ধীরে লোপ পাচ্ছে। তবে পুরোপুরি লুপ্ত হতে সময় নেবে: রয়েছে এখনো, এখানে-ওখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে।

'তা তোমার বউএর কর্তা তোমার কথাবার্তা শুনে কি বললে?'

'বউটার মালিক হেসে মাটিতে গড়াগড়ি খেলে। বললে—তুই ধাপ্পা দেবার জায়গা পেলিনে। এখানে এলি ভাঁওতা দিতে, প্রবঞ্চনা করতে। প্রমাণ কি যে তুই ওর আগের পক্ষের স্বামী?' দিলাম প্রমাণ। বউটার ভাইএর নাম বললাম। পাঙ্গিনে থাকে, তা বললাম। বউটার একটা পিসী মরাং গ্রামে থাকে তার কথাও বলে দিলাম। পিসী আমার বউটাকে খুব ভালোবাসতো। কর্তা পিসীর খবর রাখতো না। বউকে জিজ্ঞাসা করামাত্র বউটা ঘাড় নেড়ে জানালে—হ্যাঁ আছে এক পিসী। লুকিয়ে লুকিয়ে পিসীকে সে অনেক ভেট্ পাঠিয়েছে। পিসী তার ওপর অনেক তুক্‌তাক্ করেছে। শিকড়-বাকড় বেটে খাইয়েছে। বউটার কর্তা কিছুই শুনতে চায় না। বলে, তোকে 'কেবাঙ্' এ

যেতে হবে। বিচারের জন্যে জনসভার কাছে আবেদন জানাতে হবে।'

টরা খানিকক্ষণ চুপ করে থাকে তারপর সুরু করে, 'মস্থুপের লড়াইতে আমি মারা পড়লাম। ওই যে রাত জেগে যেখানে গ্রামের অবিবাহিত ছেলের দল পাহারা দেয় তাকে "মস্থুপ" বলে। রাতের বেলা বিরুদ্ধ দল হঠাৎ আক্রমণ করে যাতে কেলেঙ্কারী না বাধায় তার জন্যে এ ব্যবস্থা। সিয়াং এর টাঙ্গামরা জোর আক্রমণ করলে। যুদ্ধের কেলেঙ্কারীর ভেতর আমিও পড়ে গেলাম। মৃত্যুর আগে দুটো জিনিষ স্পষ্ট মনে আছে। যুদ্ধজয়ের চিহ্ন স্বরূপ আমার ডান হাতখানা ওরা কচ্ করে কেটে নিয়ে গেলো। আর আমার বউটাকে আমার চোখের সামনে জোর করে ধরে নিয়ে গেলো। ক্রীতদাসী করবার মতলব। টাগিন্দের গ্রামে শুনেছিলাম অনেক ক্রীতদাসী জড়ো হয়েছে। বরিদের গ্রামেও সেই একই অবস্থা।'

'তোমার সঙ্গে তোমার আগের জন্মের বউএর এরপর দেখাশুনো হয়েছিলো?'

'হয়নি আবার, খুব হয়েছিলো। সুযোগ খুঁজছিলাম। পেয়ে গেলাম সুযোগ। জঙ্গলের পথে লতাপাতা কুড়োতে এসেছিলো আমার বউটা। তাকে বললাম—কেমন আছিস? বউটা বলল—তুই আমাকে চাইছিস কেনরে? ইস্ তোর চেহারাটার কি হাল হয়েছে?'

'নূতন জন্ম নিয়েছি। এ জন্মে চেহারার অনেক পরিবর্তন হয়েছে। চেহারা বদলালে কি হবে, মনটা বদলায়নি। তোর ওপর মায়া মমতাটা একটুও কমেনি।'

'তাই বলে এতো খারাপ চেহারা। কুঁজওয়ালা মানুষ আমার দুচক্ষের বিষ। তার ওপর গলগণ্ড, চোখটার ওই অবস্থা। কি বিশ্রী, মাগো! তোকে দেখলে গা ঘিন্‌ঘিন্ করে। কে তোর কাছে থাকবে বল দিকিন।'

'বউটা সাফ সাফ জবাব দেয়। কথায় একটু মিষ্টত্ব নেই। মনে হয় মনেপ্রাণে দয়া ভালোবাসার নাম গন্ধ নেই। ওর কাছে মানুষটার মনটা কিছু নয়। শুধু খুঁটিয়ে নাটিয়ে দেখতে হবে কুঁজটা আর গলগণ্ড রোগটা। আমার আর দোষটা কোথায়। আমি কি এসবের জন্যে দায়ী। মিগম্ (বাবু), আমার বউটা তোকে দেখলে যা খুশি হতো। তোর চেহারা আর গায়ের রংটা যদি ওর চোখে পড়তো, দেখতো তোর স্বাস্থ্যটা। তোর চেহারাটা যদি আমি পেতাম সারাটা বোরি আর টাগিন এলাকায় তাহলে মেয়েদের মনে ঝড় তুলতাম।

যাক গিয়ে, বউটাকে বললাম আমাকে দূরে ঠেলবি কি করে। আমি যে তোর আগের পক্ষের স্বামী।'

'তাতে হয়েছে কি ?' বলে মেয়েটা।

'বারে ! স্বামীর দায় দায়িত্ব রয়েছে না। আর ওই লোকটা তোকে বউ এর মর্য্যাদা দেয়নি। স্রেফ দাসী করে রেখেছে।' বলে টরা ময়াং।

'জানো মিগম্। খেয়ে দেয়ে মেয়েটার যা চেহারাখানা হয়েছে। গায়েগতরে, পাছা পেটে, বেশ পুরুষ্ট। সারা অঙ্গে মাংস জমা হয়েছে অনেকটা, চেহারায় চাকচিক্য এসেছে। মনে হলো খেয়ে দেয়ে ভালোই আছে। দাসীর দুঃখকষ্ট ওকে ভোগ করতে হচ্ছে না।'

বউটা বললে, 'তোর কাছে ফিরে গিয়ে কি হবে। তুই আমাকে খেতেই দিতে পারবিনে। হাতীর মাংস খাওয়াতে পারবি ? শুয়োরের চর্ব্বি খাওয়াতে পারবি ? ভালুকের কল্জে ভাজা করে দিতে পারবি ?'

'আমি তো শুনে থ।' বউটা আরো বললে।—তোর ওখানে না খেয়েই মরবো আমি। তাছাড়া তোর এরকম বদ্‌খত চেহারা। তোর সঙ্গে থাকলে আমার মনটাই খারাপ থাকবে সারাদিন। ভালো লাগবে না কিছু।'

'শোনো মিগম্। মেয়ের কথা শোনো। পাথরের মালা দেখিয়ে বউ বলে, ছাখ্। কতো রকমের পাথরের মালা আমাকে আমার কর্ত্তা দিয়েছে। তুই বলছিস, এসব ছেড়ে তোর সঙ্গে যেতে। তা হয় না।'

'ভেবেছিলাম কেবাঙ্ এর হুকুম মতো ক্ষতিপূরণ দিয়ে, মিথোন আর শূকর ভেট্ দিয়ে বউটাকে খালাস করে নূতন করে ঘর পাতবো। কিন্তু বউটা বেঁকে বসলো। কিছুতেই আসবে না।'

টরা গলগণ্ডে হাত বোলায়। কুঁজ চুলকায় আর পাইপ টানে। ভীষণ চিন্তাগ্রস্ত সে। বনে জঙ্গলে, ঝোপ ঝাড়ে, আগাছা আর পুরনো লতাপাতায়, আগুন লাগিয়েছে। জঙ্গল পুড়িয়ে সাফ করবে। পোড়া জমিতে চাষ হবে। সরকারি তত্ত্বাবধানে ফলন হবে। আগুন দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জঙ্গলের পপি গাছগুলো পুড়ছে। পপি গাছের পাতা, ফুল, কুঁড়ি, বীজ, সমস্ত কিছু পুড়ছে। কুণ্ডলীকৃত ধোঁয়া আকাশের দিকে উঠে যাচ্ছে। সেই ধোঁয়ার মধ্য দিয়ে শূন্য পথে ঝাঁকে ঝাঁকে পাখী উড়ে যাচ্ছে। আবার ফিরে আসছে। আবার উড়ে যাচ্ছে। হরিয়াল, ঘুঘু, শালিক, নীলকণ্ঠ। আরো হরেক রকমের পাখী। উড়ে উড়ে ক্লান্ত হয়ে জোড়ায় জোড়ায় তারা জঙ্গলের পথে বসে গেছে। বসে বসে ঝিমুচ্ছে। ঢুলছে। পপি ফুলের গাছ পুড়েছিলো, সেই ধোঁয়া প্রাণ ভরে টেনে তারা মাতাল হয়েছে। নেশায় বুঁদ হয়ে জমির ওপর বসে ঢুলছে। আশপাশ দিয়ে মনুষ্য আর জন্তু জানোয়ার গেলেও তারা গ্রাহ্যের মধ্যে আনছে না। পাখীরাও নেশা করতে অভ্যস্ত।

'জানিস মিগম্। বউটার শেষ পর্যন্ত আমার কথার ওপর অবিশ্বাস ছিলো। বললাম—মনে আছে একরাতে পর পুরুষের সঙ্গে ঢলাঢলি করছিলি, আমি ঘরে ফিরে এসে সব দেখতে পেয়ে কাটারীর কোপ বসিয়েছিলাম তোর উরুতে। অনেক রক্ত

ঝরেছিলো। ক্ষতের দাগটা নিশ্চয় এতোদিনে মিলিয়ে যায়নি। ও কেমন যেন চমকে ওঠে। হাঁটুর ওপরের আবরণটা আস্তে আস্তে তুলে ধরে। হ্যাঁ যা বলেছিলাম, ক্ষতের চিহ্ন জ্বলজ্বল করছে। এরপর ও আমাকে অবিশ্বাস করেনি। কিন্তু ওই এক গোঁ। তোর চেহারাটা বড্ডো বিশ্রী। মেয়েছেলে দেখে আঁৎকে উঠবে। তাছাড়া তুই আমাকে ভরণপোষন করতে পারবিনে। আর পারবিনে কেবাঙএর আদেশ মতো ক্ষতিপূরণ যোগাড় করতে।'

টরা ময়াং খানিকক্ষণের জন্যে চুপ করে। নিবিষ্টমনে পাইপ টানতে থাকে। এরপর আবার সে সুরু করে, 'এরপর কটা দিন আমার খুব পরিশ্রম গেছে মিগম্। বউটার পিছনে পিছনে আমাকে ঘুরতে হয়েছে। করতে হয়েছে অনেক মেহনত। বলতে হয়েছে অনেক মিষ্টি মিষ্টি কথা। শোনাতে হয়েছে অনেক আবেদন-নিবেদন। অনেক কাকুতি মিনতি।

একদিন বউটা সিয়াং এ স্নান করতে যাচ্ছিলো। একলা পেয়ে কাছে ডাকলাম। বললাম—আমাদের ছেলেটার কথা। একমাত্র সন্তান ছিলো আমাদের। ও কেমন যেন আনমনা হয়ে গেলো। থমকে দাঁড়ালো। খনিকক্ষণ আমার মুখের পানে চেয়ে রইলো। বললাম—আমাদের সেই কচি নধর হৃষ্টপুষ্ট ছেলেটার কথা। মুখখানা যার ছিলো ঢলঢলে। হাত পা কচি কোমল। একরাশ কোকড়ানো চুল। পটলচেরা চোখ। কুচকুচে কালো রং। বল্লাম, মনে নেই তোর সেই কচি ছেলেটার কথা। খানিকক্ষণ চুপ করে রইলো বউটা, কি যেন ভাবলে।'

আমি বললাম, 'তোমার বউ-এর কি নাম ছিলো?'

'ওর নাম ছিলো ইয়ানি।'

'তোমার ছেলেটা এখন জীবিত নেই।'

'কবে মরে ভূত হয়ে গেছে। চিতে বাঘে টেনে নিয়ে গিয়েছিলো।

'কিন্তু ইয়ানির কেমন যেন বিহ্বল অবস্থা। ভেজা ভেজা গলায় বলল—হ্যাঁ। খুব মনে আছে ওর কথা। ছেলেটার কথা আমার খুব মনে পড়ে। বড্ডো ন্যাওটা ছিলো আমার। তোর ছেলেটার কথা মনে আছে দেখছি।'

'সব মনে আছে বলেই তোর কাছে ছুটে এসেছি। ওরকম একটা সন্তান সারাটা তল্লাটে ছিলো নাকি?'

'যা বলেছিস্। বড্ডো সুন্দর ছিলো ছেলেটা। এর পর আমার গর্ভে আর কর্তা টাপিক্ পাঙ্গুর ঔরসে ছেলেপিলে হলো। কিন্তু ওরমকম একটা ছেলে আর ঘরে আসেনি। মাঝে মাঝেই ওর কথা আমার মনে পড়ে।'

'ইয়ানি কেমন যেন উদাস হয়ে যায়। চোখটা তার জলে ভরে ওঠে। আমার দিকে তাকায় ঘন ঘন। আমাকে দিয়ে আর একটা ওরকম সন্তান চায় কিনা কে জানে। জানিস মিগম্। ইয়ানি একসময় বলে—টাপিক্ পাঙ্গুর সঙ্গে সারাটা তল্লাট কম ঘুরিনি তো। কোথায়ও ওরকম একটা সুন্দর ছেলে নজরে এলো না। আমাদের বাচ্চাটার মতো একটা বাচ্চাও চোখে পড়লো না আমার। উত্তর সিয়াংএ ছিলাম বেশ কিছুদিন। টওয়াঙ্ আর টাঙ্গামদের ঘরে ঘরে ঘুরেছি। অমনটি আর চোখে পড়ে নি।'

'বড্ডো মনে পড়ে ছেলেটার কথা—আর সঙ্গে সঙ্গে তোর কথা।' বলেছিলো টরা ময়াং।

বউটা ফের সুরু করে—সিয়াংএ বরিদের গ্রামে ছিলাম। টাগিনদের গ্রামে নেলী ডারিঙ-এর সঙ্গে আলাপ হয়েছিলো। সে বলেছিলো ছেলেটার মৃত্যুর জন্যে দায়ী নিশ্চয়ই কোনো অপদেবতা। এ নিশ্চয় উইইউ অপদেবতার কাজ।'

'হয়তো তাই হবে।' সমর্থন জানিয়েছিলো টরা ময়াং।

টরা বলে, 'বউটার মন গলেছিলো একটু একটু করে। ওর মায়া-দয়ার পরিমাণও একটু একটু করে বাড়ছিলো আর

বাড়ছিলো। দুপুরে আর বিকেল সন্ধ্যায় জংলাপথে ইয়ানি একলা বেরিয়ে পড়তো যখন তখন। বেরিয়ে পড়তো বাইসনের ধারালো শিং-এর পরোয়া না করে। দাঁতাল্যে হাতীগুলোকে থোড়াই কেয়ার করতো। নেকড়ের থাবার চিন্তা করতো না এই এতোটুকুন। এদিক ওদিক ঘুরতো বেপরোয়া ভাবে। ছেলের আলোচনার পর থেকেই কেমন যেন উদাসীন। কেমন অলস গতি। দৃষ্টিটা যেন কেমন কেমন। বলতো—ছেলের কথা বল্ দিকিন্। প্রাণ ভরে শুনি।'

'জানো মিগম্। ছেলের গল্প শুনে ওর যেন আর আশ মিটতে চাইতো না। শুনতো। খালি খালি শুনতো। আমারও সুযোগ মিললো। লাগাতার ছেলের কাহিনী বলে যাই। সঙ্গে সঙ্গে আদরের বন্যা বইয়ে দিই। বউটা যেন সহজেই আমার কাছে ধরা দেয়।'

টরাময়াং এর চোখে মুখে কিসের যেন একটা আবেশ। ভাববিহ্বল অবস্থা। পাইপ টানছে আর ভাবছে। ঝোপে ঝাড়ে বনমোরগ ডাকছে। প্রচুর রঙীন জংলা ফুলের সমারোহ।

টরা বলে, 'একদিন ইয়ানি আমাকে বললো—শুনেছি। এ জন্মে ক্রীতদাসী হয়ে থাকলে মৃত্যুর পরে নাকি ক্রীতদাসী হয়ে থাকতে হয়। তোর মতামতটা শোনা দেখি।'

'বললাম—আমিও ঠিক ওরকমই শুনেছি। সবাই তাই বলে। এ জন্মে যে রকমটি থাকবি মৃত্যুর পরপারে পৌঁছে ঠিক তেমনটি থাকতে হবে। দেখছিস না তোদের কর্তাকে। দাস দাসী, মিথোন আর নিজের সম্পত্তি ক্রমশঃ বাড়িয়ে যাচ্ছে। এর কারণটা কি ভেবে দেখেছিস কখনো। বাড়িয়ে যাবার কারণ যাতে মৃত্যুর পরও ঠিক এরকম বহাল তবিয়তে দাসদাসী, বউ ঝি নিয়ে রাজার হালে থাকতে পারে।'

'আমাকে মরবার পরও ক্রীতদাসী হয়ে থাকতে হবে। এই তুই বলতে চাস। তোর তাই মনে হয়?'

'জানো মিগম্। মনে হয় কে যেন একরাশ দুশ্চিন্তা ইয়ানির মুখে চোখে লেপে দিয়েছে। আমিও সুযোগ ফসকাতে দিইনে। বলি সেইজন্যেই যে আমি তোকে নিয়ে যেতে এয়েছিলাম। নিজের গ্রামে গিয়ে তোকে নিয়ে নূতন করে ঘর সংসার পাতবো। চেষ্টা করে দেখবো ও রকম ডাগর চোখ, কোকড়াচুল, নধর গড়নের একটা সন্তান তোকে উপহার দিতে পারি কিনা। তা তুই আমাকে পাত্তাই দিতে চাসনে। হেসে খেলে বেড়াস। আমার চেহারা নিয়ে খোঁটা দিস্।'

আমি অবাক হয়ে টরার গল্প শুনছিলাম। হুঁশই ছিলো না কোনো দিকে। ডিনামাইটে পাহাড় ওড়াচ্ছে। ধুলো বালিতে আচ্ছন্ন করেছে সব দিক। বুলডোজার শুইয়ে দিচ্ছে গাছগাছালি। অরণ্যে সভ্যতা ধীরে ধীরে প্রবেশ করছে। অরণ্য আর অরণ্য। আমি মনে মনে ভাবি কবে ওদের মন থেকে কুসংস্কারগুলো দূর হবে।

'তারপর কি হলো?' সাগ্রহে প্রশ্ন করি।

'বউটাকে বললাম তাহলে চলে আয় আমার সঙ্গে।'

'তুই কি কেবাঙ এর আদেশ মতো ক্ষতি পূরণ দিতে পারবি? ছেলেমেয়ে নিয়ে তোর ঘাড়ে সংসারটা চাপাবো কোন ভরসায়। আমার এরকম যৌবন নিয়ে তোর মতো একটা কদাকার চেহারার লোকের সঙ্গে ঘরবাঁধা মাগো সে যে কি কষ্ট তুই বুঝবিনে। এখানে খাওয়া দাওয়ার কোনো ত্রুটি নেই। হাতীর মাংস থেকে ভালুকের কলিজা ভাজা, সব হাতের কাছে। গোগ্রাসে খালি গিলে যাও। ফাই ফরমাস খাটার লোকের অভাব নেই। বহাল তবিয়তে রয়েছি। তোর কাছে গেলে শুকিয়ে যাবো, বুড়িয়ে যাবো। ভালো কথা, তোর বয়সের কথা ভেবে দেখেছিস্। নূতন জন্ম নিয়ে তুই আমার চাইতে বয়সে কতো ছোট। ভেবে দেখেছিস্ সে কথা?'

'তাহলে তুই এখানে দাসী হয়েই মরতে চাস? আর মরবার পর ওই দাসী হয়েই কাল কাটাতে চাস্। ফের জন্ম নিবি যখন তখন ক্রীতদাসী হয়েই জন্ম নিবি। সেটা কেমন হবে কখনো ভেবে দেখেছিস্? ইয়ানি কিভাবে কে জানে।' একটু সময় চুপকরে থেকে টরা বলে—'দেখে নিস্ মিগম্। আমি এর একটা বিহিত করবোই করবো। মিথোন ভেট্ না দিতে পারি অন্য কোনো উপায়ে ইয়ানিকে মুক্ত করবো। ওর কর্তার হাত থেকে যেমনভাবে পারি ওকে ছিনিয়ে নিয়ে আসবো। ইয়ানির কোনো বাধা আমি মানবো না।'

টরাময়াং এর চোখ দুটো রাগে জ্বলতে থাকে। ওর গর্জনের সঙ্গে ডিনামাইটের গর্জনের যেন খানিকটা মিল খুঁজে পাওয়া যায়। আমি কি বলবো। ও একটু ঠাণ্ডা আর সুস্থির হলে ওকে বোঝাতে চেষ্টা করি। আমি বলি—'ছাখো ভাই স্বাধীন ভারতে কেউ আর দাস দাসী হয়ে থাকবে না। ভারত সরকার আর তা থাকতে দেবে না! ধীরে ধীরে সবাইকে মুক্ত করে দেবে। প্রতিটি মানুষ হবে স্বাধীন আর মুক্ত। অন্যের তাঁবেদারী করবার দরকারই হবে না আর সরকারের এর বিরুদ্ধে অভিযান সুরু হয়ে গেছে। প্রত্যেকটি মানুষ হবে ভারতের স্বাধীন নাগরিক।' টরা ময়াং কি বুঝেছিলো সেই জানে। আমার মুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল্ করে তাকিয়ে ছিলো। পুরুষ কাঠবিড়ালীটা মেয়ে কাঠবিড়ালীটার পিছু ধাওয়া করেছে। মেয়ে কাঠবিড়ালীটা লাফ ঝাপ দিচ্ছে। পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। নাম না জানা পাখীটা সহধর্ম্মিণীর চঞ্চুতে চঞ্চু ঘষছে।

কথায় কথায় কোথায় চলে এসেছি। গাল গল্পে মেলা থেকে চলে এসেছি অনেকটা দূরে। মেলার খোঁজ খবর না দিয়ে অন্য গল্পে মেতে উঠেছিলাম। মেলাতে ভালুকের খেলাটা খুব জমে উঠেছে। দুপায়ের ওপর ভর করে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে ভালুকটা

নেচে বেড়াচ্ছে। আপঙ পান করেছে নাকি? ভীষণভাবে টলছে। হাসি আর উচ্ছ্বাসে গড়িয়ে পড়ছে গালঙ ট্রাইবের লোকগুলো। পুরুষ্ট আব্রুবিহীন স্তন আর ভারী নিতম্ব নিয়ে মেয়েগুলো ঘুরে বেড়াচ্ছে। হাসছে মিটি মিটি। প্রান্তরে গাছ-গুলোর নীচে মেলা বসেছে। ভালুকটা পা তুলে নাচছে। টরা ময়াং ধনুকে তীর লাগিয়ে লক্ষ্যভেদে ব্যস্ত। শুঁটকি মাছ আর পোড়া মাংসের গন্ধে বাতাস ভরপুর। হঠাৎ টরাময়াং ঘুরে দাঁড়ালো। লক্ষ্য করলো ভালুকটার বক্ষদেশ। তারপর ধনুকের জ্যা থেকে তীর ছুটলো বাতাস কেটে শন্‌শন্‌ শব্দ করে। সবকিছু আচমকা। আর ঘটলো চোখের পলকে। তীরটা মুহূর্তমধ্যে গিয়ে ভালুকটার বক্ষোস্থলে বিদ্ধ হলো। ভালুকটা একটা চীৎকার করে কয়েক পা এগিয়ে গেলো। এগিয়ে গেলো টল্‌তে টল্‌তে। তারপর হুমড়ি খেয়ে গড়িয়ে পড়লো মাটিতে। ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত ছুটলো। বিষের ক্রিয়া স্থুরু হয়ে গেছে। হাত পা ছুঁড়ছে ভালুকটা। চীৎকার শুনেই আমার কেমন যেন সন্দেহ হয়েছিলো। এবার দেখলাম ভালুকটা মুখের ওপরকার মুখোশটা টান দিয়ে খুলে ফেলেছে। দৌড়িয়ে এগিয়ে গিয়ে দেখলাম মুখোশের অন্তরালে আর একটা মুখ। মানুষের মুখ। ট্রাইবের লোক। যন্ত্রণায় দাঁত মুখ খিঁচোচ্ছে, হাত দিয়ে দুর্বাঘাস উপড়োচ্ছে। বিষের ক্রিয়ায় শরীরটাকে আছড়াচ্ছে, দাপড়াচ্ছে। মুখটা ক্রমশ নীল হয়ে যাচ্ছে। মুখ থেকে ফেনা গড়াচ্ছে। পানাসক্ত পুরুষ মেয়েগুলো সব কিছু ফেলে দৌড়িয়ে এসে ভীড় জমায়। চীৎকার আর চেঁচামেচি স্থুরু হয়। বুঝতে পারলাম ভালুকের ছদ্মবেশ ধরে কোনো একজন ট্রাইবের লোক মেলার লোকগুলোকে আনন্দ বিতরণ করছিলো। হঠাৎ এ অঘটন, এ সাংঘাতিক কাণ্ড। স্থুরু হয়েছে জনতার কোলাহল। হঠাৎ এরি মধ্যে কে যেন আমার হাত ধরে টান দেয়, তাকিয়ে দেখি টরা ময়াং। হাসিতে ওর সারা মুখখানা উজ্জ্বল।

—'মিগম্, ইয়ানিকে মুক্তি দিলাম। ইয়ানির কর্তাটাকে তীর মেরে শেষ করে দিলাম। ছুটি পেলো ইয়ানি। ওর আর ক্রীতদাসী হয়ে থাকতে হবে না। কর্তার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে কর্তা যেসব দাস দাসী ধরে এনেছিলো নিয়ম আর রীতিনীতি মেনে দিয়ে সবাইকে মুক্ত করে দিতে হবে। কর্তা যতোদিন জীবিত ছিলো ততোদিনই ওদের প্রয়োজন। কর্তার আত্মার মঙ্গলের এবং তুষ্টির জন্যে এখন ভালো কাজকর্ম অবশ্যই করতে হবে। ওদেরকে এবার ছেড়ে দিতে হবে। ইয়ানি মুক্তি পেলো, নূতন জীবনের সন্ধান পেলো। কিন্তু আমি আর ইয়ানির পাশে থাকতো পারবো না। কেবাঙ্ হয়তো আমাকে মৃত্যুদণ্ড দেবে। আমি তীরে বিষ মাখিয়ে ইয়ানির কর্তাকে মেরেছি। আমি খুশী ইয়ানি মুক্তি পেলো।' রটুং প্রান্তরে ধীরে ধীরে অন্ধকার নেমে আসছে। আমার অন্তঃকরণটা মোচড়াতে সুরু করেছে। মেলা ছেড়ে আমি চলে আসি।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ইয়ামবুং ফরেষ্ট বাংলোতে বসে গল্প করছিলাম রমাদির সঙ্গে। রেঞ্জার সাহেব চাকলানবীশের স্ত্রী রমা চাকলানবীশ। রেঞ্জার সাহেব জঙ্গল টহল দিতে বেরিয়েছিলেন। রাত্রিরের দিকে ফেরবার কথা ছিলো। রমাদিদের সঙ্গে প্রথম আলাপ শিলংএ। তারপর জোড়হাট। তারপর আবার দেখা হলো নেফার ইয়ামবুং জঙ্গলে। বাংলোর আশেপাশে বৃক্ষ-লতাগুল্মের সমারোহ। শাল, সেগুন গাছের বন। বিরাট বিরাট মহীরুহ মৃত্তিকা থেকে রস নিংড়ে বলিষ্ঠ আর সতেজ। শাখা প্রশাখা ছড়িয়েছে উর্দ্ধদিকে। বলিষ্ঠ কাণ্ড, বিরাট পরিধি আর ব্যাস। রসের সন্ধানে মৃত্তিকার নীচে শিকড় বাকড় ছড়িয়েছে অনেক দূর পর্য্যন্ত। রক্ত গাঢ় সিঁদুর কপালে, সিঁথীতে, সর্বাঙ্গে লেপন করে আকাশটা হয়েছে লালে লাল। কতোক্ষণ বাংলোতে বসে রমাদির সঙ্গে গল্প করেছিলাম খেয়ালই ছিলো না।

রমাদি হঠাৎ প্রশ্ন করে, 'আচ্ছা তুমি কখনো প্রেমে পড়েছো?' আচ্‌মকা প্রশ্ন। ওর জন্যে প্রস্তুত ছিলাম না।

বললাম—'না তো।'

'যা মিথ্যে কথা বলছো।' বলে রমাদি।

'পরীক্ষা পাশের পরে চাকরির জন্যে অনেক হয়রানি, অনেক মেহনত। এখান থেকে ওখানে ঘুরেছি। দারিদ্র্যের কশাঘাত বড্ডো নির্মম। দুএক জায়গায় এটা ওটা করে, চাকরি নামক বস্তুটির পশ্চাদধাবন করতে করতে, অর্থসমস্যার জটিল জালে জড়াতে জড়াতে অবশেষে এক সময় স্কুল মাষ্টারের চাকরি নিয়ে নেফায় পৌঁছে গেলাম। বলতে পারেন এ পর্য্যন্ত সময়টুকুন প্রেমের কসরৎ করবার সুযোগ পেলাম না।'

রমাদি আজ অদ্ভুতভাবে সেজেছে। কবরী রচনা আর বেণী-বন্ধনে যথেষ্ট মেহনত করেছে। দক্ষতার পরিচয় দিয়েছে। কেশ বিন্যাসে এনেছে নিজস্ব ঢং। ফুলদানীতে রয়েছে রজনীগন্ধা আর চন্দ্রমল্লিকা। শ্বেত পাথরের বাটিতে যুঁইফুল। দিন কয়েক হলো ইয়ামবুংএ এসেছি। আমার আর রমাদির ভেতর এ কদিনে হৃদ্যতাটা বেশ জমাট বেঁধেছে। নিস্তব্ধ আর নির্জন প্রান্তরে, শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্যে, সভ্য জগত থেকে অনেকটা দূরে এসে পরস্পর পরস্পরের অনেকটা কাছাকাছি এসে গেছি। অন্তঃকরণের প্রাচীরটা ডিঙিয়েছি অতি অনায়াসে। পাশিঘাট থেকে ইয়ামবুং আর ইয়ামবুং থেকে বোলেং। মাঝে রয়েছে রেঙ্গিন, পাঙ্গিন, রটুং। অরণ্য আর অরণ্য। রমাদিদের ওখানেই আতিথ্য গ্রহণ করেছিলাম। আজ তৃতীয় দিন। কতো কথা, কতো গল্প, গান আর ঠাট্টা তামাশা। হৃদয় নামক খাঁচাটির বন্ধ দরজা খুলে দিয়েছিলাম।

'আচ্ছা তোমার প্রেমে পড়বার সাধ জাগে না?' প্রশ্ন করে রমাদি।

'প্রেমে পড়বার সাধ, বাসনা কার জাগে না বলুন দেখি। যে মুখে বলে না, সে মনে চুপি চুপি চেপে রাখে। অস্বীকার করে, সাজে ভণ্ড আর প্রতারক। কিন্তু জানেন তো এক হাতে তালি বাজে না। আবেদন নিবেদন শুনবার লোক কোথায়? কে আমার জন্যে পিঁড়ি পেতে বসে আছে?' রমাদির সিঁথীর সিঁদুরের ফোটাটা একটা ডাগর চাঁদের মতো চেয়ে আছে। —'আর দেখতেই পাচ্ছেন চেহারার ছিরি। প্রেমে পড়বার আগে মেয়ে ভাববে আর ভাববে।'

'না গো, চেহারাটা কিছু নয়। চেহারার প্রতি আমার খুব আকর্ষণ নেই। চেহারার প্রতি শ্রদ্ধা হারিয়েছি অনেক কাল। রঙ রঙীনের নেশায় মেতে ওঠা ঠিক নয়। আকাল

ফল শেষ পর্য্যন্ত হাত পেতে নিতে হতে পারে। দেখতে হবে মানুষটাকে। তার দিল্, মেজাজ আর মনটাকে।'

'প্রেমে পড়বার আগে কে আর অঙ্ক কষতে বসে বলুন দেখি। জ্যামিতির ছক নিয়ে কে আর মাথা ঘামায়। ভাবে হিসেব নিকেশ চুলোয় যাক।'

'প্রথমে মাথা না ঘামালে শেষে ঘামাতে হয় বৈকি। তুমি বাপু কেমন যেন। বড্ডো উদাসীন। আমার মনে হয় তোমার মনে মেয়েরা সহজে সাড়া জাগাতে পারবে না। শুধু নিরেট দেখালে মাথা ঠুকে ঠুকে হাঁফিয়ে উঠবে।' বলে রমাদি। রমাদি আমার চাইতে দু তিন বছরের বড়ো। 'উঠতি বয়সে চোখে যখন রঙের নেশা তখন মনের দরজায় কুলুপ এঁটে বসে থেকো না যেন।' তারপর চোখের রঙ মিলিয়ে গেলে শুধু হা-হুতাশ। হলো না, হলো না বলে আক্ষেপ। হা পিত্যেস্।'

'অনেক অবিবাহিতা স্কুল শিক্ষয়ত্রীর শেষ জীবনে যা ঘটে থাকে।' বলি আমি।

'ইস্। ছেলে আমার পাকাপোক্ত। বেশ সেয়ানা। কথার বাঁধুনী দেখছি বেশ আঁটসাট, রসে ডোবানো।' রমাদির অলক্তক রঞ্জিত পদযুগল। কানে কুণ্ডল। নাকে নাকছাবি।

'প্রেমে পড়বার একটা অনির্ব্বচনীয় সুখ আছে।' বলে রমাদি।

'টের পেয়েছেন বুঝি? পেয়েছেন বিয়ের আগে না পরে?'

'ধেৎ। বিয়ের আগেকার কথা বলা মেয়েদের বারণ। তোমাদের মতো লজ্জা সরমের মাথা খেয়ে মেয়েরা প্রেম ভালোবাসার গল্প বলে না। দু সন্তানের জননী হবার পর যদি বলে তবে আভাষে ইঙ্গিতে। হেসে ঢলে খানিকটা প্রকাশ করে কখনো কখনো।' রমাদি কাজলটানা চোখ দুটো নিয়ে আমার দিকে তাকায়। কেমন একটা মদালসা দৃষ্টি। ওই দৃষ্টিতে হৃদয় ফেটে চৌচির না হোক হৃদয়ে ফাটল ধরাতে পারে। ভয় হয়

রক্তে না নেশা ধরে। বাংলোর বাইরে প্রকৃতি অকৃপণ হাতে দান করেছে। ভয় হয় মনের ফাটলের ফাঁক দিয়ে প্রেমের বীজগুলো যদি পটাপট্ ঢুকে পড়ে অজান্তে, অলক্ষ্যে, নোটিশ না দিয়ে। তবে উপায়!

'বলুন না আপনি বিয়ের আগে প্রেমে পড়েছিলেন কিনা?'

বেশ বুঝতে পারি আমার সাহসটার বড্ডো বাড় বেড়েছে। ভীরু মানুষটা রাতারাতি দিব্যি সাহসী হয়ে উঠেছে। সরম আর লজ্জাকে দিব্যি গোপন করেছে। বলা যায় লজ্জাকে কিডন্যাপ্ করে মনের গোপন কুঠরীর ভেতর পুরে কুলুপ লাগিয়েছে। রমাদি মুখে আঁচল চাপা দিয়ে হেসে গড়িয়ে পড়ে। রমাদির কপালে কাঁচ পোকার টিপ, গলায় পুঁতির মালা। অধররঞ্জনীর স্পর্শে ঠোঁট দুটো টুকটুকে লাল। বাঙ্গালোর শাড়ীটা পেছিয়ে পেছিয়ে সারা অঙ্গে জড়িয়েছে রমাদি। সুঠাম দেহ বল্লরীকে দিতে চেয়েছে লাবণ্য আর সুষমা। হতে চেয়েছে রূপসী আর লাবণ্যময়ী।

'তোমাকে সব কথা বলতে যাবো কেন। তুমি একটা দুধের ছেলে, তার কাছে কি কেউ বলে এসব কথা। যদি কিছু থাকে তবে থাক আমার অন্তরে।'

দুষ্টুমির হাসি খেলে যায় রমাদির মুখে চোখে। বাংলোর পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া স্রোতস্বিনীটা যেন একখণ্ড বিছানার চাদর। এঁকে বেঁকে চলে গিয়ে পাহাড়ের বাঁকে অদৃশ্য হয়েছে। বাইরে ঝিঁ ঝিঁ পোকার একঘেয়ে ডাক, পাতার সির সির শব্দ। হাওয়া খেলছে সোঁ সোঁ করে। কাছে পিঠে ফেউ ডাকছে।

'বিয়ের আগে প্রেম না করলেও অভাবটুকু বিয়ের পর পুষিয়ে নিচ্ছেন আশা করি?'

'সময় আর সুযোগ পেলাম কোথায়। রেঞ্জারসাহেব ঘুরে বেড়ান জঙ্গলে জঙ্গলে। বলতে পারো চষে বেড়াচ্ছেন নেফার জঙ্গল। সাহেব সুবোদের মন জুগিয়ে চলছেন। জঙ্গল বীট্ করা, বেট্ বাঁধা, মাচান

করা, জঙ্গলের পথে, জলার ধারে, নদীর তীরে পাগমার্ক খুঁজে খুঁজে বেড়াচ্ছেন। তাকে পোহাতে হয় অনেক ঝক্কি আর ঝামেলা। বউ এর দিকে সময় দিতে পারেন কোথায়।' রমাদির কণ্ঠস্বর থেকে অভিমান যেন চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়তে থাকে। রমাদির কপালে গালে চন্দনের অনুলেপন। 'তোমার সঙ্গে ভাই আমার কেমন যেন একটা নিবিড় সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। নেফার জঙ্গলের এই নির্জনতা আর অদ্ভুত পরিবেশের মধ্যে সোহার্দ্যটা যেন দানা বেঁধেছে বলে মনে হচ্ছে। স্কুলে কলেজে যখন পড়তাম তখন ছেলেছোকরাগুলো বড্ডো পেছন পেছন ঘুরতো। বলতে, পারো ঘুর ঘুর করতো। দেখতে বোধ করি ভালোই ছিলাম। ছিলাম তন্বী আর সুশ্রী, মুখময় ছড়িয়েছিলো একরাশ লাবণ্য। ছেলের দল আর আমার পেছু ছাড়তো না।' রমাদি করবীতে বেল ফুলের মালা জড়িয়েছে।

'আপনি ওদের কিছু বলতেন না?'

'আমি ভাই ওদেরকে কিছু বলতে পারতাম না। বড্ডো মায়া হতো। কচি কোমল মুখগুলো, কতো উৎসাহ, কতো উদ্দীপনা। যৌবনের জোয়ারে ভেসে গিয়ে হাবুডুবু খাচ্ছে। কিশোর আর যুবকের দল। আমি রাগ করতে পারতাম না। আর না করে অন্যায়টাই বা কি করেছি।'

'নিশ্চয় অন্যায় করেছেন। ওই যে পেছন পেছন যাওয়া, ঘুর ঘুর করা, ওটা কি ভালো?' বলি আমি।

'আমি কিন্তু ভাই অন্যায় ভাবতে পারছিনে।'

'পিছু পিছু গিয়ে নিশ্চয় টিট্‌কিরী দিতো, অসভ্য কথা-টথা বলতো?'

'না ওসব কিছু নয়। ওদের চাউনির সঙ্গে চাউনি মিলোতে, আধো আধো কথাবার্তা শুনতে মন্দ লাগতো না। তখন রোমান্সের রসে ডোবানো মনগুলো। তোমাকে বলতে লজ্জা

নেই মেয়েগুলো এসবের জন্যে পাগল হয়। তাদের মনগুলো প্রেমের জন্যে আকুলি বিকুলি করে। প্রেম একতরফা হয় না। একহাতে কি তালি বাজে? ওরা আমাকে দেখলেই কবিতা আবৃত্তি করতো।'

'নিশ্চয়ই কুৎসিৎ কবিতা। পাঠ্য পুস্তকের তালিকার বাইরে।'

'মোটেও নয়। বেশ ভালো কবিতা, রসে টুইটুম্বুর।'

'তাহলে বলুন আপনার ওসব শুনতে ভালো লাগতো।'

'অস্বীকার করলে মিথ্যে বলা হবে।'

'আপনি ওদের আস্কারা দিয়েছেন।'

'আজ মনে হচ্ছে খানিকটা প্রশ্রয় দিলে হয়তো ভালোই হতো। তুমিই বলো এমন দোষনীয় আর কি হতো।'

'আপনি অন্যায় করতেন।'

'আচ্ছা তুমি বলো দিকিন্ এই মুহূর্তে আমি অন্যায় করছিনে?' চমকে উঠি আমি।

'আপনি একি বলছেন!'

'না! বলছিলাম কি, তুমি যে এক বিবাহিতা নারীর সঙ্গে নিভৃতে, নির্জনে, তাকে একা পেয়ে আলাপ আলোচনায় মেতেছো, ফুস্থর ফুসুর, গুজুর গুজুর করছো, সত্যি বলো দিকিন্ ভালো লাগছে না তোমার?'

'আপনি বলছেন এ দোষনীয়।'

'স্ত্রীটির স্বামী ঘরে নেই। সুন্দরী যুবতী স্ত্রী। সন্ধ্যেবেলার এই ঝিরঝিরে হাওয়া। মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্য। নিশ্চয়ই ভালো লাগছে তোমার। আর লাগাই উচিত। যার লাগে না তার অন্তঃকরণ বলে কিছু নেই। হৃদয়টা মরে গেছে।'

'আমি উঠছি রমাদি!' উঠেই পড়েছিলাম। রাগ আর অভিমান মনের ভেতর গুমরে মরছিলো।

'কি রাগ হলো? সত্যি কথা বলতে ছেলের আমার রাগ

হয়েছে। অপমানে ক্ষোভে ছেলে আমার জর্জরিত।' রমাদি আমার হাত ধরে জোর করে টেনে বসিয়ে দেয়।

'তোমাকে খানিকটা তাতিয়ে তুললাম। তিনটে দিনের ভেতর ছুটো দিন কেটে গেছে, আজকেই শেষ দিন। কাল তুমি চলে যাচ্ছো। আমাদের ইয়ামবুং জঙ্গলে রেখে চলে যাবে। রাগ অভিমানগুলো ঝুলিতে চটাপট্ ভরে ফেলো দিকিন্। তারপর লক্ষ্মী ছেলের মতো একটু গল্পগুজব স্বুরু করো, মনের দরজাটা আর একটু ফাঁক করে দাও।'

দেয়ালে ঝোলানো প্রাকৃতিক দৃশ্য আঁকা মাত্বর। তাছাড়া কাচের আড়ালে কাপড়ের ওপর আঁকা বিভিন্ন ডিজাইনের নক্সা। খাঁচায় পোরা ক্যানারি পাখীগুলো দাঁড়ে দাঁড়িয়ে দোল খাচ্ছে। ময়নাটা ছোলা আর বুট গিলছে। টপাটপ্ গিলছে। মাটির টবে ক্যাকটাস্।

'জানো ছেলেরা স্কুল কলেজে যাবার পথে কতোদিন কাগজের বল আমাকে সই করে ছুড়ে মেরেছে। নির্জন পথে চলতে গেলেই ওই বিপদ।'

'আপনি নিশ্চয়ই ক্যাচ্ লুফেছেন?'

'মাঝে মাঝে এদিক ওদিক চেয়ে কাগজের মোড়ক, বল আর গুলীগুলো কুড়িয়ে নিয়েছি। তারপর স্কুল, কলেজ বা বাড়ীতে পৌঁছে সোজা দৌড়িয়েছি বাথরুমে। কাগজের বল যখন খুলতাম, বুকটা এমন ধড়াস্ ধড়াস্ করতো।'

'কি থাকতো তাতে?'

'চিঠি গো, চিঠি। স্তব আর স্তুতি। সাম্রাজ্ঞী বানাবার প্রতিশ্রুতি। রাজ্যেশ্বরীর টিকা ললাটে এঁকে দেবার জন্যে স্তাবকের দল সর্বদা প্রস্তুত। দেবীর আসনে বসিয়ে পূজোর প্রতিশ্রুতি। তোমরা পুরুষমানুষগুলো বড্ডো অবুঝ আর বোকা।'

'ওগুলো থেকে গিয়ে আপনাদের মেয়েজাতের জন্যে অনেক

সুযোগ সুবিধে ডেকে এনেছে। বৈবাহিক জীবনে আপনাদের প্রাধান্য বজায় রাখবার রাস্তাটা অনেকটা চওড়া করে দিয়েছে। না হলে দাঁড়াতেন কোথায়?'

'ইস্। ছোট মুখে বড়ো কথা। কচি বয়েস থেকেই দম্ভ আর অহঙ্কারের মাতামাতি।' বলে রমাদি।

'ভালো লাগতো আপনার চিঠি কুড়িয়ে? চিঠির জঙ্গল হাতড়িয়ে বেড়াতে?'

'পুলক আর শিহরণ আস্বাদন করতাম। আত্মপ্রসাদ আর তৃপ্তিতে ডুবোডুবি করতাম।'

'আপনার জলে ডুবে মরা উচিত ছিলো রমাদি।' কপট রাগ প্রকাশ করি।

'হয়তো উচিত ছিলো। হয়তো ছিলো না। আচ্ছা এখন আমি ডুবে মরলে বলো তুমি কাঁদবে কিনা? ফেলবে না আমার জন্যে এক ফোঁটা চোখের জল?'

'ধ্যে। কি যা তা সব অলুক্ষণে কথাবার্তা বলছেন। রমাদি।'

রমাদি একটু সময়ের জন্যে ঘরের বাইরে চলে যায়। আমি বসে বসে সিগারেটের ধোঁয়ার রিং সৃষ্টি করতে থাকি। রমাদি শুধু নিজেকে সাজায়নি। ঘর দুয়ার সাজিয়েছে। রক্ত গোলাপের পাপড়ি ছড়িয়েছে খাটে পালঙ্কে। তোষকে গদীতে ছিটিয়েছে সুগন্ধ নির্যাস। ফিরে এলো রমাদি। এলো হাতটা শাড়ীর আঁচলে মুছতে মুছতে। কপালে, নাকের ডগায় বিন্দু বিন্দু ঘাম চিক্ চিক্ করছে।

'ম্যাংসটাকে সেদ্ধ করে মশল্লা দিয়ে ভেজে রেখে এলাম। রোষ্ট করবো।'

'অনেক রকম সুন্দর সুন্দর গন্ধ নাকে প্রবেশ করছে। আজ রান্নার বিস্তর আয়োজন হয়েছে বলে মনে হচ্ছে। কি কি রাঁধলেন রমাদি?'

'খাবারের টেবিলে গেলে টের পাবে।'

'আমি ভোজনবিলাসী। আপনি রন্ধনে পটু। চমৎকার যোগাযোগ।' বলি আমি।

'জানো দু'এক মাসের মধ্যে শিলংএ গিয়ে চুলটা হেয়ারড্রু করবার ইচ্ছে রয়েছে।'

'দোহাই আপনার। ওটি করবেন না। ঠোঁটে সিঁদুর মেখে, চুলে কাঁচি চালিয়ে, বগল, বুক, পিঠ দেখিয়ে রুচিকে ক্লিষ্ট আর পীড়িত করবেন না, প্লিজ। উগ্রপন্থী আধুনিকা সাজবার প্রয়োজনটা কোথায়? দেখবে কে? ঘুরবেন তো নেফার অরণ্যে আর পর্বতে। কে দেখবে আপনার এই আধুনিকতা? ট্রাইবল ছেলে-গুলোর মাথা চিবিয়ে খাবার চেষ্টা না করাই ভালো। ওরা যেন না বলে—'বিবিজান্ চলে যান লবেজান্ করে।'

'তাহলে তোমার বক্তব্যের সারমর্ম হলো ব্যাটাছেলেদের মুণ্ডু ঘোরাবার শক্তি আমার রয়েছে।'

'অফ্‌কোর্স।'

'জানতাম না এতোবড়ো শক্তির অধিকারিণী আমি। যাক্, তোমার মুণ্ড না ঘুরলেই হলো।'

'অসম্ভব কিছু নয়।' জবাব দিই আমি।

'যাক্। নিজ সম্বন্ধে সচেতন হলাম। আচ্ছা এবার বলো দেখি আমাকে কেমন দেখাচ্ছে? তোমার পছন্দ হচ্ছে কিনা?'

ভালো করে খুঁটিয়ে নাটিয়ে রমাদিকে দেখি। সুন্দরী সাজবার জন্যে রমাদি আপ্রাণ চেষ্টা করেছে। ভ্রূরঞ্জনী, অধররঞ্জনী, নখরঞ্জনী, চন্দন, কুমকুম, কাজল আর আলতার পেছনে যেন গোটা মানুষটা আত্মগোপন করেছে। রমাদি মোটেও রূপসী নয়, সাধারণ। কিন্তু সাধনার অন্ত নেই। চেষ্টার কোথাও কসুর হয়নি। রমাদির মুখখানাতে খানিকটা ছিরি রয়েছে। রয়েছে খানিকটা আলগা লাবণ্য আর সুষমা। ওটাই তার মূলধন। বাকী সব জমাখরচের পাতায়। হাড় জিরজিরে

দেহ। নেই মাংসের বালাই। কাঁধ আর কণ্ঠের হাড় উঁচু হয়ে উঠে নিজেদের বিজয় ঘোষণায় সোচ্চার। রমাদির রোগক্লিষ্ট দেহ। চোখের চারপাশে কালিমার কলঙ্ক। সারা মুখে ক্লান্তির আভাষ। দেহের বর্ণে এসেছে মালিন্য। কোটরাগত চোখ। একটু দূরে বীণা হাতে দণ্ডায়মান সরস্বতী মূর্তি। পীন পয়োধরা। রমাদির বুকের আঁচল সরে গেছে। সেখানে মিথ্যার বেসাতি। ফলসের অপব্যবহার। ঘরে কয়েকটা মোম জ্বলছে। শঙ্কিত, ভীরু, নরম আলো অন্ধকারের সঙ্গে মিতালী পাতিয়ে কেমন যেন একটা রহস্যময় পরিবেশের সৃষ্টি করেছে। হাওয়ায় মোমের শিখাগুলো থর থর করে কাঁপছে। অনেকটা লজ্জাশীলা কিশোরী বধূর মতো। দেওয়ালে ফটো ঝুলছে। শিকারীর বেশে দণ্ডায়মান রেঞ্জার সাহেব। ডান পা খানা তুলে দিয়েছে বুলেটবিদ্ধ, প্রাণবায়ু নির্গত হয়েছে এমন একটা নরখাদক ব্যাঘ্রের বুকের ওপর। রেঞ্জার সাহেবের বুটের তলায় কতো শিকার গড়িয়ে পড়েছে কে তার হিসেব রাখে। ঘরের হাওয়া ধূপ আর অগুরুর গন্ধে সুরভিত। বেশ বুঝতে পারলাম, রেঞ্জার সাহেবের ঘরে কোনো উৎসব প্রতিপালিত হচ্ছে। জিজ্ঞাসা করে জেনেছিলাম রমাদিদের বিবাহ বার্ষিকী।

'জানো, কলেজে যাবার পথে তোমার দাদা রেঞ্জার সাহেবও আমার পিছু নিতেন। তখন উনিও কলেজে পড়তেন। আমার করুণা ভিক্ষা করতেন। কতো অনুরোধ, কতো উপরোধ। কাকুতি মিনতির বন্যা বইয়ে দিতেন।'

'এসব জানা ছিলো না। আপনার দেখছি বড্ডো গর্ব।' বলি আমি।

'একদিন ছিলো। আজ আর নেই। সব পথের ধূলোয় ঝেড়ে ফেলে দিয়েছি। তাইতো পুরোনো দিনগুলোর কথা খুব মনে হয়।'

ঝমঝম ঘুঙুরের শব্দ তুলে, ডাকের থলি মাথায় চাপিয়ে বর্শা আর লণ্ঠন হাতে ডাকহরকরা ছুটেছে—ইয়ামবুং থেকে পাঙ্গিনের পথে।

'দাদা তাহলে জিতলেন। আপনাকে শেষ পর্যন্ত পেয়ে গেলেন। সব পরিশ্রম সার্থক হলো।'

'তোমাকে একটা কথা বলবো। আমার হাত ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করো বলবে না কাউকে।' ফিস্ ফিস্ করে বলে রমাদি।

'না বলবো না কাউকে।' আমি প্রতিশ্রুতি দিই।

'উহুঁ, মুখে বললে চলবে না। আমার হাত ধরে শপথ নাও।' হাতের কব্জীটা বাড়িয়ে ধরে রমাদি।

'কেন হাত না ধরলে বুঝি আমাকে বিশ্বাস করতে পারছেন না। বলা কওয়ার ওপর আস্থা রাখতে পারছেন না।'

'ছেলের আমার লজ্জা হয়েছে। আমার হাত ধরতে লজ্জাটা কিসের। যদি বলি তবে দিদিকে জড়িয়ে ধরতে পারো না বুঝি। তাতেই বা দোষটা কোথায়।'

মনে মনে ভাবি অতদূর যেতে আমি রাজী নই। দিদি, মাসীমা, পিসীমা তা সে যেই হোক না কেন। আমি আর কালবিলম্ব না করে ওর হাতখানা আমার হাত দিয়ে স্পর্শ করি। রমাদি ওর হাতখানা আলগোছে আমার কোলের ওপর ছেড়ে দেয়। আমার হাতের মুঠোর ভেতর ওর হাতটা গলিয়ে দিয়ে যেন নিশ্চিন্ত হয়। মাংস নেই, শুধু চামড়া আর হাড়। শিরা, উপশিরা আর ধমনীগুলো যেন একসঙ্গে ষড়যন্ত্র করে নিজেদের আস্তানা ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে। মাংসের আড়ালে থাকতে যেন ওদের অরুচি। তাই সগর্বে, সদম্ভে নিজেদের জাহির করছে। উড়িয়েছে নিজেদের বিজয়কেতন।

'জানো তোমার দাদা বিয়ের রাতে কি বলেছিলেন?' বলে রমাদি। আবেশে ডোবানো কণ্ঠস্বর।

'কি বলেছিলেন ?' প্রশ্ন করি আমি।

'আমাকে পেয়ে নাকি ওর জীবন ধন্য হয়ে গিয়েছিলো। আমাকে পাওয়া মানে ওর নাকি অনেক জীবনের পুণ্য ফল।' কিশোরীর ব্রীড়া রমাদির চোখে মুখে। 'আমাদের বিয়ে হয়েছে অনেক কাল। আজও জঙ্গলে পাহাড়ে কন্দরে ঘুরতে ঘুরতে তোমার দাদার যখুনি মনে পড়ে যায় তোমার রমাদির কথা, তখুনি পাহাড় টপ্‌কিয়ে, জঙ্গল ভেদ করে, রাতের অন্ধকার তুচ্ছ করে, জন্তু জানোয়ার উপেক্ষা করে ছুটে আসেন আমার কাছে। ঘরের টান হয়ে ওঠে তখন প্রচণ্ড। সে টান অমান্য করবার শক্তি তোমার দাদার নেই।' পরিতৃপ্তিতে ভরে ওঠে রমাদির মুখখানা। 'জঙ্গলে রাত কাটিয়ে যেন তখন সুখ পান না তোমার দাদা। ক্রোশের পর ক্রোশ অতিক্রম করে চলে আসেন। আমি বলি, জঙ্গলের পথে এভাবে না এলে কি চলতো না।' রমাদি আবেশে বিহ্বল। কেমন যেন নিস্তেজ। কথার ফাঁকে আমার দুটি হাত কখন যে তার দুহাতের ভেতর, তার কোলের ওপর চলে গেছে জানতে পারিনি। রমাদি নিজেই টেনে নিয়েছে। ইয়ামবুং এর গোটা গ্রামটা একটা শুঁড়িখানায় পরিণত হয়েছে। সারাটা গ্রাম নেশায় বুঁদ হয়ে আছে। আপঙ এর স্রোত বইছে। হৈ হল্লা কলরবের যেন বন্যা ডেকেছে।

'আজকে ওদের কি যেন একটা পরব রয়েছে ?' জিজ্ঞেস করি রমাদিকে।

'টাপু পূজো গো। টাপু পূজো। এ পূজো করে ওরা সন্তান ভিক্ষা করে। বন্ধ্যা মেয়েরা সকরুণ মিনতি জানায়। ট্রাইবের লোকগুলো মরক আর মহামারী, দুর্ভিক্ষ আর প্লাবনে, জন্তুজানোয়ারের মুখে হরদম মরছে। এক একটা ট্রাইবের প্রায় নিশ্চিহ্ন হবার যোগাড়। তাই এ পূজোর জোর আয়োজন। তা আসুক বাছাদের ঘরে সন্তানসন্ততি, দেবতার আশীর্বাদ ঝরে

পড়ুক গ্রামগুলোতে। ঘরে ঘরে ভূমিষ্ঠ হোক মানব সন্তান। গোটা নেফা ধন সম্পদে ভরে উঠুক।' রমাদি চুপ করে।

এক ফালি চাঁদ মেঘের আড়াল থেকে উঁকি দিচ্ছে! রমাদি সন্তানহীনা, তার মনের কোণে এঁকটা ব্যথা দানা বেঁধে রয়েছে। বাইরে ফুর ফুরে হাওয়া। হাসনুহানার গন্ধে বাতাস মাতোয়ারা। নাম না জানা কতো ফুল, কতো লতা। মাথার ওপর তারকাখচিত চাঁদোয়া। বাতাসে শুধু মৌজ আর মৌতাত। গ্রামোফোন রেকর্ডে ইমনের সুরে সানাই বাজছে।

'এ গ্রামের আদি মেয়েটা কি একটা জংলী ফল খেয়ে আত্মহত্যা করলে। কারণটা কি?'

'বাঁজা গো বাঁজা। গ্লানি আর ক্ষোভ সইতে না পেরে আত্মহত্যা করলে।' একটু থেমে রমাদি আবার বললে।

'আচ্ছা, আত্মহত্যা পাপ, শাস্ত্রবিরোধী, তাই না?' প্রশ্ন করে রমাদি।

'সে রকমই শুনেছি' জবাব দিই।

'শুনেছি আত্মার সদ্‌গতি হয় না। অশান্ত আত্মা পৃথিবীর আশেপাশে ঘুরে বেড়ায়। জানো ভাই আমার কিন্তু ও রকম মৃত্যুকে বড্ডো ভয় করে।'

'এসব কথা কেন বলছেন? আপনার কি অন্য কোনো কথা বলবার নেই।' রমাদির কোলের ওপর আমার হাত দুখানা রয়েছে। রমাদি নিজের হাত তার ওপর বোলাচ্ছে। টাপু পুজোর দিন প্রার্থনা করলে নাকি দেবতা খুশী মনে বর দেন। মনে মনে ভাবি রমাদির প্রার্থনা কি ট্রাইবদের দেবতা শুনবে না। ওগো ট্রাইবদের দেবতা, আমার একটি ছোট্ট প্রার্থনা কি তুমি শুনবে না?

* * *

অনেক রাতে ঘুমটা আমার হঠাৎ ভেঙ্গে যায়। স্পষ্ট শুনতে পেলাম পাশের ঘরে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে রমাদি। রেঙ্গার

সাহেব কখন ঘরে ফিরেছেন টের পাইনি। ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। এবার বেহদ্দ মাতালের কণ্ঠস্বর কানে এলো।

'গোল করো না বলছি। এসব বেলেল্লাপানা আমার ভালো লাগে না।' রেঞ্জার সাহেবের গলা। কণ্ঠস্বরে পরিষ্কার বোঝা যায় উনি পুরোদস্তুর মাতাল হয়ে ফিরেছেন।

'আজ আমাদের বিয়ের তারিখ। তোমার গলায় একটা মালা পরাবো তাতেও তোমার আপত্তি?' রমাদি কান্নায় ভেঙ্গে পড়েছে।

'বিয়ের তারিখ। ফুঃ, যতো সব রাবিশ। সখের সীমা পরিসীমা নেই।'

রমাদি ফিস্‌ফিস্‌ করে বলে, 'চেঁচিও না। সবাই শুনবে, আজকের দিনে ওসব কথা বলতে হয় না।'

'না বলতে হয় না। আলবাৎ, একশোবার বলবো। তোমার ঐ রোগা শরীরটাতে কি আছে বলো দিকিন? কি দিয়েছো আমাকে? তুমি অক্ষম, কি পেয়েছি আমি? সারাটা জীবন তুমি আমাকে জ্বালিয়েছো।'

'একি করলে তুমি, মালাটা ছিঁড়ে ফেললে। ফুলগুলো দলে পিষে একাকার করলে!' খানিকক্ষণ সব নিস্তব্ধ, এরপরই গগনভেদী এক চীৎকার।

'সাপ, সাপ। কে কোথায় আছো বাঁচাও।' স্পষ্ট রমাদির কণ্ঠস্বর।

'উঃ মাগো! গেলুম, গেলুম।' রমাদির আর্ত কণ্ঠস্বর।

টর্চটা হাতে নিয়ে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটলাম রমাদির ঘরের দিকে। ঘরে ঢুকে যে দৃশ্য দেখলাম তা স্বপ্নাতীত। একটা প্রকাণ্ড সাপ রমাদির বিছানার ওপর শরীরের অর্দ্ধেকটা তুলে ফণা বিস্তার করে ফুস্‌ছিলো। হিস্‌ হিস্‌ শব্দ তুলছিলো। আমারি পায়ের শব্দ হতেই এবং টর্চের আলো পড়তেই সাপটা বিছানা থেকে জানালার

দিকে চলে যায় এবং জানালার শিকের ভেতরের ফাঁক দিয়ে দেহটা অনায়াসে গলিয়ে মুহূর্তে অদৃশ্য হয়ে যায়।

বজ্রাহত অবস্থা আমাদের রেঞ্জার সাহেবের। ওর বিস্ফারিত নেত্র। উৎকণ্ঠা আর আতঙ্কে চোখদুটো বেরিয়ে আসতে চাইছে। মনে হলো রেঞ্জার সাহেব বাহ্যজ্ঞানরহিত। রেঞ্জার সাহেবের পাশে বিছানার ওপর লুটিয়ে পড়েছে রমাদি। কাল কেউটের ছোবল পড়েছে রমাদির কণ্ঠে, মুখে আর বাহুতে।

পরে শুনেছিলাম কাল কেউটে ছোবল মেরেছিলো রেঞ্জার সাহেবকে লক্ষ্য করে। ছোবল ওর ওপর পড়বার আগেই রমাদি ঝাঁপিয়ে পড়েছে রেঞ্জার সাহেবের ওপর। ফলে ছোবল লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে। বেঁচে গেছেন রেঞ্জার সাহেব। ঘায়েল হয়েছে রমাদি। দুর্দ্ধর্ষ কাল কেউটে। ওর ছোবলে বাঘ, হাতী কাবু হয়। বিষের জ্বালায় সারাটা জঙ্গল তোলপাড় করে ফেলে। আর এ ক্ষুদ্র মানুষ। রমাদি জ্ঞান হারিয়েছে। সারা শরীর তার নীল হয়ে গেছে। মুখ দিয়ে ফেনা গড়াচ্ছে।

অনেক চেষ্টা করা হলো। ততোক্ষণে লোকজনে ঘর ভরে গেছে। ডাক্তার, ওঝা, ওষুধ, তন্ত্রমন্ত্র, ঝাড় ফুক্। কিন্তু না, রমাদিকে বাঁচানো গেলো না। ইয়ামবুং জঙ্গলে প্রাণ হারালো রমাদি। স্বামীকে বাঁচাতে গিয়ে প্রাণ বিসর্জন দিলো। আমার মনে কিন্তু একটা দ্বন্দ্ব। টর্চের আলো ফেলতেই প্রথমে সাপের মাথাটা আমার নজরে এসেছিলো। মাথায় গাঢ় লালবর্ণের ছোপ। একি দৈত্যের সেই পোষা সাপটা। দৈত্যটা পাঠিয়েছিলো প্রতিশোধ নিতে। রেঞ্জার সাহেবের বদলে তার পত্নীকে খতম করে দিয়ে সাপটা পালালো। কিন্তু না, আমার চোখেরও ভুল হতে পারে। দৈত্যটার সে হাসি কিন্তু এখনো আমার কানে বাজছে। সে হাসি ভীষণ আর ভয়ঙ্কর। রক্ত হিম করা হাসি। ইয়ামবুং অরণ্য সে হাসিতে বার বার কেঁপে উঠেছিলো।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

সার্কেল অফিসার মুখার্জীর কাছে গল্পটা শোনা। নেফা সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ব্যক্তি এ মুখার্জী। নেফা অরণ্যে, প্রান্তরে, পর্বত আর কন্দরে ঘুরে ঘুরে কতো অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছে আমাদের মুখার্জী। নেফা এ্যাড্‌মিনিস্‌ট্রেসনের এরা পিলার। এদের মতো কিছু সৎ, সাহসী, কর্মক্ষম, প্রাণচঞ্চল অফিসার নেফা এ্যাড্‌মিনিস্‌ট্রেসনের বুনিয়াদ আর ভিত্তি একটু একটু করে দৃঢ় আর মজবুত করে তুলেছে। ট্রাইবস্‌দের সভ্যতার আওতায় ধীরে ধীরে নিয়ে আসার জন্যে এরাই বহুলাংশে দায়ী। ট্রাইবস্‌দের সম্পর্কে কর্তৃপক্ষের মনে সময় সময় দ্বিধা আর দ্বন্দ্ব জাগলে এরাই দৃঢ় পদে এগিয়ে গিয়ে তার মোকাবিলা করে। হুঁশিয়ারির সমন ছেড়ে কর্তৃপক্ষকে সজাগ করে, সচেষ্ট করে। নেফাকে প্রগতির পথে নিয়ে যেতে সাহায্য করে। এরা ট্রাইবস্‌দের সামাজিক জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। জন-জীবনের উন্নতি কল্পে এরা সদাসর্বদা পরীক্ষা নিরীক্ষা চালাচ্ছে। মতামত বিনিময়ের মাধ্যমে সমস্যা সমাধানে সর্বদা সচেষ্ট। এরা হাসি মুখে দুঃসহ পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছে। বৃহত্তরের কল্যাণে নিজেদের স্বার্থের দিকে দৃকপাত করেনি। নেফার শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্যে, যেখানে বিপদ প্রতিমুহূর্তে হাতছানি দেয়, যেখানে নিজস্ব সুখ সুবিধে বলতে কিছু নেই, রয়েছে অপরিসীম শারীরিক অস্বাচ্ছন্দতা আর মানসিক ক্লেশ, সেখানে সমস্ত কিছুর ঝুঁকি নিয়ে, ক্ষয় ক্ষতি, লাভ লোকসানের হিসেব নিকেশ না করে এরা অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছে। উদ্দেশ্য নেফাকে গড়ে তুলতে হবে। আমি নেফাতে থাকাকালীন এরকম কয়েকজন অফিসার দেখেছিলাম। মুখার্জী ওদের মধ্যে একজন।

কে যা বলছিলাম। বোলেং এর অরণ্যে জাপু পাঙ্গু মুখার্জীর হাতটা ধরে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিলো। একই কথা এক নাগাড়ে বলে যাচ্ছিলো—'শোনো। কমি ডাইকে আমার কাছে এনে দাও। আমার মিনতি তুমি রাখো। এসব তোমার।' হাতের আঙুল তুলে সে ইঙ্গিত আর ইসারা চালায়। বলে—'এ সব তোমার হবে।' চারদিকে দৃকৃপাত করে মুখার্জী বিস্মিত আর বিমূঢ়। চারদিকে নানা আকারের অসংখ্য পাথর ছড়ানো ছিটানো রয়েছে। তারমধ্যে কয়েকটা পাথর রয়েছে যাদের আকার মুরগীর ডিমের মতো হবে। গুহার ফাটল দিয়ে সূর্য্যের শেষ রশ্মি এসে ওগুলোর ওপরে পড়েছে। পাথরগুলো জ্বলছে, দ্যুতি ছড়াচ্ছে। দুতিন রকম রং ছড়াচ্ছে। লাল, নীল আর সবুজ। মুখার্জী পাথরগুলোর মূল্য নিরূপণে সম্পূর্ণ অপারগ। এ পাথরগুলোকে হীরে, মুক্তো, ডায়মণ্ড-এর শ্রেণীভূক্ত করা যায় না হয়তো। কিন্তু অতি সহজে এর পরের শ্রেণীতে এ পাথরগুলো নিজেদের আসন করে নেবে। এ পাথরগুলো নিজেদের গুণ যোগ্য —তায় বাজারে সহজেই বিকোবে। জাপু পাঙ্গু এ গুপ্ত ধনের সন্ধান পেয়েছে। মুখার্জীকে এ গুপ্ত ঐশ্বর্য্যের আভাষ দেবার জন্যে সে হাসিমুখে পাহাড়, অরণ্য, কন্দর অতিক্রম করেছে। ওকে এখানে হাজির করেছে। বোলেং এর দুর্গম অরণ্যের ভেতর এ পাহাড় দাঁড়িয়ে রয়েছে। রয়েছে অন্যান্য পাহাড় থেকে খানিকটা স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে। পাহাড়ের গায়ে এ গহ্বর! সভ্য জগতের হদিশ পাবার সম্ভাবনা খুব কম। চড়াইএর মাথায় একটা সুউচ্চ মালভূমি। সীমারেখার চতুর্দ্দিকে যার ছড়িয়ে রয়েছে সুউচ্চ ওক গাছ আর দীর্ঘ পাইন বন। সামনে অনেকটা নীচে ঢালু প্রান্তরের মাঝখানে পাহাড়ী ঝরণার ধারা পথ।

'এসব তোমার। তুমি কমিডাইকে আমার কাছে ফিরিয়ে এনে দাও।'

মুখার্জীর মুখে ভাষা নেই। সে তাকিয়ে তাকিয়ে সব দেখছে। হতে পারে এ সাত রাজার ধন। হবারই সম্ভাবনা বেশী। কি করে এখানে এলো তা সে জানে না। কিন্তু এ ধন সম্পদের খানিকটা কুড়িয়ে সে কি ঘরে ফিরতে পারবে? 'হে ঈশ্বর, এসব বহন করে নিয়ে যাবার শক্তি আমাকে দাও।' প্রার্থনা করে মুখার্জী। গুহাটার ভেতর স্রেফ হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকতে হয়েছে। টানেলের মতো লম্বা অপ্রশস্ত গুহাটা প্রায় অন্ধকার। মাঝে মাঝে চির, ফাটল আর ফাঁক দিয়ে নাক গলাচ্ছে বিকেলের সোনালী রোদের রেখা। গুহার কোনো কোনো অংশে সোজা হয়ে হেঁটে বেড়ানো যায়। গুহাটা ধীরে ধীরে প্রশস্ত হচ্ছে। পায়ের নীচে মাটি এবড়ো খেবড়ো। পাহাড় ফেটে ফাটলের সৃষ্টি হয়েছে। সৃষ্টি হয়েছে গুহা আর গহ্বরের। প্রচণ্ড ভূমিকম্পের অবদান। পাহাড়ের গা বেয়ে জল চুঁইয়ে চুঁইয়ে পথ পিচ্ছিল করেছে। গুহার ছাদ থেকে ফোঁটা ফোঁটা জল টুপ্ টুপ্ করে মাথায়, পিঠে, হাতে পড়ছে।

'কেমন করে এ গুহার আর এ ধন সম্পদের সন্ধান পেলে?' মুখার্জী প্রশ্ন করে।

'গাঁয়ে হলো অনাবৃষ্টি। খরা আর অজন্মায় গাঁয়ে, মাঠে, প্রান্তরে হাহাকার উঠলো। আমি বেরিয়ে পড়েছিলাম অজগরের সন্ধানে। অজগরের মাংস খাইনি অনেকদিন। ওর নাম শুনলেই আমার জিভ থেকে লালা গড়ায়। একটা অজগর মেরে তার মাংস থেকে দশ বিশ জনের বেশ কয়েকটা দিন দিব্যি চলে যায়। ছাল চামড়ায় ফয়দা রয়েছে।'

'পেলে সন্ধান?'

'পেলাম বৈকি। অজগরটা পালিয়ে এসে এ গুহাটায় ঢুকে পড়েছিলো।' জাপু পাঙ্গু এরি মধ্যে চকমকির পাথর ঠুকে তারই আগুনে একটা মশালের বন্দোবস্ত করেছে। গাছের শিকড়-

বাকড়গুলো গুহার দেয়ালে জড়াজড়ি করে রয়েছে। বট আর অশথের ঝুরি নেমেছে। আর তা থেকে ঝুলছে প্রকাণ্ড ময়াল সাপ ফুস্ছে আর গর্জাচ্ছে। পাশ কাটিয়ে যেতে হচ্ছে সন্তর্পণে।

'তোমার এ গুহায় একলা ঢুকতে ভয় করলো না?' প্রশ্ন করে মুখার্জী।

'ভয়। আমি জঙ্গলের মানুষ। জঙ্গলেই জন্মেছি। বড়ো হয়ে উঠেছি। আমার ভয় করবে। হাসালে তুমি মিগম্। সাপটার পিছু নিয়ে এ গুহার ভেতর ঢুকে পড়েছি এমন সময় পাথরগুলো চিক্‌মিক্ করে উঠলো। থেমে গেলাম আমি। নীচু হয়ে তুলে নিলাম একরাশ পাথর। হাতের হুটো মুঠো ভরে গেলো। কুড়ুল চালালাম পাহাড়টার গায়ে। মেহনতে অভ্যস্ত মানুষ আমি। কুড়ুল চালাতেই ভেজা মাটির চাপ আলগা হয়ে ঝরতে লাগলো। আর মাটির সঙ্গে ঝর ঝর করে ঝরতে লাগলো পাথর। খুশীতে আমার মনটা ভরে উঠলো। ক্ষুধা তৃষ্ণা ভুললাম। সাপটা কোনদিকে পালালো সে খেয়ালই রইলো না। তারপর মাঝে মাঝেই এসে পাহাড়ের বুকে পিঠে কুড়ুল চালিয়েছি। মাটির সঙ্গে পাথর খসে খসে পড়েছে। মুঠো ভরে পাথর কুড়িয়েছি। পাথরগুলোর গা থেকে আলো ঠিকরে পড়েছে। লাল, নীল, সবুজ আলো। পাথর ছুঁড়েছি গুহার সর্বাঙ্গে। পাথরের বিছানা করে তার ওপরে গড়াগড়ি দিয়েছি। হেসেছি, কেঁদেছি, কিন্তু কাউকে বলিনি।' বলে জাপু পাঙ্গু।

'কেউ জানে না। কাকপক্ষী পর্যন্ত টের পায়নি। শুধু তোমাকে দেখাবার জন্যে নিয়ে এলাম। বলো তুমি কাউকে বলবে না। শপথ নাও চুটে গামটের নামে।'

'শপথ নিচ্ছি চুটে গামটের নামে। কোনো লোককে এ সম্বন্ধে কিছু বলবো না।' বলে মুখার্জী। জাপু পাঙ্গু হঠাৎ কাশতে সুরু করে। ভীষণ ভাবে কাশতে সুরু করে। টকটকে লাল রক্ত

চোয়াল বেয়ে গড়িয়ে পড়তে থাকে। দুহাতের পাতা দিয়ে মুখের রক্তটা জাপু পাঙ্গু মুছে ফেলে। মুখার্জী বুঝতে পারে এ রাজ যক্ষ্মা। সহজে এর হাত থেকে জাপু পাঙ্গুর পরিত্রাণ নেই। বুকটা ওর হাপরের মতো ওঠা নামা করছে।

'আচ্ছা কমিডাই কে ?' প্রশ্ন করে মুখার্জী।

'সে আমার সব কিছু। সে আমার প্রাণের চাইতেও বেশী। তাকে ছাড়া আমি বাঁচবো না।'

'তুমি যে তাকে ভালোবাসো তা বেশ বোঝা যাচ্ছে। কিন্তু সে কি তোমাকে ভালোবাসে ?' জিজ্ঞেস করে মুখার্জী। পায়ের নীচে মুখার্জীর সাত রাজার ধন।

'না বাসলেও ক্ষতি নেই। আমি যে তাকে ভালোবাসি। আমাকে সে ভালো না বাসলে বারবার ঘুরে আমার কাছে চলে আসবে কেন ? মাঝে মাঝে সে চলে যায়। আবার চলে আসে।'

'আচ্ছা সে মাঝে মাঝে চলে যায় কেন ?'

'যৌবনের ডাকে সে কেমন যেন উতলা আর অন্যমনস্ক হয়ে যায়। ছলছুতো করে মেয়েটা ঘর ছাড়ে। কোনো ছেলে ছোকরার হাত ধরে সে দূরের পথে পাড়ি দেয়।' বলতে বলতে জাপু পাঙ্গু কেমন যেন উদাসীন হয়ে ওঠে। ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে তাকায় এদিক ওদিক।

'ওকে বারণ করলে শোনে না। ভালোবাসার বীজ ওর রক্তে সাঁতার কাটছে। ঝগড়াঝাটি করলে ও মুখ গোমড়া করে। মিগম্, তুমিই বলো ভালো লাগে কারু শুকনো আর গোমরা মুখ দেখতে ? ওর হাসিখুশী মুখটাই আমাকে তাকত জোগায়। মন মেজাজটা খুশীতে ভরিয়ে তোলে। ও আমার বউ।'

'তোমার বউটা ঘরে ফিরে এলে তুমি তাকে ঘরে জায়গা দাও ? খেয়ালখুশী মতো ঘর ছাড়বার জন্যে শাসন করো না ?'

মুখার্জী বলে আর এদিক ওদিক তাকায়। তার চোখের [illegible]

ঘুরছে। পাথরগুলোর দ্যুতিতে চোখ ঝলসায়। কে বলবে তাকে এ পাথরগুলো সভ্যজগতের বাজারে কতো দামে বিকোবে। কি করে যে এ ঐশ্বর্য্য স্থানান্তরিত করবে, তাই ভাবে মুখার্জী। লোকচক্ষুর অন্তরালে নিঃশব্দে আর নীরবে সরাতে হবে সবকিছু। পথ যেরকম দুর্গম। মেহনত আর খাটুনীর অন্ত থাকবে না। জহরত চেনবার জহুরী খুঁজে বের করাও এক সাংঘাতিক দুরূহ ব্যাপার। জানাজানি হলেই বিপদ। প্রাণ হারাবার ঝুঁকি সামলাতে হবে। রাহাজানি আর ছিন্‌তাই-এর বিরুদ্ধে দুর্ভেদ্য দেয়াল গড়ে তুলতে হবে। মুখার্জী ভাবে জাপুর কাছে এ অস্থিরতা আর চঞ্চলতা প্রকাশ না করাই ভালো। লাভ কিংবা ক্ষয়ক্ষতির হিসেব ওর আড়ালেই হওয়া উচিত। উল্লাস শূন্য ঘরে একলা করাই বাঞ্ছনীয়। বোলেং-এর জঙ্গলে সন্ধ্যার অন্ধকার ধীরে ধীরে নেমে এসেছে। গুহার মুখের কাছেই ঘন গাছের নিবিড় ছায়া। ঝোপঝাড় অসংখ্য।

'জানো। মাঝে মাঝে কমিডাই অন্যের সঙ্গে চলে যায়। যখন ফিরে আসে তখন তার পেটে রয়েছে অন্যের সন্তান।'

'বলো কি!' বিস্ময়ে মুখার্জী ওর দিকে তাকায়।

'হ্যাঁ তাই। একগাল হাসি হেসে সে এসে দাঁড়ায়। তার প্রাণ মাতানো, হাড় জুড়ানো, মন ভুলানো হাসি দেখে আমি সব ভুলে যাই। দুনিয়াটা আমার চোখে আবার রঙীন হয়ে ওঠে। দিলটা খুশীতে ভরে ওঠে। আমার মনে হয় আমি এক জালা আপঙ্‌ খেয়েছি।'

'এবার নিয়ে ক'বার পালালো?'

'তা বার পাঁচেক হলো। পেটে অন্যের সন্তান নিয়ে ফিরেছিলো বার তিনেক।'

কি বলবে ভেবে পায় না মুখার্জী। সে হাজির হয়েছে এক বিচিত্র জগতে। মুখার্জী রাজ ঐশ্বর্য্যের ওপর পা রেখে শুনছে

সবকিছু। মাটির নীচে নিশ্চয়ই খনিজ তেল রয়েছে। নইলে মাটির ওপর চুঁইয়ে পড়া জলের ওপর তেল ভাসবে কেন?

পাহাড়ের গায়ে কালো আর বাদামী স্তর। কয়লার স্তর জমেছে নিশ্চয়। মাটির মধ্যে প্রোথিত উদ্ভিদের রূপান্তরের প্রথম ধাপ কিনা কে জানে। মাটির নীচেকার তাপ ও চাপের প্রভাবে পর্য্যায়ক্রমে তা 'লিগ্‌নাইট' ও কয়লায় রূপান্তরিত হবে। কয়লা মানে প্রস্তরীভূত সূর্য্যালোক। বিদ্যুৎ উৎপাদনে সাহায্য করছে। যানবাহন চালাতে সাহায্য করছে। শিল্পে উত্তাপ সৃষ্টি করছে। বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় রূপান্তরিত হচ্ছে কোক্, গ্যাস, অ্যামোনিয়া, আলকাতরা আর বেঞ্জালে। যা থেকে অসংখ্য রাসায়নিক তৈরী হচ্ছে। কয়লার খনিতেই নাকি হীরকের জন্ম। মুখার্জী আর পাঙ্গু গুহাটার মুখের কাছে এসে পৌঁছেছে।

'সন্তান তিনটের কি হলো?' প্রশ্ন করে মুখার্জী।

'সব দায় দায়িত্ব আমার। সন্তান আমার কাঁধে চাপিয়ে দিয়ে কমিডাই খালাস। তা প্রথমটিকে হায়নাতে টেনে নিয়ে চিবিয়ে খেলো। দ্বিতীয়টা মরলো সাপের ছোবলে। তৃতীয় সন্তানটাকে মোকাং গ্রামে আমার বোনের কাছে রেখেছিলাম। সেটাও বাঁচলো না। পেটের ব্যারামে চোখ বুজলো। কমির মায়া মমতা আছে নাকি? কমি শুধু বিয়োতে জানে। লালন-পালনের ঝক্কি-ঝামেলা পোহাতে রাজী নয়।' শম্বরটা জলে মাত্র মুখ ডুবিয়েছিলো। চিতাবাঘের তাড়া খেয়ে ছুটেছে। ম্যাগ্‌পাই পাখীটা অনবরত চীৎকার করছে।

'তুমি শাস্তিটাস্তি দিলে না কেন?'

'সে ক্ষমতা আমার ছিলো না, এখনো নেই। বলেছি তো তোমাকে, ওকে দেখলেই বুকটা আমার কেমন যেন করে। শাস্তি দিতে পারে লোহিতের মিস্‌মীরা। জবরদস্ত শাস্তি দিতে পারে। বিশ্বাস হারালে, ব্যাভিচার করলে, হাতের আঙুল কেটে নেয়।

ওরা যেন শূয়োর ভেড়া পোষে। মেয়েমানুষকে ভালোবাসতে জানে না। মরমের জন্যে পাগল হয়ে ওঠে না।' মুখার্জী চুপ করে শুনে যায়।

'তুমি বলো আমি কি করতে পারতাম। মেয়েটা মিষ্টি মিষ্টি হাসতো। চোখের দৃষ্টি হানতো এদিক ওদিক। জংলা পথে শরীরে হিল্লোল তুলে চলে যেতো। আমার কিছু করবার সাধ্য ছিলো না। ওই রূপ, কালো চকচকে শরীর, শরীরের অপূর্ব বাঁধুনী। চলার পথে হেলতে দুলতে চলাই ওর অভ্যেস। ওর ছিলো পুরুষ্টু নিতম্ব। ঘাড় বেকিয়ে তাকাতো যখন বলো মিগম, আমার সাধ্য কি সে ইঙ্গিত ইসারা আমি অস্বীকার করি।' মুখার্জী কি বলবে ভেবে পায় না। সহজ সরল ট্রাইবের লোকগুলো, যা মনে এসে যায় তাই বলে দেয়। ঢাক্ ঢাক্ গুরগুর নেই।

'আমাকে হাতের ইশারায় কমিডাই ওর পিছু পিছু যেতে বলে। আমি একটা জোয়ান মরদ হয়ে চুপ করে থাকতে পারি? না সেটা ভালো দেখায়?' মুখার্জী মাথা নেড়ে সায় দেয়।

'বনজঙ্গল যখন ঝিমুচ্ছে, প্রকৃতি দেবী যখন নিদ্রায় আচ্ছন্ন, তখন আলগোছে পায়ের গোড়ালি উঁচু করে এক পা এক পা করে জঙ্গলের পথে জলাশয়ের দিকে ও রওনা দেয়। চলে যায় শালুক শাপলা কুড়োতে। নাইতে আর জলকেলি করতে। আঙুলের ইসারায় আমাকে ডাকে। কাছে আসতে বলে।'

'তুমি গিয়েছিলে?' প্রশ্ন করে মুখার্জী।

'না গিয়ে উপায় আছে। ইঙ্গিত ইসারা উপেক্ষা করবার শক্তি আমার নেই।'

'তারপর?' মুখার্জী আরো জানতে চায়।

'প্রথম দুদিন জলে নেমে বুক আর পিঠ, কোমর আর পাছা, জলে ডুবিয়ে, মুখ আর মাথা জলের ওপর ভাসিয়ে রেখে হাসি

ছড়াচ্ছিলো জলপরীটা। মুঠো মুঠো হাসি ছুঁড়ছিলো আমার দিকে। মিথোনের (ষাঁড় জাতীয় জন্তু) ছালের তৈরী জামা কাপড়গুলো ঝপাঝপ খুলে আমার দিকে ছুঁড়ে দিয়েছিলো। 'আমি টপাটপ্ লুফে নিয়েছিলাম। স্নান হয়ে গেলে ওগুলো আবার ওর দিকে ছুঁড়ে দিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়েছিলাম। চোখটা বন্ধ করে দিয়েছিলাম। খিল খিল করে মেয়েটা হাসছিলো। তৃতীয় দিনে ও লজ্জার মাথা খেলে। পশুর ছালের আবরণটা ঝটাপট্ আমার চোখের সামনে খুলে ফেললে। আমি চোখ নামাতেই বললে—তুই পুরুষ মানুষ না? জোয়ান মরদ তুই, তোর এতো লজ্জাটা কিসের শুনি? শোনো কথা মিগম্। আমার মাথাটা কেমন যেন চক্কর দিয়ে উঠলো। আর বললে বিশ্বাস করবে না রক্তটা কেমন যেন চন্‌মন করে উঠলো।' মুখার্জী অবাক বিস্ময়ে ওর কথা শুনছে।

'এর পরে ও সোজা আমার বাঁশের ঘরে চলে এলো। কতো ঢং, কতো রঙ আর রস। আমার গলা জড়িয়ে শুয়ে রইলো। বললাম তোর স্বামী রয়েছে না? ওকি বললে জানো?'

'কি বললে?'

'থাকলোই বা। স্বামীর যে রয়েছে অন্য পাঁচটা জোয়ান বৌ। তোর যে কেউ নেই, আর তোর কাছে থাকতে আমার ভালো লাগে। সোজা সরল কথা বললে কমিভাই। আর বলবে না কেন, বলাই তো উচিত। শহরে, বন্দরে ভালো লাগলে তোরা লুকোস্। জ্বলে পুড়ে খাক্ হয়ে মরিস। আরো বললে…

'কি বল্লে?'

'বলে' বল্ দিকিন্ একটা মাত্র পুরুষমানুষকে নিয়ে কতোদিন আর থাকা যায়। অরুচি আর ঘেন্না, বিরক্তি আর রাগ ধরে।'

'একদিন আমার সম্বন্ধেও ওই রকম কথা বলবি তুই।' আমি ওর মুখের ওপর বলে দিই।

'ততোদিনে তোর আরো অনেক মেয়েমানুষ জুটে যাবে।

তোদের পুরুষমানুষগুলোর সাধ আকাঙ্খা কি সহজে আর মেটে। বলেই কমিডাই আমার গলা, ঘাড়, পিঠে চুমো খেতে থাকে ঘন ঘন। স্তনের বোঝা চাপায় আমার ঘাড়ে, পিঠে, মাথায়।'

'তা স্বামীকে ছেড়ে তোমার কাছে চলে এলেই পার তো।' বলে মুখার্জী।

'ধেৎ। তা পারে নাকি কখনো। কেবাঙ্-এর (গ্রামসভার) আদেশ ছাড়া চলে আসা সহজ নয়। আর কেবাঙ্ যখন ক্ষতিপূরণ হিসেবে তিনটে মিথোন আর চারটে শূয়োর দিতে বলবে তখন ওসব যোগাতে পারবো আমি? আছে নাকি আমার ও শক্তি?'

'বউএর বদলে ক্ষতিপূরণ বাবদ ওসব দিতে হয় বুঝি?'

'নিশ্চয়ই দিতে হয়। ওসব যোগাড় করতে না পারলে কেবাঙ্ রাজী হবে না। স্বামীও ওকে ছাড়তে চাইবে না। ওর স্বামী আমাদের ফষ্টি নষ্টি দেখে বিগড়ালে। তিনটে সন্তানের ভেতর দুটোকে দাবী করে দিলো কেবাঙএ নালিশ ঠুকে।'

'অন্যের সন্তান দিয়ে কি হবে? স্বামীটা পাগল নাকি?'

'হোক অন্যের, তবু কমিডাইএর পেটে হয়েছে তো। দাবী করবার সম্পূর্ণ অধিকার রয়েছে ওর স্বামীর। বড়ো করে, ডাঙ্গর করে তুলে ক্ষেতে খামারের কাজে লাগিয়ে দেবে। শিকার করতে ওরা ছুটবে বনে জঙ্গলে। বুড়ো বয়সে যখন জোর কমবে, মেহনত করবার যখন শক্তি থাকবে না, তখন জোয়ান মরদ ছেলেগুলো কাজে লাগবে। হোক না অন্যের ছেলে। কেবাঙ জানালে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। হয় সন্তান ওর স্বামীর হাতে তুলে দাও নয়তো যোগাড় করো মিথোন।'

'ছেলে দিলে না মিথোন দিলে?, বলে মুখার্জী।

'কমিডাই ছেলে আমার কাছে গচ্ছিত রেখেছে। কড়া বারণ ছেলে মেয়ে অন্যের হাতে দেবে না। আমি দিই কি করে। আর মিথোন যোগাড় করা আমার পক্ষে সম্ভব হলো না। ল্যাঠা চুকে

গেলো। শাস্তিস্বরূপ গাঁয়ের লোকেরা আমাকে একঘরে করলে। তাইতো জঙ্গলে একলাটি পড়ে থাকি। একঘরে আমি। ওরা আমাকে 'মিপক্' বলে। শোনো, তুমি কমিডাইকে আমার কাছে এনে দাও। সব সম্পত্তি তোমার। এ ঐশ্বর্য্যের সন্ধান কেউ জানে না। শুধু তোমাকেই এর খোঁজ দিলাম। তুমি ডাক্তারবাবুকে বলে কয়ে আমাকে পাশিঘাট হাসপাতালে ভর্তি করিয়ে দিয়েছিলে। যেরকম ভাবে মুখ দিয়ে গল গল করে রক্ত পড়ছিলো ভেবেছিলাম মরেই যাবো। ডাক্তার বাবুরা আমার খুব আদর যত্ন করলে। আমি প্রায় সেরে উঠেছিলাম। রক্ত পড়া বন্ধ হয়েছিলো। কাশিটা একেবারে কমে গিয়েছিলো। সব তোমার দয়ায়। তুমি খুব ভালো লোক। সেজন্যে তোমাকে এখানে এনেছি।' বলে জাপু পাঙ্গু।

'হাসপাতাল থেকে চলে এলে কেন ?'

'কি করবো, বোলেং এর পাহাড় জঙ্গল আমাকে হাতছানি দিতে সুরু করলো। এই ঐশ্বর্য্য কে পাহারা দেবে ? কে সামলাবে ? এর ওপর বউটা পালিয়েছে। তাকে খুঁজে আনতে হবে। তাই হাসপাতালের কাউকে না জানিয়ে চুপি চুপি বেরিয়ে পড়লাম।'

বাইরে বাতাসের সোঁ সোঁ শব্দ। আশেপাশে ফেউ ডাকছে। বর্মাবৃত মাংসের একটা বিরাট স্তূপ প্রকাণ্ড শিং বাগিয়ে গাছগুলো দলিত মথিত করে ছুটে গেলো। মনে হলো যেন ঝড় বয়ে গেলো। এক শিংওয়ালা দুষ্প্রাপ্য রাইনো। আশেপাশের জঙ্গলে ডেইসী, ক্রিসেনথামাম আর বোগানভিলা ফুটেছে।

'এবার ও কোথায় গেছে ?'

'এবার গেছে অনেকদূর। আলং ছাড়িয়ে উত্তর দিকে। গালঙদের দেশে। যে ছেলেটার সঙ্গে পালিয়েছে সে গালঙ। গালঙদের অনেক শাখা প্রশাখা। ওদের নিয়ম অনুসারে পাঁচ ভাই এক মেয়েকে বিয়ে করে। আমার মনে হচ্ছে এবার ওর পাঁচ স্বামী

হবে। পাঁচ স্বামীর হাত থেকে ওকে কি সহজে খালাস করে আনতে পারবো। ও বোধকরি আর ফিরেই আসবে না। কিন্তু জানো মিগম্। এবার আমি মিথোনের ব্যবস্থা করবো। অন্যের সন্তান পেটে নিয়ে ফিরলেও আমি মিথোন ক্ষতিপূরণ দিয়ে ওকে ঘরে তুলবো। কিন্তু ওকি আর ফিরবে? আর যখন ফিরবে তখন হয়তো আমি থাকবো না। তার আগেই এ রক্তপড়া রোগে মরবো। মরবার আগে একটিবার শুধু ওকে দেখতে চেয়েছিলাম। মিগম, তুমি ওকে এনে দাও। আমার কমিকে তুমি এনে দাও।' মুখার্জী ভাবে, ধন্য তুমি নেফা। তোমার তুলনা নেই। তোমার অনাড়ম্বর, সরল, সহজ মানুষগুলো। ওদের মনে ঈর্ষা নেই। দ্বেষ নেই। অপমানে ওরা জর্জরিত হয় না। ওরা যথার্থই ভালোবাসতে জানে।

ঠিক সেই মুহূর্তে মাটি কাঁপতে থাকে। পৃথিবী দুলতে সুরু করে। গুর গুর শব্দে আকাশ বাতাস ভরে ওঠে। ধূলোবালিতে চারদিক ঢেকে যায়। পাহাড়ের চূড়ো ভেঙ্গে ভেঙ্গে পড়তে থাকে। মুখার্জী আর জাপু পাঙ্গু দৌড়ুতে সুরু করে। কতো পাহাড় যে ধ্বসে পড়ে তার ইয়ত্তা নেই। এ ভূমিকম্প হাজার হাজার গাছ-পালাকে মুহূর্তে মাটিতে শুইয়ে দেয়। সমস্ত বনভূমি পশু পাখীর আর্তনাদে আর মরণ চীৎকারে ভরে ওঠে। মাটিতে বিরাট বিরাট ফাটলের সৃষ্টি হয় আর তা থেকে গবগব করে গরম জল আর ধোঁয়া বেরিয়ে আসতে সুরু করে।

যে পাহাড়টার গুহাটাতে ওরা দুজন ঢুকেছিলো সে পাহাড়টা প্রচণ্ড ভূকম্পন সহ্য করতে না পেরে হুমড়ি খেয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। আর কাছে পিঠে বয়ে যাওয়া নদীটায় দেখা দেয় অসম্ভব জলস্ফীতি। বন্যার জল ফুলে ফেঁপে একাকার। দুরন্ত ঘূর্ণিস্রোত ভাসিয়ে নিয়ে যায় সব কিছু। বন্যার জল বয়ে যায় ভেঙ্গে পড়া পাহাড়টার ওপর দিয়ে। এ ভূমিকম্পে কতো যে নদীর উৎসমুখ শুকিয়ে গেছে আবার কতো নূতন জলস্রোতের সৃষ্টি হয়েছে কে তার

খোঁজ রাখে। নদীগুলো তাদের গতিপথ পরিবর্তন করেছে অনায়াসে। একসময় ভূমিকম্প থেমেছিলো। মুখার্জী আর জাপু প্রাণে বেঁচেছিলো। এরপর জাপু আর মুখার্জী শত চেষ্টা করেও পাহাড়টার কোনো সন্ধান করতে পারেনি। গোটা পাহাড়টা হারিয়ে গিয়েছিলো। আর হারিয়ে গিয়েছিলো সেই গুপ্ত ঐশ্বর্য্য। শত চেষ্ঠা করেও যার হদিশ আর পাওয়া যায়নি। ১৯৫০ সালের ভূমিকম্প কয়েক হাজার এ্যাটম বোমার শক্তি বুকে ধরে নেফাতে হাজির হয়েছিলো। লণ্ডভণ্ড করেছিলো সবকিছু। নেফার সমস্ত চেহারাটা পালটিয়ে দিয়েছিলো। এরপর জাপুর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিলো। ততোদিনে জাপুর মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছিলো।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

রেঙ্গিনের ডাকবাংলোয় বিশ্রাম নিচ্ছিলাম। আদি ছেলেটা এক টুকরো কাগজ এনে হাতে গুঁজে দেয়। কাগজ খণ্ড ভাঁজ মুক্ত করে চোখের সামনে ধরি। সুপ্রিয় সেন পাঙ্গিন থেকে চিঠি পাঠিয়েছে। সুপ্রিয় স্ত্রীসহ পাঙ্গিনের রেষ্ট হাউসে এসে উঠেছে। তার অনুরোধ আমি যেন অবিলম্বে গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করি। সুপ্রিয় সেন এসেছে কলকাতার এক নিউজ এজেন্সীর তরফ থেকে, তাদের প্রতিনিধি হয়ে। এসেছে নেফা পরিদর্শনে। সব দেখে শুনে টাটকা আর গরম কিছু লিখবে। সাত দশ দিন থেকে নেফা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল বনবে। লিখবে নেফা সম্বন্ধে। তারপর নিউজ কুড়োবে, নিউজ এ্যাণ্ড ভিউজ। নিউজ এজেন্সী বলবে তাদের নিজস্ব প্রতিনিধির প্রেরিত খবর। টেলিপ্রিণ্টার মারফত কাগজে কাগজে ফ্ল্যাশ করবে সে সমস্ত খবর। এই খবরের ভূতটা একদিন আমাকে পেয়ে বসেছিলো। কোনো এক নিউজ এজেন্সী অপিসে চাকরি নিয়েছিলাম। তখনকার দিনে ডাকসাইটে আর জাঁদরেল অফিস। বিদেশী এক নিউজ এজেন্সীর সঙ্গে ওর ছিলো গাঁটছড়া বাধা।

বেশ মনে আছে সেদিনকার কথা যেদিন দুরু দুরু বক্ষে অফিসটাতে ঢুকেছিলাম। একরাশ শঙ্কা দুপায়ে মাড়িয়ে, ভীতি, ভয় ভাবনাগুলো ঠেলতে ঠেলতে অফিসটার ভেতর ঢুকেছিলাম ভীত আর সন্ত্রস্থ অবস্থা। ভেতরে ঢোকবার আগে বেশ কয়েকবার উঁকি ঝুঁকি দিয়েছিলাম। বুকে চেপে রেখেছিলাম এক অদম্য কৌতূহল। ডালহৌসীর এক কোণে টেলিপ্রিণ্টারের শব্দে মুখরিত প্রকাণ্ড ঘরটার কোণে কোণে জমাট অন্ধকার। স্যাঁৎসেঁতে আবহাওয়া যেন লেপটে রয়েছে। ভ্যাপসা গন্ধে দম আটকায়।

অন্ধকারের ভেতর ইঁদুরেরা ছুটোপুটি করে। আরশোলা ওড়ে ফর ফর করে। মাকড়শা নিভৃতে নীরবে জাল বোনবার সাধনায় মেতে রয়েছে। দিনের বেলাতে ঘরের ভেতর আলো জ্বলে। টেলিপ্রিণ্টারের শব্দ হয় খট্টা খট্, খটা খট্।

টেলিপ্রিণ্টারের মাথার ওপর কাঁচের ঢাকনাটির ফাঁক থেকে রোল করা কাগজ ভাঁজ খুলে খুলে বেরিয়ে আসে। বুকে বহন করে নিয়ে আসে অসংখ্য কালো কালো গুটি পোকার রাশি। টেলিপ্রিণ্টারের গহ্বর থেকে ঝাঁক বেধে শব্দরূপী পোকাগুলো বেরিয়ে এসে সারি দিয়ে দাঁড়ায়। খবর আর খবর। একান্ত গোপনীয়, অক্লান্ত পরিশ্রমে সংগৃহীত, কখনো ভয়াবহ, কখনো করুণ, কখনো উপাদেয়, চটকদার, খবরগুলোকে অক্ষররূপী কীটগুলো সযত্নে বহন করে নিয়ে এসেছে। বিরাট সুপুষ্ট কাগজের রোল ক্ষণে ক্ষণে যাচ্ছে খুলে। ক্রমাগত শীর্ণ করে চলেছে নিজ তনু। টেলিপ্রিণ্টারের দাঁতগুলো যার অঙ্গ প্রত্যঙ্গে কামড়িয়ে যাচ্ছে ক্ষণে ক্ষণে। অসম্ভব ক্ষিপ্রতার সঙ্গে ললাটে এঁকে দিচ্ছে হাজার হাজার শব্দ নিশ্চিন্ত, সহজ, মসৃণ আয়াসে। সৃষ্টি হচ্ছে খবরের। নিউজ এণ্ড নিউজ।

সারা জগতের লোক খবরের জন্যে উন্মুখ। রিপোর্টারের দল হন্তদন্ত হয়ে খবরের জন্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে। খবর চাই, আরো খবর। টাটকা খবর। বাসি নয়, পচা খবর নয়। ধ্বংস, প্রলয়, ভূমিকম্প, জলোচ্ছ্বাস, মহামারী, কাটাকাটি, হানাহানি, জালিয়াতি, জুয়াচ্চুরি, বাদানুবাদ আর বচসা। চাই আরো চাই। রাজনীতি, অর্থনীতি নিয়ে কচাকচি। প্রেম, আর বিদ্বেষ। যে কোনো কিছু বিষয় নিয়ে হোক, খবর চাই। খবর যোগাচ্ছে নিউজ এজেন্সীর নিজস্ব প্রতিনিধি। খবর এসে পৌঁছুচ্ছে লেনিনগ্রাড, লণ্ডন, রোম, ম্যানিলা, করাচী, নিউজীল্যাণ্ড, আর ইথিওপিয়া থেকে। আর তাই ফলাও হয়ে ছাপা হচ্ছে ভোরের, দুপুরের, কিংবা সন্ধ্যের

কাগজগুলোতে। খবর না থাকে নিজেদের উদ্ভাবনী শক্তি প্রয়োগ করে খবরের সৃষ্টি করো। কল্পনার জাল ছড়াও। লজ্জা সরমের মাথা খেয়ে করো একটা কিছু। উস্‌কানি দাও, তপ্ত কড়াইতে ঘি ছিটোও, চিমটি কাটো, কোন্দল বাধাও, কাদাজল ছোড়াছুড়ি করো। কুকুর তোমাকে কামড়াবার আগে তুমি কুকুরকে কামড়িয়ে দাও। চা এর পেয়ালায় তুফান বইয়ে দাও। অকারণে কোনো কিছু নিয়ে হৈ চৈ এর সৃষ্টি করো। পা ওপরের দিকে তুলে মাথা নীচের দিকে রেখে হাতের ওপর ভর করে হাঁটো। খবরের সৃষ্টি হবে। টাটকা, গরম খবর, ভোরের চা এর সঙ্গে জলো আর বিস্বাদ খবর নয়। খবর বাসি আর বাজে হলে কাগজের চাহিদা কমবে। নিউজ এজেন্সী খবরগুলো টেলিপ্রিন্টারে রিসিভ করে আবার টেলিপ্রিন্টার মারফত সহরের বিভিন্ন সংবাদপত্র অফিসে, ফার্মের অফিস ঘরে, সরকারি অফিসে পাঠাচ্ছে। খবরগুলোকে সাজাচ্ছে, গোছাচ্ছে। ছাঁটছে, কাটছে, কমাচ্ছে, বাড়াচ্ছে। সংশোধন করছে। পরিমার্জিত হয়ে, ধোপ দুরস্ত অবস্থায়, চুলে টেরী কেটে, মুখে পাউডার স্নো মেখে, জামার কলার উলটিয়ে, চরণে পাম্পসু এঁটে বাবুর দল যেমন গুটি গুটি শ্বশুরবাড়ী মুখো হয় এরাও মানে রাশি রাশি খবর নিজেদের সাজিয়ে গুছিয়ে সাগ্রহে অপেক্ষা করে নিজেদের আত্মপ্রকাশের জন্যে।

শুনেছি বিশ্বের একদিনের সংবাদপত্র সংস্করণগুলোর জন্যে যে পরিমাণ নিউজ প্রিন্ট দরকার হয় তা উৎপাদনের জন্যে এক একটা গোটা বন সাফ করে ফেলতে হয়। খবর এসে পৌঁছুচ্ছে বোম্বের অফিস থেকে। বোম্বের অফিস নানা উপায়ে বিশ্বের ভাণ্ডার থেকে খবর আহরণ করছে। ডালহৌসীর অফিসেও নানা স্থান থেকে খবর এসে পৌঁছুচ্ছে। রিপোর্টারের দল উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি নিয়ে ঘুরছে অহোরাত্র। টেলিপ্রিন্টার, টেলিফোন, টেলিগ্রাম, রেডিও, চিঠির মাধ্যমে এবং লোক মারফত ঘন ঘন খবর এসে যাচ্ছে। কোথাও

ব্রীজ ভেঙ্গেছে, কোথাও দুটো ট্রেনে গুঁতোগুতি হয়েছে ভোজ সভায় বিষাক্ত খাবার খেয়ে গুণ্ডা দলের লোক পটল তুলেছে, বিধানসভায় হয়ে গেছে মুষ্টিযুদ্ধ কিংবা ফ্রিষ্টাইল কুস্তী, কোথাও বা ঘটেছে মন্ত্রীত্বের পতন। গুপ্তঘাতকের গুলীতে কোথাও প্রেসিডেন্ট ঢলে পড়েছে, কোথাও আবার তাকে ঘাড় ধরে গদীচ্যুত করা হয়েছে। কোথাও হয়েছে গেরিলাদের তৎপরতা বৃদ্ধি, কোথাও আবার ডুবো জাহাজ জলের তলায় নিখোঁজ।

খবরের অন্ত নেই। সংবাদ এজেন্সী থেকে সার্ট, প্যাণ্ট, কোট পরিয়ে যে সমস্ত খবরগুলোকে সংবাদপত্র অফিসে পাঠানো হয়েছিলো, তাদের কণ্ঠে নেক্‌টাই ঝুলিয়ে, মাথায় টুপি চাপিয়ে মানে যুৎসই হেড লাইন দিয়ে খবরের কাগজের লোকেরা শেষ পর্য্যন্ত তাকে বাজারে ছাড়লো। রাজপথে, সড়কে, অলিতে, গলিতে দৌড়ুলো কাগজ ফেরিওয়ালার দল। টাটকা খবর, সাংঘাতিক খবর, জোর খবর, তাদের মুখে ঐ এক বুলি। এদিকে খবর এজেন্সীর অফিস ঘরে বয় বেয়ারা ছুটছে হন্তদন্ত হয়ে। সাব এডিটর ঝুঁকে রয়েছে টেবিলের ওপর। ইউ এন ওর জটিল ও সমস্যাপূর্ণ খবর। রিপোর্টারের দল খবরের পিছনে উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়ুচ্ছে। হাণ্ড্রেড্‌ ইয়ারড্‌স্ ড্যাস্।

খবর যাতে তাদের ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে না যায়। খবরের ফাঁকে ফাঁকে বক্তৃতা আর বক্তৃতা। কথার মার প্যাঁচ। সত্যমিথ্যের ফুলঝুরি। একটি অল্পবয়স্ক, ভীরু, দুর্বল, কম্পমান বঙ্গ সন্তানকে ওরা চেয়ারে বসিয়ে দিয়ে গেছে। সাব এডিটরের ডেস্ক। শীর্ণ ছেলেটা প্রায় ডুবে রয়েছে খবরের স্তূপের ভেতর। একদিনের ভেতর এতো খবর। এতো ঘটছে এ দুনিয়াটাতে। আর তা ভাত ডাল খাবার মতো অতি সাধারণ নিত্যনৈমিত্তিক খবর নয়। রীতিমতো শাসালো, ঝাঁঝালো, জোরালো, চটকদার খবর।

তখনকার দিনে এক একটা খবরের কাগজে কি সব জাঁদরেল

আর ডাকসাইটে ইংরেজ কাজ করতো। বাপ্, হাকডাকে কাঁপিয়ে ছাড়তো চারদিক। কণ্ঠগুলো গুরুগম্ভীর আর রাশভারী। ফোন তুলে যখন কারেকসান্ চাইতো, তখন শীর্ণ, দুর্বল ছেলেটির ভয়ে বুক কাঁপতো। বাঘা বাঘা কাগজ। আর বাঘের মতই পরাক্রমশালী এডিটারের দল। ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে শব্দ তুলে ইংরেজীতে বুনো শূয়রের মতো ডাক ছাড়তো। ঠিক মতো জবাব না দিতে পারলে কিংবা ভুলটুল বললে ব্যাঘ্রের মতো গর্জন করে উঠতো। ফোনটা কাঁপতো থর থর করে। সঙ্গে সঙ্গে দুর্বল ছেলেটা কাঁপতো। সেদিন হাড়ে হাড়ে বুঝেছিলাম, পেন্ ইজ মাইটিয়ার দ্যান সোর্ড। আরো বুঝেছিলাম, সোর্ড ঘচাং করে গলাটা কেটে দেয়। ঝক্কি ঝামেলা খতম। আর পেন্। ক্ষতের সৃষ্টি করে এবং দিব্যি তার উপর নুন ছিটোয়।

পেন্ অতি সহজে সাম্রাজ্যকে তছনছ করে ছেড়ে দেয়। নৃপতিকে ধূলোতে ফেলে দিয়ে কাতুকুতু লাগায়। মন্ত্রীকে গদীচ্যুত করে অনায়াসে প্রাকার আর সৌধ থেকে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। এদিকে খবর আর খবর। ইউ. এন. ও আর ইউনেস্কোর সেমিনারে চলেছে বাগ্‌বিতণ্ডা, চাএর কাপে উঠেছে ঝড়। কাঁচের ঘরে বসে চলে পরস্পরের দিকে ঢিল ছোঁড়াছুড়ি। স্প্লিটিং অব এ্যাটমের গূঢ় রহস্য নিয়ে কোথাও মাতামাতি। কোথাও গ্যাস্ যুদ্ধের হুম্‌কি। ঠাণ্ডালড়াইএর পায়তারা। সংবাদ পাঠাচ্ছে নিজস্ব সংবাদাতা, সংবাদ না দুঃসংবাদ কে জানে।

এরপর পাশের ঘরে গিয়ে রেডিও টিউন্ করে খবর শুনতে হয়। এ্যাডিসন্ আর অলটারেসন্। লেটেস্ট নিউজের জন্যে তাড়াহুড়ো আর সময়ের সঙ্গে ধ্বস্তাধ্বস্তি। কে যেন বলেছিলো খবরের কাগজের সুখসুবিধে রেডিওর চাইতে অনেক বেশী। রেডিওতে একটি খবর একবার শুনেই নিশ্চিন্ত। হাতজোড় করে বললেও খবরটি দ্বিতীয়বার রিপিট্ করবে না। খবরের

কাগজে একই খবর দশবার কেন বিশবার পড়ো। খবরের কাগজ টেবিলে বিছিয়ে পড়ো। বিছানায় কাগজ নিয়ে চিৎ হয়ে পড়ে যাও। বাথটাবের জলে নিজেকে ডুবিয়ে শুধু মাথা হাত জলের ওপর রেখে সংবাদ পাঠ করো। সংবাদপত্রের আরো অনেক সুবিধে। কাগজ পাঠ করবার পর বাজার থেকে ওই কাগজে জিনিষপত্র মুড়ে নিয়ে এসো। খাবারের টেবিলে খবরের কাগজ বিছিয়ে খেতে বসো। খোকার নোংরা মুড়ে পথচারীর মাথায় নির্বিঘ্নে ছুঁড়ে মারো। বিরাট ফ্ল্যাট্‌বাড়ীর কোথা থেকে এ আক্রমণ হলো কেউ বলতে পারবে না। মাসের শেষে পকেটে টান পড়লে পুরানো খবরের কাগজ সের দরে বিক্রী করে দাও। সংসার অচল হলে, বাজারমুখো হতে অসমর্থ হলে, খবরের কাগজের শরণাপন্ন হও।

যাক্ যা বলছিলাম, এর পর বেশ কিছুদিন খবর সরবরাহ এজেন্সীর অফিসে কাজ করেছিলাম। কিন্তু প্রথম রাতের সে অভিজ্ঞতারবোধকরি তুলনা নেই। রাত বাড়তে থাকে। ডালহৌসীর অফিসপাড়া ক্রমশঃ নির্জন হয়। এডিটর, সাবএডিটর, রিপোর্টার, ইঞ্জিনীয়ার, মেকানিক, টাইপিস্ট, পিওনের ভীড় কমতে থাকে। সংবাদ দেনেওয়ালা লোক, বাজার ভাঁও, স্টক এ্যাক্স্‌চেঞ্জ, শেয়ার মার্কেটের দরদস্তুর ওঠানামার দিকে নজর রেখেছে এমন লোক, রেস্ রেজাল্ট জানতে চায় এমন লোক, টেলিপ্রিন্টারের মারফত বুলি ছড়াতে চায় এমন লোকের সংখ্যা ধীরে ধীরে কমতে থাকে। নিউজ এজেন্সী অফিসে যন্ত্রপাতি সারাই আর মেরামতির কাজ বন্ধ হয়েছে। দিস্তা দিস্তা কাগজ ট্রাকে ওঠানো নামানোর পর্ব খতম। মোটকথা হাকডাক, কলকোলাহল নব্বই ভাগ কমে গেছে। খবর দেওয়া নেওয়ার অফিসে টেলিফোনগুলো ক্রিং ক্রিং শব্দ তুলে ক্রমাগত আর বাজছে না। কর্মব্যস্ত, কোলাহলমুখর ডালহৌসী ঝিমুতে সুরু করেছে। গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন হবার পূর্ব লক্ষণ। পানের খিলি সাজতে সাজতে পানওয়ালা ছোকরা

ঘুমে ঢুলতে সুরু করেছে। নিউজ এজেন্সী অফিসের ঠিক পাশে ফুটপাতের ওপর হ্যাংটো পাগলটার একগুষ্টি কুকুরের সঙ্গে বসে ভোজনপর্ব সমাধা হয়েছে। মাদ্রাজী রেঁস্তোরায় এক গ্লাশ থেকে অন্যগ্লাশে কফি ছুঁড়ে দেওয়ার পালা সাঙ্গ হয়েছে। সারাটা বিকেল আর সন্ধ্যে এক গ্লাশ থেকে অন্য গ্লাশে কফি ছোঁড়াছুঁড়ি চলেছে। ঘন দুধে তৈরী নীলগিরির কফি। কফির ওপরে ঘন দুধের সর ভাসে। বড্ডো উপাদেয়। মুড়ি, মুড়কি আর খইএর দোকানের রামশরণ চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে তুলসী রামায়ণ পাঠ বন্ধ করেছে, তার শ্রোতৃমণ্ডলী ক্রমশঃ ক্ষীণ আকার ধারণ করছিলো।

এখন আর একজনও বসে নেই। সব চলে গেছে। শূন্য আসর। রামশরণের খালি গা; খড়ম পায়ে দিয়ে, কানে পৈতে তুলে, হাতে গাড়ু নিয়ে কোনো একটা অফিসঘরের বাথরুমের দিকে সে চলেছে। দিনের বেলা ঐ অফিসের সে আরদালী আর পিওন। সন্ধ্যের পর নিজের চেষ্টায় গড়ে তোলা ব্যবসা বাণিজ্য নিয়ে আকণ্ঠ নিমজ্জমান। ক্রেতার সঙ্গে দাম নিয়ে বচসা, টাকা কড়ির হিসেব, তারপর ধর্ম অন্বেষণ। পরকালের পথ সুগম করার প্রচেষ্টা। স্বর্গবাসের পাকাপাকি বন্দোবস্ত।

সারা অফিস বাড়ীর বিলকুল ঘরের চাবি রামশরণের কোমরে ঝুলছে। ইদানীং আর পাঁচজনের মতো রামশরণ অফিস ঘরের বাথরুম ব্যবহার করতে শিখেছে। প্রথমদিকে চাকরিতে যোগ দিয়ে বড্ডো অসুবিধে হতো তার। বাথরুমের দরজার চাবিও তারই হেপাজতে। ইদানীং সে শাওয়ারের নীচে দাঁড়িয়ে স্নান করে। তবে ওই বাথটাবে শুয়ে স্নান, ভাবতেও ঘেন্নাবোধ হয়। স্টেনো টাইপিস্ট মেমসাহেব ছুঁড়িগুলো বিকেলের দিকে ওই বাথটাবে শুয়ে স্নানপর্ব সমাধান করে ঝকঝকে তকতকে হয়ে গট্‌গট্‌ করে হেঁটে চলে যায়। চারদিকে সুবাস ছড়িয়ে যায়। রামশরণের থেকে থেকে তার গ্রামে ফেলে আসা স্ত্রীর কথা কেবলি মনে পড়ে।

সে অনেকদিন বউটাকে দেখতে যায়নি। তার চাইতে বউটা বয়সে অনেক ছোট।

একদিন রামশরণ কি একটা কাজে সন্ধ্যের দিকে বাথরুমের দিকে গিয়েছিলো। বাথরুমটার দরজায় তালাচাবি লাগানোই তার উদ্দেশ্য ছিলো। দরজাটা ভেজানো ছিল। টান দিতেই খুলে গেলো। ছিঃ ছিঃ, এক ঝলক দেখে নিয়ে চোখ বন্ধ করে সে রামনাম জপ করতে সুরু করলো। বাথটাবের সমস্ত জল ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। মেমসাহেব তখনো শুয়ে। মেমসাহেবের গায়ে বস্ত্রখণ্ড নেই। ধবধবে সাদা, মসৃণ দেহটা নিয়ে বাথটাবের ভেতর শুয়ে মেমসাহেব গান ধরেছে। রামশরণ ভাবে তার বয়স হয়েছে। কিন্তু সে না হয়ে যদি ছোকরা পিওন দারোয়ানদের ভেতর কেউ হতো, কেলেঙ্কারী ব্যাপার!

রাতের বেলা মাদুরে শুয়ে চোখ বুজে ফটোতে দেখা রাম সীতার মুখ সে কিছুতেই মনে আনতে পারে না। মনের আয়নায় বার বার ভেসে উঠেছিলো মেমসাহেবের শুভ্র দেহখানা। মেমসাহেব তার দিকে তাকিয়ে দেখেছিলো, কিছু বলেনি। যাক্, এবার রামশরণ সম্বন্ধে অন্য একটা কাহিনী শোনাই।

ভরা গ্রীষ্মের দুপুর। এক ফোঁটা জলের জন্যে প্রাণটা আইঢাই করছে। রামশরণ তখন সবেমাত্র নূতন চাকরি নিয়ে দেশ থেকে মহানগরীতে এসেছে। দুপুরের অসহ্য গরমে স্নান না করলেই নয়। রামশরণ সোজা চারতলার ছাদে চলে গেছে। ছাদের ওপর এক কোণে রয়েছে বিরাট জলের ট্যাঙ্ক। এই ট্যাঙ্কের জলই গোটা অফিস বাড়ীতে সরবরাহ করা হয়। এ জলেই তৃষ্ণা নিবারণ এবং অন্যান্য কার্য্য সমাধান করা হয়। ট্যাঙ্কের ঢাকনা তুলে ফেলে রামশরণ দেখেছে জলের পরিমাণ কমে গিয়ে কোমর পর্য্যন্ত দাঁড়িয়েছে। আর যেই না দেখা অমনি ঝুপ করে ট্যাঙ্কের জলে রামশরণ লাফিয়ে নেমে

পড়েছে। নিশ্চিন্ত মনে ট্যাঙ্কের জলে ডোবাডুবি করেছে। নিবিড় সুখ উপভোগ করছে। আরাম, আয়েশে মেতে উঠেছে। সারা অঙ্গে প্রচুর সাবান মেখে একরাশ ফেনা তুলেছে। সাবানের ফেনায় সমস্ত ট্যাঙ্কের জল ঘোলা হয়েছে। ময়লা তেল চিট্‌চিটে গামছাখানা দিয়ে বেশ ভালোভাবে সে গা রগড়িয়েছে।

সারাটা অফিসের লোকগুলো সেদিন গরমে, ঘামে তৃষ্ণায় পাগল হয়ে ট্যাঙ্কের পাইপ দিয়ে বয়ে আসা জল পরম আনন্দে গ্লাশে গ্লাশে পান করেছে। মনে মনে ভেবেছে 'জলটা এতো ঘোলা কেন?' অন্যেরা বুঝিয়েছে গঙ্গার জল ক্রমশঃ ঘোলা হচ্ছে সেই সঙ্গে কর্পোরেশনের জলও। মেমসাহেব স্টেনো টাইপিস্টের দল বলেছে 'বাবু, জলে কেমন যেন একটা গন্ধ।' অন্যেরা বুঝিয়েছে কর্পোরেশনের কর্মীরা আজকাল ভীষণ সতর্ক। জলে ক্রমাগত ওষুধ মিশিয়ে যাচ্ছে। ওদিকে ট্যাঙ্কের ভেতর রামশরণ মনের আনন্দে স্নান করে যাচ্ছে। আর কমপক্ষে চার গ্লাশ করে সাবান গোলা জল, শরীরের ক্লেদ মেশানো জল, পান করেছে বড়বাবু, সেজবাবু আর মেজবাবু, ক্লার্ক, টাইপিস্ট, পিওন, হেডক্লার্ক, ক্যাশিয়ার, ম্যানেজার। জলের সঙ্গে আরো কি পান করলো ভগবানই জানেন। স্নানরত রামশরণ যখন ট্যাঙ্কের ভেতর আবিষ্কৃত হলো তখন পাইপ দিয়ে অনেক জল বয়ে গেছে। সাবান জলে ধৌত হয়েছে অনেক পাকস্থলী।

রাত্রির অন্ধকারে অফিসটার গুদোম ঘরের পাশে জানলার একটা পাট খুলে গেছে। হ্যারিকেন লণ্ঠনটা এদিক থেকে ওদিকে দোল খাচ্ছে। দোলাচ্ছে যশোদা। উল্টোদিকের অফিস ঘরের জানালা থেকে টর্চের আলো ফেলে যতীন পিওন সঙ্কেতের জবাব দিলে। অল্ কোয়াএট্ অন্‌দি অফিস ফ্রন্ট। চলে আসতে বাধা নেই। যশোদা ব্যবসা চালাচ্ছে। আদিম

কাল থেকে যে ব্যবসা চলে এসেছে। প্রথম যা নিয়ে ব্যবসার সুরু আর পত্তন হলো। যশোদা হ্যারিকেন দোলাচ্ছে। তার আরো খদ্দের চাই। দেহের তাগিদ নয়। খাই-খরচ আর খোরাকের ঝক্কি ঝামেলা সামলাতে প্রাণান্ত। দেশ, ঘর বাড়ী ছাড়া প্রাণীগুলোর জীবনযুদ্ধে নেমে দুবেলা দুমুঠো অন্ন জোগাড় করতে গিয়ে নাহেজাল অবস্থা। দেশ ভাগ হয়েছে। মহানগরী তাদের ঠাঁই দিয়েছে সত্যি, কিন্তু দিয়েছে কঠিন মূল্যের বিনিময়ে। অফিস অট্টালিকার তেতালার জানালা খুলে গেছে। খদ্দের সংখ্যা বাড়ছে। রাতের অন্ধকারে কেনাবেচা সুরু হবে এখুনি। শেয়াল গৃধিনীর দল মাংস খুবলে খুবলে খাবে। হাড়, মাস, মজ্জা, আর শোণিত। পচা গলিত নয়, টাটকা। সরু গলির ভেতর বিরাট ট্রাকটা যার আপাদমস্তক মালপত্রে ঠাসা।

ভোরের আলো ফুটে বেরুবার আগেই হাজারিবাগের পথে রওনা দেবে ট্রাকটা। ওর সারা অঙ্গ টারপলিনে ঢাকা। ট্রাকের তলায় শয্যা পেতেছে ড্রাইভার লাল চাঁদ। ভানুমতীর সারা অঙ্গ চাদরে ঢেকে তাকে পাশে শুইয়েছে। ট্রাকের তলায় কে আর উঁকি দেবে। ডালহৌসী খানিকবাদে পুরোপুরি ঘুমে ঢুলবে। খবর সরবরাহ অফিসে শুধু জেগে থাকবে একজন সাব এডিটর। টেলিপ্রিণ্টারের পাশে উঁচু টুলটাতে ঘুমে ঢুলবে একজন টাইপিস্ট। হাতের পাতা দিয়ে চোখ রগড়াবে গোলাম হোসেন, ওখানকার পিওন। একজন মেকানিক্ বসে বসে হাই তুলবে। ছারপোকা আর মশা মারবে। আর টেলিফোনটা নিয়ে খবরের জন্যে ধস্তাধস্তি করবে একজন রিপোর্টার। গেলাম হোসেন টেলিপ্রিণ্টার থেকে কাগজ ছিঁড়ে এনে সাব এডিটরের টেবিলে সাজাচ্ছে। খবরের মাপ আর আর আয়তন হিসেব করে কাগজ চিরছে। টুকরো কাগজগুলো ভিন্ন ভিন্ন কাঠ বা পিচবোর্ডের সঙ্গে এঁটে সাব এডিটরের টেবিলে সাজিয়ে দিয়ে যাচ্ছে। সেখানে খবরের ক্যারেক্সান্ হবে,

ছাঁটকাট হবে। তারপর গোলাম হোসেনের কর্ত্তব্য আবার সে কাগজের টুকরোগুলোকে টেলিপ্রিন্টারের কাছে উপবিষ্ট টাইপিস্টের কাছে পৌঁছে দেওয়া। টাইপিস্ট ছেলেটি টেলিপ্রিন্টারের ধারে উঁচু টুলটাতে বসে টাইপ করে চলেছে। খবরগুলো মুহূর্তে পৌঁছে যাচ্ছে খবরের কাগজের অফিসে এবং আরো অন্যান্য অনেক অফিসে। ছেলেটির গায়ে শুধু মাত্র গেঞ্জী রয়েছে, ঘামে গেঞ্জীটা জবজবে হয়েছে। খবর আসার বিরতি ঘটলে বা জমে ওঠা কাজ সমাপ্ত হলেই সে খানিকটা ছোলা চিবিয়ে নিচ্ছে। ভাঁড়ের চাএ চুমুক দিচ্ছে। ঘন ঘন ঢেকুর তুলছে।

গোলাম হোসেন মেদিনীপুরের কোনো এক গ্রাম থেকে এসে এ অফিসে একদিন যোগ দিয়েছিলো। প্রথমদিকে সে ফুট্ ফরমাশ খাটতো, তারপর প্রমোশান কুড়োতে কুড়োতে এখন সে টেলি-প্রিন্টারের পাশে এসে পৌঁছেছে। সে লেখাপড়া জানে না। শীর্ণ, দুর্বল সাব-এডিটরের কচি কোমল মুখখানি তার প্রাণে মায়া জাগিয়েছিলো। প্রথম রাত্রিরে দোকান থেকে গাঁটের পয়সা খরচ করে সে তেলে ভাজা কিনে এনেছিলো। অফিস ঘরে বার কয়েক চা বানিয়ে ছেলেটিকে পান করতে অনুরোধ জানিয়েছিলো। সান্ত্বনা দিয়েছিলো, প্রবোধ দিয়েছিলো, সাব-এডিটরের কাজকর্ম সম্বন্ধে উপদেশ দিয়েছিলো, ভবিষ্যতবাণী করেছিলো, আশ্বাস দিয়েছিলো।

ছেলেটি যখন চা পান করছিলো, তেলেভাজা চিবোচ্ছিলো, তখন এক দৃষ্টিতে সে সাব-এডিটর ছেলেটির মুখের দিকে তাকিয়েছিলো। দেখতে অনেকটা তার নিজের ছেলেটার মতো। গোলাম হোসেনের প্রায় সারাটা রাত্রিরই ডিউটিতে থেকে দৌড়ঝাঁপ করতে হয়। এ বয়সেও দৌড় ঝাঁপ থেকে রেহাই নেই।

কাজের অনেক দায় দায়িত্ব। ভুলচুক হলেই সর্বনাশ। নম্বর মিলিয়ে নিউজ দেওয়া নেওয়ার মধ্যে যথেষ্ট হুঁশিয়ারি আর সতর্কতার প্রয়োজন। টাইপিস্ট ছেলেটি, সাব-এডিটর সাহেব আর

মেকানিক বাবু ঘুমে ঢুলে পড়লে তাদের ধাক্কা দিয়ে জাগিয়ে দেওয়া, তার অনেক কাজের ভেতর একটা কাজ। লোকগুলো যাতে বারে বারে ঘুমে ঢুলে না পড়ে তার জন্যে কর্তৃপক্ষের আদেশ অনুযায়ী লোকগুলোকে বারে বারে চা সাপ্লাই দিতে হয়।

খরচা সব অফিসের, কিন্তু চা বানানোর ভার গোলাম হোসেনের ওপর ন্যস্ত। গোলাম হোসেন সারাটা জীবন কতো কিছু দেখলে। তার চোখের সামনে কতো ম্যানেজার এলো আর গেলো। কতো রিপোর্টারের নকরি কলমের এক খোঁচায় চলে গেলো। বদলী হলো কতো সাব-এডিটর। মধ্য রাত্রে সে দেখেছে পার্টি নেতাকে বিবৃতি আর বিবরণ নিয়ে ছুটে এসে ম্যানেজারের ঘরে ঢুকতে। টেলিপ্রিন্টার মারফত খবর চালু করবার জন্যে সনিবন্ধ অনুরোধ। ভোরের কাগজে যাতে ছেপে বের হয়ে যায়। মাঝরাতে কোনোখান থেকে বন্যার খবর এসেছে। রিপোর্টার বাবুকে ধাক্কা দিয়ে ঘুম থেকে তুলে দিতে হয়েছে। ম্যানেজারের হুকুম অনুযায়ী অফিসের ক্যাশ বাক্স থেকে গেলাম হোসেন টাকা বের করে রিপোর্টারের হাতে গুঁজে দিয়েছে। ছোট্ট স্যুটকেস বেব করে সমস্ত দরকারী জিনিষপত্র সাজিয়ে দিয়েছে।

রিপোর্টারকে তখুনি ছুটতে হবে। বাপের মৃত্যু সংবাদ বহন করে এনেছে তার একমাত্র ছেলে। অনুরোধ তার টেলিপ্রিন্টারের মাধ্যমে খবরটুকু কাগজ অফিসে পৌঁছে দিতে হবে। রাত্রের অন্ধকারে তার চোখের জল দেখেছে গোলাম হোসেন। নৈশভোজ সভায় কাদা ছোড়াছুড়ি হয়েছে। ককটেল্ পার্টিতে যে সব কুকীর্ত্তি ঘটেছে সে সব সিক্রেটস্ ফাঁস করে দেবার জন্যে লোক এসে এ্যাসিস্টেন্ট ম্যানেজারের হাতে পায়ে ধরেছে। বিরুদ্ধে দলের সমালোচনায় টেলিপ্রিন্টার যন্ত্রটি যাতে মুখর হয়ে ওঠে তার জন্যে ঘুষ পর্য্যন্ত দিতে চেয়েছে। অফিসের কর্তৃপক্ষ নিশ্চল, নীরব। উপেক্ষা করেছে প্রলোভন।

এ যুগে সবাই পাবলিসিটি চায়। তাই মৃত্যু সংবাদ ফলাও করে ছাপে। জন্মবার্ষিকী আর মৃত্যু বার্ষিকীর ঢাক ঢোল বাজায়। গোলাম হোসেনের ছেলেটা হঠাৎ একদিন মারা গেলো। গোলাম হোসেনও খবরটা কাগজে ছাপতে চেয়েছিলো। তার অফিস সারা ভারতে খবর যোগায়। দুনিয়ার খবর যোগাড় করে নিয়ে আসে। গোলাম হোসেন সেই অফিসেই কাজ করে। তার ছেলের মৃত্যুসংবাদ টেলিপ্রিণ্টার মারফত কাগজের অফিসে যাবে না তো যাবে কার। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত টেলিপ্রিণ্টার মারফত গেলোনা তার ছেলের মৃত্যু খবর। তার কথা অফিসের কেউ শুনলেনা। তারা তাকে বোঝালে যে জ্বর আর আমাশা হয়ে তার ছেলে মারা গেছে। ও খবরের জন্যে কোনো খবরের কাগজে আগ্রহ প্রকাশ করবে না। সাপে কাটলে, জলে ডুবে মরলে, ছোরা খেয়ে মরলে বরং কথা ছিলো। গোলাম হোসেন ঠিক বুঝে উঠতে পারে না কেন তার ছেলের মৃত্যুসংবাদ কাগজে কাগজে পাঠানো হলো না। সাপের বিষে মৃত্যু হলে মৃত্যুটা এমন কি মহান, গরিমাময় আর স্মরণীয় মৃত্যু হতো।

সাব এডিটর ছেলেটি প্রথম রাত্রিতে গোলাম হোসেনকে জিজ্ঞাসা করেছিলো, 'তোমার বয়েস কতো?'

শান্ত কণ্ঠে গোলাম হোসেন বলেছিলো, 'পঁয়ত্রিশ।' সাব-এডিটর ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে গোলাম হোসেনের দিকে তাকিয়ে ছিলো। গোলাম হোসেনের চুল পেকেছে। দাঁত পড়েছে। পঁয়ত্রিশে পৌছুতে গোলাম হোসেন অনেক বেশী সময় নিয়েছে। পঁয়ত্রিশ থেকে পয়তাল্লিশে পৌছুতে এখনো অনেক অনেক বছর দরকার হবে। অফিসে চাকরিতে ঢোকবার সময় গোলাম হোসেন খাতায় বয়স কতো লিখিয়েছিলো কে জানে, ভূমিষ্ঠ হবার সন তারিখ নিয়ে মাথা ঘামায়নি হয়তো। তবে গোলাম হোসেন যতো দিন পটল না তোলে ততোদিন চাকরি করবে। সাব এডিটরের এক পরিচিত

ব্যক্তি ত্রিশ বছর চাকরি করে পঞ্চাশ বছর পেন্‌সনের টাকা ভোগ করেছিলো। সরকারের কর্ম কর্তারা মাথা চুলকিয়েছিলো। সাব-এডিটর ছেলেটিও অফিসে যতোদিন ছিলো গোলাম হোসেন তাকে বড্ডো আদর যত্ন করতো। গাঁটের পয়সা খরচ করে কতোদিন খাইয়েছে পর্য্যন্ত।

প্রথম রাতে অফিসের ম্যানেজার সাবএডিটর ছেলেটিকে নিজের ঘরে ডেকে পাঠিয়েছিলো। হলঘরের সংলগ্ন একটা ছোট্ট ঘর। অনেকটা পায়রার খুপরীর মতো। তাতেই অফিসের ম্যানেজার সারাটা সকাল এবং সারাটা রাত কাটাতো। সপ্তাহের পাঁচটা দিন ম্যানেজার দিবারাত্র ওই ছোট্ট ঘরটিতে কাটিয়ে দিতো। বাড়ী পর্য্যন্ত যেতোনা। শনিবার বিকেলে বাড়ী চলে যেতো। ফিরতো সোমবার ভোরবেলা। ঐ ছোট্ট ঘরে খাটের ওপর ম্যানেজারের বিছানা পাতা থাকতো। এ ছাড়া নিত্য প্রয়োজনীয় টুকিটাকি জিনিষপত্তর এদিক ওদিক ছড়ানো থাকতো।

ঘরের সংলগ্ন বাথরুম। গোলাম হোসেন নিজের জন্যে এবং ম্যানেজারের জন্যে রান্না করতো। অফিসঘরে ম্যানেজারের বসবার জন্যে ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ছিলো। চেয়ার, টেবিল, দেয়াল আলমারী, ড্রয়ার, ডেস্ক,র‍্যাক্, ফাইল, নথিপত্তর, প্যাড, কালি, কলম, দোয়াত, কলিংবেল, কিছুরই অভাব ছিলো না। ম্যানেজার হলঘরে বসতো কম। বেশীর ভাগ সময়ই তার কাটতো এই ছোট্ট খুপরী ঘরে। ওখান থেকে সমস্ত অফিসের কাজকর্ম তত্ত্বাবধান করতো সে। ছেলেটি ভেবে অবাক হতো টেলিপ্রিণ্টারের ওই বীভৎস শব্দের ভেতর ম্যানেজার কি করে ঘুমুতো। অফিসের ওই আবহাওয়ার ভেতর কেউ কি বিশ্রাম সুখ উপভোগ করতে পারে? ম্যানেজার আর্টটা রপ্ত করে নিয়েছিলো।

ম্যানেজার ছেলেটিকে ডেকে পাঠিয়েছিলো। আর ছেলেটিও ম্যানেজারের নির্দেশ মতো ওই ছোট্ট ঘরের ভেতর ঢুকে

পড়েছিলো। বাবা, ভেতরে কি সাংঘাতিক অন্ধকার। ছেলেটির প্রথমে নজরে কিছুই আসে না। তার পক্ষে কিছু ঠাহর করতে পারা অসম্ভব। শুধু একটা খস্ খস্ শব্দ। ম্যানেজার বোধকরি নড়ে চড়ে বসলো। যেরকম ঘুঁট্‌ঘুঁটে অন্ধকার। ম্যানেজারের অঙ্গে জামাকাপড় রয়েছে তো? না কি বস্ত্রবিহীন অবস্থায় ম্যানেজার বিরাজ করছে?

ছেলেটির মনে পড়ে সেই কৃপণ লোক তুটোর কাহিনী। একজন কৃপণ আরেকজন কৃপণের কাছে বেড়াতে এসেছে। যে ব্যক্তি বেড়াতে এসেছে ধরে নেওয়া যাক তার নম্বর তুই। তুই নম্বর কৃপণ এক নম্বর কৃপণ মানে বাড়ীর মালিককে বললে, 'ভাই খানিকটা সময় গল্প গুজব করবো। অনর্থক কেন বিজলী বাতি জ্বলবে। শুধু শুধু ইলেকৃট্রিসিটি খরচ হবে। লাইট নিভিয়ে বসা যাক।' বলেই তুনম্বর ব্যক্তি সুইচটা খুট করে ওপরের দিকে উঠিয়ে দিয়ে ঘর অন্ধকার করে দিলে।

এর পর সে নিশ্চিন্ত মনে গল্প শুরু করলে। কতোক্ষণ পরে ঘরে একটা খস্ খস্ শব্দ। দ্বিতীয় নম্বর কৃপণ এক নম্বর কৃপণ ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করলে, 'ভাই। কি ব্যাপার? শব্দ কিসের?' প্রথম কৃপণ উত্তর দিলে, 'ঘর যখন অন্ধকারই হলো তখন আর ধুতি পরে বসা কেন। আতুড়ে গা ছিলো। এবার ধুতিটা খুলে উলঙ্গ হয়ে বসলাম। যেটুকু সময় ঘর অন্ধকার থাকবে ততোটুকু সময় বস্ত্রখণ্ড উয়ার এ্যাণ্ড টিয়ারেজ মানে ক্ষয় ক্ষতি থেকে অব্যাহতি পাবে।'

প্রথম কৃপণ দ্বিতীয় কৃপণের ওপর টেক্কা দিলে। ছেলেটি ভেবেছিলো কে জানে ম্যানেজারও সেরকম কোনো মতলব এঁটে বসে আছে কিনা। না, আলো জ্বলতেই দেখা গেলো ম্যানেজার সম্পূর্ণ স্বাভাবিক অবস্থায় মানে ধুতি আর ফতুয়া গায়ে চড়িয়ে বিছানার ওপর বসে রয়েছে। ম্যানেজার সে সন্ধ্যায় ছেলেটিকে অনেক কিছু বলেছিলো। অনেক আদেশ, উপদেশ। নিয়মকানুন সম্বন্ধে অনেক

সতর্ক বাণী। ম্যানেজার সাবধান করে দিয়েছিলো ছেলেটিকে। সে যেন রাত বাড়লে ঘুমিয়ে না পড়ে। অনেক বেশী মেসেজ টেবিলে জমে গেলে ডিস্‌টরটেড্‌ মেসেজের দোহাই দিয়ে মেসেজগুলো দলা পাকিয়ে যেন ছিঁড়ে না ফেলে। টেলিপ্রিণ্টারে ফ্ল্যাশ্‌ বা অন্য কোনো রকম জরুরী খবর এলে তখুনি যেন ম্যানেজারের নিদ্রাভঙ্গের চেষ্টা করা হয়। জাঁদলের কাগজগুলোর অফিস থেকে ফোন এলে, হোমরা চোমরা লোকগুলো ফোন করলে যেন খুব বিনীত ভাবে সব কথার উত্তর দেওয়া হয়। মেসেজের কারেকসন্‌ দেওয়া হয় যেন খুব ভেবে চিন্তে। নামকরা কাগজগুলো নিউজ এজেন্সীকে মোটা টাকা দেয়। ছেলেটির যেন সে খেয়াল থাকে।

ছেলেটি নিজের টেবিলে ফিরে আসে। রাত্রি বাড়তে থাকে। টেলিপ্রিণ্টার থেকে কালো কালো পোকার রাশি বেরিয়ে আসছে। মিয়ামি বীচে সুন্দরীদের ভেতর সৌন্দর্য প্রতিযোগীতার আসর গরম হয়ে উঠেছে। মণ্টে কার্লোতে তারকাদের নগ্ন নৃত্যের প্রতিশ্রুতির বিরুদ্ধে পুলিশের গোপন অভিযান। প্যাসিফিকের দ্বীপগুলোতে হুলাহুলা ড্যান্সের লোভে ট্যুরিস্টদের ভীড় বেড়েছে। এবার ধারাবাহিক ভাবে পৃথিবীর নামকরা কতোগুলো জাহাজের স্টোরি বেরিয়ে আসছে টেলিপ্রিণ্টারের গহ্বর থেকে।

পার্টওয়ান, পার্ট টু, পার্ট থ্রী, পার্ট ফোর, পার্ট ফাইভ। স্টোরিস্‌ এ্যাণ্ড স্টোরিস্‌, ইনটারেস্টিং এ্যাণ্ড ফ্যাসিনেটিং। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাহাজগুলো সম্বন্ধে স্টোরিস্‌ পাঠাচ্ছে বোম্বে অফিস, একটার পর একটা। পাঠাচ্ছে টেলিপ্রিণ্টার মারফত। জার্মান যুদ্ধ জাহাজ গ্রাফ্‌স্পী, ওজন ১২০০০ টন। মণ্টে ভিডিও বন্দরের অনতিদূরে রয়েছে আরো তিনটি যুদ্ধ জাহাজ। তার ভেতর এ্যাচিলেস্‌ অন্যতম।

সুরু হলো বিখ্যাত ব্যাটল্‌ অবদি রিভার প্লেট্‌। নিউজিল্যাণ্ডের তিনটি জাহাজ কর্তৃক পরিবেষ্টিত হয়ে প্রমাদ গুনলো গ্রাফ্‌স্পী। মুহুর্মুহু জার্মান জাহাজের কামান থেকে অগ্নিবর্ষণ সুরু হলো।

অন্যপক্ষ উত্তর দিতে দেরী করলে না। অবিস্মরণীয় নৌযুদ্ধ, ভীষণ এবং ভয়ানক। গ্রাফ্ স্পী হেরে গেলো। জখম হলো ভীষণ ভাবে। গ্রাফ্ স্পীকে স্বহস্তে উড়িয়ে দিলে জার্মান কমাণ্ডার। ওড়াবার আগে প্রচুর মদ খেয়ে সারা জাহাজটার ভেতর পাগলের মতো ছুটোছুটি করলে। চুমো খেলে ওর সর্বাঙ্গে। রূপসীর হালে, মাস্তুলে, চোঙএ। এর পর পিস্তলের নলটা মাথায় ঠেকিয়ে মাথার খুলি পিস্তলের গুলিতে উড়িয়ে দিলে।

এ্যাচিলেস্ রচনা করলো এক গৌরবোজ্জল কাহিনী। নিউজিল্যাণ্ডের এ জাহাজটি পরে এলো ভারত সরকারের হাতে। নাম হলো আই. এন. এস্. নিউদিল্লী। ১০ই এপ্রিল, ১৯১২ সাল। সাদাম্পটন্ বন্দর থেকে যাত্রী নিয়ে টাইটানিক্ জাহাজ ছাড়লো। বিশ্বের বৃহত্তম যাত্রীবাহী জাহাজ। ভবিষ্যতবাণী শোনালে অনেকে। 'এ জাহাজ কখনো ডুববে না।' ১৫ই এপ্রিল রাতের অন্ধকারে ভাসমান তুষারবৃত পাহাড়ের গায়ে ধাক্কা খেয়ে টাইটানিক্ ডুবলো। দেড় হাজার প্রাণ বলি হলো। ক্যাপ্টেন স্মিথ রিভলভারের গুলীতে আত্মহত্যা করলে। কতো গল্প শোনালে কতো লোকে। ডিকিনসন্ সাহেবের স্ত্রী নাকি কেবিনে এগার হাজার ডলার দামের জুয়েলারী ফেলে এসে স্বামীকে ফেরত পাঠালে একটা সামান্য মাফ্লার নিয়ে আসার জন্যে। লেডি গর্ডন নাকি বললে তাঁর স্বামীকে—'ওই জাহাজের সঙ্গে আমাদের নূতন কেনা ফারকোটটি গেলো।' এরকম অনেক অনেক গল্প টেলিপ্রিণ্টার মারফত এসেছিলো। স্টোরিস্ এ্যাণ্ড স্টোরিস্।

রাত্রি বাড়ছে, টেলিপ্রিণ্টার চলছে ঘটাং ঘটাং করে। টেলিফোনটা কানে লাগিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে নিউজ এজেন্সীর রিপোর্টার। নিউজ এজেন্সীর আদি এবং অকৃত্রিম বন্ধু। সব রকম হাঙ্গামা হুজ্জতির জন্যে তাকে প্রস্তুত থাকতে হয়। ওসব ঘটনা

ঘেঁটে নিংড়ে নিংড়ে রস বের করে নিয়ে আসা তার কর্তব্য। বিলাস সোম নিউজ এজেন্সীর রিপোর্টার। টেলিফোন মারফত সে সংগ্রহ করছে সহরের সারাদিনের ক্যাজুয়ালটি নিউজ। ছেলেটি, মানে সাব এডিটর, তার টেবিল থেকে দেখছে আর দেখছে।

'মেডিক্যাল কলেজ হস্‌পিটাল। কোনো রকম এ্যাক্‌সিডেন্টের খবর? কি বললেন? নেই কিছু। দেখুন না স্যার ভালো করে। দয়া করে একটু খোঁজ খবর নিন। কি বললেন? খোঁজ নিয়েছেন, নেই কিছু। আগুনে পোড়া, ছাদ থেকে লাফানো, বিষ খেয়েছে এমন কোনো কেস্‌। কোনো খবর নেই।' বিরক্ত হয়ে টেলিফোন নামিয়ে রাখে বিলাস সোম।

আবার খানিকক্ষণ বাদে টেলিফোন নম্বরটা ডায়াল করে বিলাস সোম।—'পিজি ক্যাসুয়ালটি ওয়ার্ড, নিউজ এসেন্সীর অফিস থেকে ফোন করছি। কোনো খবর আছে? কোনো রকম ক্যাসুয়ালটি, জলে ডোবা, মোটর চাপা পড়া কেস্‌, ট্রেনে কাটা পড়েছে রয়েছে এমন কেউ, ছুরিকাঘাতে আহত? কি বললেন? নেই কিছু? কিছুই ঘটেনি। একেবারে ফাঁকা ওয়ার্ড।' টেলিফোনটা নামিয়ে রাখে বিলাস।—'মুস্কিলেই ফেললো দেখছি। একেবারে কোনো খবর নেই।' বিড় বিড় করে বিলাস। রুমাল দিয়ে কপালের ঘাম মোছে। যেরকম প্রচণ্ড আর ভ্যাপসা গরম। ছেলেটি নিবিষ্ট মনে সবকিছু দেখছে। তার প্রথম রাতের অভিজ্ঞতা।

'শম্ভুনাথ হস্‌পিটাল, এমারজেন্সী ওয়ার্ড। হ্যাঁ। আমি নিউজ এজেন্সীর রিপোর্টার। কে গোপালবাবু নাকি? আমি বিলাস সোম। ভালো আছেন দাদা? হ্যাঁ আমি ভালো। এ্যাক্‌সিডেন্টের কোনো খবর আছে নাকি? নেই। দেখুন না দাদা ভালো করে। ইলেকট্রিক শকে মৃত্যু, সাপে কাটা, বজ্রপাতে মৃত্যু, কোনো রকম দুর্ঘটনা ঘটেনি?' টেলিফোনটা নামিয়ে রাখে বিলাস সোম।

এবার সে একটা সিগারেট ধরালে। হুস্ হুস্ করে ধোঁয়া ছাড়লে খানিকটা। নিজের মনে বিড় বিড় করলে খানিকটা সময়। আরো কয়েকটা হাসপাতালে চেষ্টা করলে বিলাস সোম। কোনো খবর পেলে না। শেষ চেষ্টা বাঙ্গুর হাসপাতাল।

'শুনুন। আমি নিউজ এজেন্সীর রিপোর্টার। কোনো রকম এ্যাক্সিডেন্টের খবর রয়েছে? কোনো রকম ক্যাজুয়ালটি নিউজ? কি বললেন? রয়েছে।' মুহূর্তে বিলাস সোমের মুখ চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। 'ডিটেলস্‌টা বলুন দেখি, আমি নোট করে নিচ্ছি। কাগজ পেন্সিল বাগিয়ে তৈরী হয় বিলাস সোম। শিকারী যেন শিকারের গন্ধ পেয়েছে।—'কি বললেন? না, না, এ অসম্ভব। হতে পারে না, ছেলে মার বুকে ছুরি বসিয়েছে। বলেন কি মশাই, তা কি সম্ভব? কি সাংঘাতিক কথা শোনাচ্ছেন। যা বলছেন তাতে মনে হচ্ছে এই মিনিট পচিশের ভেতরই ঘটনা ঘটেছে। ছেলে পাগল নাকি?' বিলাস সোম চুপ করলো। টেলিফোনের অন্য প্রান্ত থেকে কথা ভেসে আসছে আর মনোযোগ দিয়ে সোম শুনছে।

'মার পর পুরুষের সঙ্গে অসঙ্গত আচরণ। এই মার অপরাধ। ঘটেছে বাপের অজ্ঞাতে। ছেলে অনেকদিন থেকে লক্ষ্য করে এসেছে। না, না, তার জন্যে ছেলে এরকম একটা গুরুতর অপরাধ করতে পারলে। কি বললেন, বাবা বাড়ী নেই।' ওদিক থেকে ভদ্রলোক আরো যেন কিছু বললে। বিলাস সোম শুনছে।—'আপনারা হাসপাতালের ভ্যান্ পাঠিয়েছেন? পুলিশে খবর গেছে? বাঁচবে তো? হাসপাতালে কেস এলে বলা সম্ভব হবে। তা ঘটনাটি কোন পাড়ায় ঘটলো?' সাবএডিটর এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে আর শুনছে সমস্ত কথা।

বিলাস সোমের কানে টেলিফোনের রিসিভারটা ধরা রয়েছে। 'নিবারণ সেন লেন। নিবারণ সেন লেন, এ যে আমাদের পাড়া।'

চেঁচিয়ে ওঠে বিলাস সোম। নোটবুকে সে নোট নিচ্ছে। বিলাস সোম ভীষণভাবে উত্তেজিত।

'বাড়ীর নম্বর বলুন দেখি।' বলে বিলাস সোম।

'বারোর বাই তিন। এ. বি. সি.।'

টেলিফোনের অন্য প্রান্ত থেকে ভেসে আসা কথার প্রতিধ্বনি তোলে বিলাস সোম। থর থর করে সে কাঁপছে। তার সর্বাঙ্গ কাঁপছে। বিলাস সোম দাঁড়িয়েছিলো। সে টলছে। তার কপাল, গাল, গলা, নাক, থুতনী ঘামে ভিজে উঠেছে। কপালের আর গলার শিরাগুলো ফুলে উঠেছে। ঘন ঘন ঢোক গিলছে সে।

'নম্বরটা আবার বলুন দেখি।'

ও প্রান্ত থেকে আবার নম্বরটা বলা হয়।—'বারোর বাই তিন, এ. বি. সি.।' বিড় বিড় করে বলে ওঠে বিলাস সোম।—'কার বাড়ী? কার বাড়ী? বাড়ীর কর্তার নামটা বলুন দেখি?' গর্জে ওঠে বিলাস সোম। তার হাত থরথর করে কাঁপছে। টেলিফোনের অন্যপ্রান্ত থেকে অপরাধীর নাম আর বাড়ীর কর্তার নাম বলা হয়েছিলো। এ প্রান্তে একটা চীৎকার, একটা আর্তনাদ। মেঝেতে ঢলে পড়ে নিউজ এজেন্সীর নিজস্ব সংবাদ দাতা। টেলিফোনটা সশব্দে টেবিলের ওপর ছিটকিয়ে পড়ে। অজ্ঞান হয়ে পড়বার আগে বিলাস সোমের কণ্ঠ থেকে তিনটি শব্দ বের হয়েছিলো।—'মমতা, আমার স্ত্রী।' টেলিপ্রিণ্টারে নানা রকম খবর আসছে। হাজার হাজার পোকা যেন আর্তনাদ করে বেরিয়ে আসছে। সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানটির সঙ্গে ছেলেটির যোগসূত্র ছিন্ন হয়েছে বহুকাল। সে শুনেছে অফিসটি সদর দরজা বন্ধ করেছে অনেক বছর আগে। অন্তিম নিশ্বাস ত্যাগ করে কালের গর্ভে বিলীন হয়েছে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

মেজর চোপরার কেমন যেন একটা চোপরাও গোছের ভাব। সারাদিন মদে চুর। তূরীয় অবস্থা, রোষ কষায়িত লোচনে ভৎসনার ভ্রূকুটি। গোঁফের দুপ্রান্তের গতি ঊর্দ্ধমুখী। গোঁফে তা দিচ্ছে অনবরত। দিচ্ছে আর দিচ্ছে। ওটা মিলিটারী ঢং আর কায়দা। মনটা সাদা মাঠা। বলিষ্ঠ পুরুষ। বুকের ছাতি প্রকাণ্ড। হাতের গুলী দেখলে পিলে চমকায়। সারা অঙ্গ লোমে ঢাকা। গলার কাছে সার্টের বোতাম এঁটে দিলেও লোমরাজি মাথা উঁচু করে উঁকিঝুঁকি দেয়। নেফার অরণ্যের সঙ্গে মিল খোঁজে। বোধ হয় সখ্যতা পাতাতে চায়। নেফার রেঙ্গিনের ফরেস্ট বাংলোতে বসে ছিলাম আমরা তিনজন, আমি, মেজর চোপরা আর মেজর দলীপ সিং বেদী। মেজর চোপরা পাঞ্জাবী হিন্দু। দলীপ সিং দাড়ি, গোঁফ, পাগড়ী নিয়ে পুরোপুরি শক্ত সামর্থ্য শিখ। দেহে চওড়া হাড়। জোয়ান পুরুষ। মেদ মাংস নিয়ে পুরোপুরি ছয় ফিটের এক ইঞ্চিও কম নয়। দুজন পাকা মিলিটারীর লোক। মেসিন্‌গান আর ব্রেন্‌গান চালিয়ে দুজনেই হাতে কড়া ফেলেছে। আর আমি কলম পিষে হাতে কড়া ফেলে পুরোদস্তুর স্কুলমাষ্টার বনেছি। পেশায় অনেক ফারাক্‌। তবু মোলাকাত হওয়া মাত্র দোস্ত বনে গেছি। নেফার জঙ্গলে সবই সম্ভব। দুটো জবরদস্ত মেজরের সঙ্গে বন্ধুত্ব বজায় রাখা চাট্টিখানি কথা নয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে দুজনেই প্রবল বিক্রমে যুদ্ধ করেছিলো। একজন জার্মান জেনারেল রমেলের সাঁজোয়া বাহিনীর বিরুদ্ধে। আর একজন মালয়ের জঙ্গলে জাপানী বাহিনীর বিরুদ্ধে সৈন্যসামন্ত নিয়ে রুখে দাঁড়িয়েছিলো। এখন সৈন্যবাহিনী নিয়ে টহল দেয় সারাটা নেফা। এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত। দরকার হলে ছুটে যায় নাগাল্যাণ্ডে। কখনো

বা মিজোদের অঞ্চলে। প্রশাসনের নাট্ বল্টুগুলো টাইট করে দিয়ে আসে।

দুই মেজরই ডোগ্রা রেজিমেন্টের সঙ্গে অনেককাল সংশ্লিষ্ট রয়েছে। ডোগ্রাদের কথায় মনে পড়ে গুলাব সিংএর কথা। শিখদের অধিপতি রণজিৎ সিং রাজা গুলাব সিংকে জম্মু ফেরত দিয়েছিলেন। গুলাব সিং মধ্য এশিয়ায় আক্রমণ চালিয়েছিলো। লাডাক্, স্কারডু, গিলগিট্ এবং বালটিস্তান্ নিজের এলকাভুক্ত করেছিলো। ডোগরা সৈন্যবাহিনী সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে দশ হাজার থেকে পনেরো হাজার ফিট ওপরে যুদ্ধ চালিয়েছিলো। তিব্বত আক্রমণ করতে গিয়ে জেনারেল জোরাওয়ার্ সিং নিহত হয়েছিলো।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ডোগরা সৈন্যবাহিনী ফ্রান্সের ঠাণ্ডা এবং আর্দ্র রণাঙ্গনে অভূতপূর্ব বীরত্বের পরিচয় দিয়েছিলো। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ডোগরা সৈন্যবাহিনী আশ্চর্য্য রণনৈপুণ্য দেখিয়েছিলো মালয়, সিঙ্গাপুর, ব্রহ্মদেশ, পারস্য, ইরাক আর ইন্দোনেশিয়ার রণাঙ্গণে। চমৎকার বাংলা বলতে পারে মেজর চোপরা। চোপরা ক্রমাগত হুইস্কি আর জিন্ পান করে চলেছে। আমি আর দলীপ সিং বেদী মদ স্পর্শ করিনি। চোপরা পরিধান করেছে নাগা শাল, পাথর বসানো মিস্‌মী কোট্। ট্রাইবস্‌দের সব কিছুরই সে ভক্ত। সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে, বর্ষণ মুখর সন্ধ্যা। বৃষ্টি খানিকটা সময় বিরাম দিয়েছিলো। সেই ফাঁকে আদি ছেলে মেয়েরা চলোং পন্থ নাচ নেচে-ছিলো। মেজর চোপরা এরিমধ্যে দুপাক নেচে এসেছে। আপঙ্. গিলেছে। দুটো মেয়েকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেয়েছে। মেয়ে দুটো হেসে গড়িয়ে পড়েছে।

মেজর ভেরিয়ার এলুইন্ সাহেবের ভক্ত। নেফা এবং ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের ট্রাইবস্‌দের সম্বন্ধে রিসার্চ করে ভেরিয়ার সাহেব জ্ঞানীগুণীদের যথেষ্ট প্রশংসা কুড়িয়েছিলেন। মেজর বলেছিলো, 'হোয়েন্ ইউ আর ইন্ রোম ডু এ্যাজ্. দ্য

রোমানস্ ড়ু'। ভেরিয়ার সাহেবকে সব ব্যাপারে ফলো করে চলতো চোপরা সাহেব। মেজর বলতো, ট্রাইবসদের সঙ্গে সহজ সরলভাবে মেলা মেশা করো। ওদের বেশভূষায় নিজেকে সজ্জিত করো। ওদের খাবার পানীয় গ্রহণ করো। ওদের পুজো-পার্ব্বণে যোগ দাও। ওদের বুঝতে দিয়োনা যে তোমরা নেফার বাইরে থেকে এসেছো। নেফাকে তোমরা শাসন করতে এসেছো। এরকম ভাবধারা যেন কোনো সময়েই ওদের মনে না জাগে। তুমি ওদের একজন বনে যাও। ওদের সহৃদয়তা আর দরাজ মনের পরিচয় তুমি ততোক্ষণ পাচ্ছোনা যতোক্ষণ তুমি ওদের সঙ্গে সহজ সরলভাবে মেলামেশা না করেছো।'

ওদের সঙ্গে কয়েক পাক নেচে মেজর চেয়ারে এসে ধুপ করে বসে পড়লো। আকাশটা যেন হাত পা ছড়িয়ে কাঁদতে বসেছে। অঝোরে কাঁদছে। আজ দুদিন থেকে অবিরাম বৃষ্টি পড়ছে। মাঝে মাঝে বিরতি। ইন্টারমিশন্। নেফাতে বৃষ্টি সুরু হয় সেই এপ্রিল থেকে। কতোদিন এ বৃষ্টি চলবে কে জানে। 'আয় বৃষ্টি ঝেপে, ধান দেবো মেপে।' এখানে বলতে হবে ঠিক উল্টো কথা। লক্ষ্মী, সোনা, মাণিক আমার। চাল সেদ্ধ করে ভাত ফুটিয়ে দেবো। বৃষ্টিটা বন্ধ কর দেখি বাপু। 'আল্লা ম্যাঘ্ দে। পানী দে।' এ গান এখানে গাইলে লোক ক্ষিপ্ত হয়ে উঠবে। বিশদিন থেকে বাইশদিন পর্য্যন্ত চলবে এ বৃষ্টি। সূর্য্যিমামা নেবেন ক্যাজুয়াল লীভ নয়, একেবারে আনর্ড লীভ্।

অলরেডী সমস্ত নেফা জলে ভেসে গেছে। যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন। নেফার অনেক স্থানের সঙ্গে বাইরের জগতের যোগাযোগ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। লোহিতের ডিগারু আর কুণ্ডিলপানীতে ঢল নেমেছে। লোহিত নদী তার দুকূল ছাপিয়ে বয়ে চলেছে। সিয়াংএর ব্যবস্থা গুরুতর। কয়েকদিন হলো ব্রহ্মপুত্র বিপদ সীমা ছাড়িয়েছে। ডিব্রুগড় কাঁপছে থর থর। শুনছি পাশিঘাটের এয়ার স্ট্রীপে আজ দিন

সাতেক হলো প্লেন নামতে পারেনি। ডিব্রুগড়ের বাজার থেকে সওদা নিয়ে ব্রহ্মপুত্র পাড়ি দিয়ে বোট আসতে পারেনি। চিঠি পত্তর আসেনি। বেশ কয়েক দিন হলো সংবাদপত্র পৌঁছয়নি। পাশিঘাটে কেরোসিনে টান পড়েছে। এদিকে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হতো যে জেনারেটারে সে জেনারেটার কয়েকদিন যাবত অকেজো হয়ে পড়ে রয়েছে। জেনারেটার যে ঘরে রাখা ছিলো সে ঘরে জল ঢুকেছিলো। ফলে পাওয়ার সাপ্লাই বন্ধ। পাশিঘাটের বরাতে যে ঘণ্টা দু এক বিদ্যুৎ সরবরাহ জুটতো তাও বন্ধ। কেরোসিনের অভাবে রেঙ্গিনের অবস্থা শোচনীয়। চিতা বাঘ আর হাতীর উপদ্রব বেড়েছে।

নাচগানের ওপর চোপরা সাহেবের বড্ডো ঝোঁক। বলেছিলো চোপরা সাহেব, 'লোকনৃত্য আমি কম দেখিনি। দেখেছি বাঙলা দেশের গাজন, দার্জিলিংএর লেপ্‌চা ও লামাদের মুখোশ নৃত্য, আসামের বিহু উৎসবে হুচারী নৃত্য, সেরাইকেল্লা আর খরসোয়ানের ছৌনাচ, গুজরাটের গরবা, পাঞ্জাবের ভাঙ্গরা আর গিদ্দা, সিমলার রুমাল নাচ, নাগপুরের কাছাকাছি ফুঁইয়া নাচ, জম্মু ও কাশ্মীরের কুঁদলোক নৃত্য।' চোপরা সাহেব বালীদ্বীপ ভ্রমণ করে এসেছিলো। সে জানালে বালী দ্বীপের নাচের সঙ্গে ভারতীয় নাচের সাদৃশ্যের কথা। বালীদ্বীপের নাচে মুদ্রার ব্যবহার রয়েছে। বিশেষ করে রামায়ণের কাহিনী অবলম্বনে নাচের কথা চোপরা বললে।

শুধু নাচের কথা বলেনি চোপরা সাহেব। সঙ্গে সঙ্গে খানিকটা করে ডেমনস্ট্রেশন্। বুঝলাম সবটা মদের ঝোঁকে। একটু বাড়াবাড়ি করছে বলেই মনে হলো। মদ্য পান করে চোপরা সাহেব প্রায়শ হুঁশ আর খেয়ালের বাইরে চলে যায়। তখন মেজাজের আর দিলের ঠিক থাকে না। অকাজ কুকাজ করে ফেলে হামেশা। এই তো দিন কয়েক আগে বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে অফিসে এলো চোপরা সাহেব। রেইন্‌কোট থেকে জল

ঝরছে। আরদালী দৌড়ে গেলো সাহেবের গা থেকে রেইন্‌কোট খুলে রাখবে বলে। বোতাম খোলবার পর রেইন্‌কোট শরীর থেকে মুক্ত করতে গিয়ে জিহ্বায় কামড় দিয়ে আরদালী পা চালিয়ে পগার পার। রেইন্‌কোটের আড়ালে দিগম্বর চোপরা সাহেব। বস্ত্র খণ্ডের চিহ্ন শরীরে নেই। সারারাত মদ গেলবার পর চোপরার প্রায় অচৈতন্য অবস্থা। বেশী বেলায় অফিসের কথা মনে পড়তেই দে ছুট। বিলকুল নগ্ন দেহের ওপর রেইন্‌কোটটি চাপিয়ে অফিসমুখো।

পাশিঘাটে কৃষিদপ্তরের সেকেণ্ড মানে পদ মর্য্যাদায় যার স্থান দ্বিতীয় সে নাকি একদিন মেজর সাহেবকে বলেছিলো যে এক বোতল রাম পান করে মেজর সাহেব নির্ঘাৎ টল্‌বে। হেসে উড়িয়ে দিয়েছিলো চোপরা সাহেব। এরপর কথা কাটাকাটি, বাদানুবাদ। মেজর সাহেব প্রতিবাদের ঝড় তুললো: 'কখনো নয়। মালয়ের জঙ্গলে পুরো দু বোতল গলায় ঢেলেও আমি তিনটে জাপানীকে পরপর বেয়নেট বিদ্ধ করেছিলাম। পা টলেনি। হাত কাঁপেনি।' সব কিছু বলতে বলতে মেজর সাহেব কেমন যেন উদাসীন হয়ে যায়। যুদ্ধের দিনগুলো বোধ করি মনে পড়ে। মালয়ের রাবারের জঙ্গলে বিকেলের দিকে বৃটিশ আর ভারতীয় সৈন্যদের সঙ্গে জাপানী সৈন্যদের তুমুল সংগ্রাম চলেছে। শত্রু সৈন্য মুক্ত অঞ্চল মনে করে একটা জঙ্গলের ভেতর মেজর সাহেব আর তার কোম্পানীর সৈন্যেরা ঢুকে পড়েছিলো। ফাঁকা প্রান্তর। পা পা করে এগুচ্ছিলো ওরা। কিন্তু হঠাৎ জাপানীরা গুলীবর্ষণ সুরু করলো। বিরাট বিরাট গাছের ভেতরটা পরিষ্কার করে তার ভেতর জাপানীরা আত্মগোপন করে বসেছিলো। সঙ্কেত পাওয়া মাত্র ওদের ব্রেনগান, মেসিনগান, রাইফেল গর্জ্জন করে উঠলো। মেজর সাহেবের দলের অনেকে মারা পড়লো।

বনভূমিতে অন্ধকার নেমে এসেছে। তবু অদ্ভুত সাহস নিয়ে

চোপরার কোম্পানীর লোকেরা ওদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। যুযুৎসুর প্যাঁচে পরস্পর-পরস্পরকে চিৎপাত করে বেয়নেট চড়চড় করে পেটের ভেতর ঢুকিয়ে দিচ্ছে। হাতাহাতি যুদ্ধ চলেছে। ডোগ্‌রা রেজিমেন্টের দুদ্ধর্ষ, তাগড়া, জোয়ান, একরোখা লোকগুলো। জাপানীরাও কম নয়। এই কম্পানীর লোকগুলো একটা ক্র্যাক্ জাপানী ডিভিসানের দলভুক্ত। যুদ্ধ দেখেছে ওকিনাওয়ায়, লুজোন আর জাভা দ্বীপে। মুখ দিয়ে একটা অদ্ভুত শব্দ করে ওরা এগিয়ে যায়। ওটা ওদের ব্যাটেল্ ক্রাই। ছোটোখাটো আকৃতির লোকগুলো, ভীষণ মজবুত দেহগুলো। থাকে থাকে মাসেল সাজানো। চওড়া হাড়। অধ্যবসায় আর পরিশ্রম সহকারে নিজেদের গড়ে পিটে তুলেছে। ব্যাটেল গ্রীণ পোষাকে টুক্ করে ঘাসপাতার আড়ালে আত্মগোপন করে অতি সহজে। তারপর লেপার্ডের চাইতে ক্ষিপ্রগতিতে বেরিয়ে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে শত্রুর ওপরে।

সেদিন সন্ধ্যায় মালয়ের জঙ্গলে চোপরা কম সাহসের পরিচয় দেয়নি। তৃতীয় জাপানীকে বেয়নেট বিদ্ধ করে ততোক্ষণে তার বুকের ওপরে সে চেপে বসেছে। মৃত্যুর আগে রক্তবমি করছে লোকটা। যন্ত্রণায় মুখটা বিকৃত করছে। একটি অল্প বয়স্ক ছেলে। কিন্তু ওরই ভেতর ছেলেটি সার্টের বুকপকেটে হাত দিয়ে একটি ফটো বের করে আনে। একজন বর্ষীয়সী মহিলা। চোপরার হাতে ফটোটা গুঁজে দিয়ে পরিষ্কার ইংরেজীতে ছেলেটি বলে—'আমার মা।' তারপরই সে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। ওর জামা কাপড় হাতড়ে আইডেন্‌টিটি কার্ড বের করে চোপরা বুঝেছিলো জাপানী ছেলেটি সাধারণ সৈন্য নয়। জাপানী সৈন্য-দলের ক্যাপ্টেন। কিছুক্ষণের জন্যে হতবুদ্ধি হয়ে বসেছিলো চোপরা সাহেব। কিন্তু সে অল্প সময়ের জন্যে। সম্বিৎ ফিরে পেয়েই আবার ছুটেছিলো শত্রু অন্বেষণে।

মালয়ের জঙ্গলে তিন বোতল রাম গলাধঃকরণ করে চোপরা সাহেব যদি অতোগুলো শত্রুর সঙ্গে যুঝতে পেরেছিলো তবে কিনা আজ স্রেফ এক বোতল রাম খেয়ে সে টলবে। লোকটা মানে কৃষিদপ্তরের কর্মচারী বলছে কি। ওর জানা উচিত যে চোপরা জাঁদরেল মিলিটারী অফিসার। এর পরেই কথা কাটাকাটি, বচসা, বিবাদ। আর তারপর চোপরা সাহেব একটি ঘুষি চালিয়েছিলো। কৃষি বিভাগের দত্ত মহাশয় ওই একটি ঘুষির স্বাদ আস্বাদন করে চেয়ার থেকে ঢলে মাটিতে পড়েছিলো। একেবারে সটান হয়ে মেঝের ওপর শুয়ে পড়েছিলো। বাহ্যজ্ঞান শূন্য অবস্থা। আর তার পাশে দাঁড়িয়ে মেজর সাহেব গুনে যাচ্ছিল, 'এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ।' দশ পর্য্যন্ত গুণে সজোরে হেসে উঠেছিলো মেজর সাহেব, 'স্রেফ নক্ আউট।' মদের ঝোঁকে চেঁচিয়ে উঠেছিলো। 'নেক্সট্ ম্যান্, হেভী ওয়েট চ্যাম্পিয়ানশিপ, ফাইনাল রাউণ্ড।' মদে চুর চোপরা সাহেব। মিলিটারীর নিয়ম অনুসারে অবশ্য শাস্তি তাকে পেতে হয়েছিলো।

চোপরা পশ্চিম পাকিস্তানের লোক। আমাকে জিজ্ঞাসা করলে, 'পূর্ব-পাকিস্তানে সব ছেড়েছুড়ে এসেছো?'

'ছিলো না কিছুই। ধন, দৌলত, সম্পদ, ঐশ্বর্য্য একদম নিল্। হ্যাঁ, তবে মনটা ফেলে এসেছি।' জবাব দিলাম।

'আমরা ভারতে এসে ক্ষতিপূরণ করেছি অনেকটা। তোমরা বাঙ্গালী জাত বড্ডো সেন্টিমেন্টাল।'

'সে জন্যেই পেয়েছি শরৎচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, সুভাষচন্দ্র আর বিবেকানন্দকে।' জবাব দিই আমি।

মেজর বলে, 'আমি অনেক সময়ে ভাবি তোমরা অতো কোমল হয়ে, সুকুমার বৃত্তির চর্চাতে আকণ্ঠ নিমগ্ন হয়েও গোলাবারুদ আর টেরোরিজিমের ভেতর নিজেদের কি করে অতো সহজে জড়িয়ে ফেলো। বিলকুল ভয়শূন্য আর নির্ভীক বনে যাও। রবীন্দ্র সঙ্গীতের ফাঁকে ফাঁকে শোনাও 'দিল্লী চলোর' বজ্র-নির্ঘোষ।'

'সম্ভবত মাটির গুণ। চরিত্রের বৈশিষ্ট্য।' বলি আমি।

'আমার মনে আছে লাহোরের প্রচণ্ড শীতের সন্ধ্যায় ভিখিরীটা শীতে মরছিলো। লোক ভীড় করে মজা দেখছে। ভিখিরীটা শীতে ঠক্ঠক্ করে কাঁপছে। এগিয়ে এলো এক যুবক। গায়ে জড়ানো চাদরটা খুলে ভিখিরীকে দিয়ে চলো গেলো। ওর দেহের ওপর অংশে ছিলো মাত্র একটা হাত কাটা গেঞ্জি। যুবকটিকে এক ঝলক দেখে মনে হলো পাঞ্জাবের লোক নয়। এর পরের দিন লাহোরের রাজপথে পুলিশের সঙ্গে গুলী বিনিময়। দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে যুঝেছিলো যুবক। বাঙ্গালী যুবক, আগের দিন সন্ধ্যে বেলার সেই ছেলেটি। ভীষণভাবে আহত হয়ে ধরা পড়েছিলো। পার্টিশানের আগেকার ঘটনা।' চোপরা চুপ করেছে।

বাইরে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছে। মাঠ ঘাট কর্দ্দমাক্ত। ব্যাঙ্ ডাকছে,ফেউ ডাকছে ঘন ঘন। কাছে পিঠে বাঘ এসেছে জল খেতে। দাঁতাল বন্য বরাহ বাংলোর আশেপাশে দৌড়ুচ্ছে। অল্প কিছু দূরে পাহাড়টার নীচে সারি দিয়ে হাতীর দল চলেছে। বাংলোর উঁচু বারান্দা থেকে স্পষ্ট দেখা যায়। দলীপ সিং বেদী রাশভারী লোক। কথা কম বলে, হাসে আরো কম। কোনো রকম নেশায় আসক্তি নেই। মাথায় পাগড়ী, মুখে চাপ দাড়ী, চোখে বাজপাখীর শাণিত দৃষ্টি। বলিষ্ঠ পুরুষ, পুরোপুরি মিলিটারী মেজাজ। কোনো কিছু বলবার আগে ভেবেচিন্তে নেয় ভালো করে। যার কাছে বলছে তাকে ভালো করে যাচাই করে নেয়। তার প্রত্যেকটি বাক্য তথ্যপূর্ণ, সংক্ষিপ্ত আর মিলিটারীর ছকে ফেলা। আইনকানুনের রশিতে বাঁধা।

দলীপ সিং বেদী সেদিন শিখ জাতির উত্থান, পতন, ভূত আর ভবিষ্যত সম্বন্ধে অনেক কথা বলেছিলো। গুরু নানক যখন ১৫৩৯ খ্রীষ্টাব্দে দেহত্যাগ করলেন তখন নাকি তাকে সমাধিস্থ করবার জন্যে মুসলমান সম্প্রদায়ও ব্যগ্র ছিলো।

দাহ করতে চেয়েছিলো হিন্দুরা। গুরু অর্জুন সুন্দর সুন্দর পাঞ্জাবী কবিতা লিখেছিলেন এবং তারই সময়ে শিখদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ গুরু-গ্রন্থসাহেব সমাপ্ত হয়েছিলো। গুরু তেগ বাহাদুর নানকের বাণী প্রচার করবার জন্যে সিলেট এবং চট্টগ্রাম পর্য্যন্ত গিয়েছিলেন। সেটা ছিলো ১৬২১ থেকে ১৬৭৫ সালের ভেতর কোনো এক সময়। আহম্‌দ শাহ আবদালী এবং নাদির শাহের সৈন্যদের সঙ্গে শিখ সৈন্য সংঘর্ষে লিপ্ত ছিলো। আফগান এবং পারস্যের সৈন্যদের ওপর তারা বার বার ঝাঁপিয়ে পড়েছিলো। আহমদ শাহ আবদালী এবং নাদির শা শিখ সৈন্যের বলবীর্য্য দেখে চমকে উঠেছিলো। মহারাজা রণজিৎ সিং হিন্দুস্তানের দু হাজার বছরের ইতিহাসে সর্বপ্রথম সবচেয়ে শক্তিশালী এবং দুর্দান্ত সৈন্যবাহিনী গড়ে তুলেছিলেন।

এরপর দলীপ সিং বেদী শুনিয়েছিলো কি করে শিখ সৈন্য বৃটিশদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন রণাঙ্গনে তুমুল সংগ্রাম করে ইংরেজদের দুর্দশার কারণ হয়েছিলো। ১৯৩০ সালের পর শিখরা স্বদেশী আন্দোলনের পুরোভাগে এসেছিলো। পৃথিবীর বিভিন্নস্থানে কানাডায়, ইউনাইটেড স্টেটস্‌ অব আমেরিকায়, দক্ষিণপূর্ব এশিয়াতে শিখদের ওপর কিভাবে গদর পার্টির প্রভাব পড়েছিলো। বেদী বলেছিলো, টেরোরিস্ট আন্দোলনে শিখদের সক্রিয় ভূমিকা সম্বন্ধে। কলকাতার কাছে বজবজ আর জালিওয়ানাবাগের হত্যাকাণ্ড। বেদী শুনিয়েছিলো শিখদের ভারতকে মহীয়সী আর গরীয়সী করবার প্রচেষ্টা।

দলীপ সিং বেদী শিখদের সম্বন্ধে অনেক গল্প, অনেক কাহিনী আমাকে শুনিয়েছিলো। অনেক ধকল গেছে জাতটার ওপর দিয়ে, অনেক হুমকি আর রোষের বিরুদ্ধে মোকাবিলা করতে হয়েছে ওদের। পার্টিসানের পরে অর্থনৈতিক কাঠামো ওরা গুঁড়ো গুঁড়ো হতে দেয়নি। ইজ্জতের বুনিয়াদ শুধুমাত্র আঁকড়ে ধরে থাকেনি।

মেহনত আর কেরামতি দিয়ে ভাগ্যের বিরুদ্ধে লড়েছে। পার্টিশানের:দুঃখ দুর্দশাকে কব্জীর আওতায় নিয়ে এসে বশীভূত এবং পদানত করেছে। যতো না ভেবেছে ধর্মঘট আর লক্ আউটের কথা। তার অনেক অনেক গুণ বেশী ভেবেছে ব্যাপক বেকারির কথা। ওরা মাঠে সোনা ফলিয়েছে। বাঁধ আর প্রকল্পে টেক্কা দিয়ে এগিয়ে গেছে। হাসিখুশী জোয়ান মরদ লোকগুলো, প্রাণশক্তিতে উচ্ছল। রঙ রসে ভরপুর। বেপরোয়া আর একগুঁয়ে। সরল সুস্থ মনের অধিকারী। স্বাস্থ্য সম্পদে ঝলমলে।

এরপর চোপরা সাহেব বলেছিলো সুবণসিরির আপাটানি, ডাফ্‌লা আর টাগিন্‌দের কথা। ১৮৯০ খ্রীস্টাব্দে এইচ, এম, ক্রোয়ে সাহেব নাকি সর্বপ্রথম আপাটানি প্লেটোর অনেকটা অভ্যন্তরে ঢুকেছিলো। দুর্দ্ধর্ষ ডাফলাদের ভয়ে আপাটানিরা পাহাড় ছেড়ে নীচে নামতে পারতো না। বেরুতে পারতো না তাদের আবাস ভূমি ছেড়ে। বাইরের জগতের খোঁজই রাখতো না। আপাটানিরা চাষবাসের কায়দা কানুন রপ্ত করেছিলো। কিন্তু পঁয়ত্রিশ হাজার ডাফ্‌লা ওদেরকে চারদিক থেকে আগলিয়ে রেখে রক্ষণাবেক্ষণ করতো আর তারই ফলে ওরা সভ্য জগত থেকে সম্পুর্ণ ভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিলো। আর ছিলো হাজার দশেকের মতো টাগিন্। সম্পুর্ণ অসভ্য। গোটা ট্রাইবটা ভুগতো দুরারোগ্য চর্মরোগে। টাগিন্‌দের দেশ ছিলো সাংঘাতিক দুর্গম আর প্রবেশ করা এক দুঃসাধ্য ব্যাপার। বাপ্, সিপি আর কাম্‌লা উপত্যকার মাঝে ভয়াবহ, অনুর্বর, নিস্তব্ধ, ভীষণ এবং ভয়ঙ্কর সব প্রান্তর। দুর্গম অঞ্চল। দুর্দ্ধর্ষ জাত। টাগিন্। আপাটানি। গালঙ্, হিল্‌মিরি। খোঁজ রাখতো নাকি কেউ।

স্বাধীনতা পাবার পরে ও কেউ বিশেষ খোঁজ খবর রাখতো না এসব দুর্গম অঞ্চলের। ভারত সরকারের চেষ্টায় ডাপোরাজিও আজ কর্মচঞ্চল। সেখানে প্রাণের সাড়া জেগেছে। জানবার আর বুঝবার

আগ্রহ জন্মেছে। এয়ার দ্বীপে প্লেন ওঠানামা করছে। হাসপাতাল আর স্কুল হচ্ছে। ধীরে ধীরে সভ্যতা এগুচ্ছে। টাগিন্‌রা কি আর সহজে সভ্যতার আওতায় আসতে চায়। পুরোনো রীতিনীতি, সংস্কার সমূহ জড়িয়ে রয়েছে। ভীতি আর শঙ্কা মেশানো দৃষ্টি নিয়ে লক্ষ্য করছে সভ্যতার প্রতিটি পদক্ষেপ।

চোপরা নেফার সুবণসিরির গল্প শোনাচ্ছিলোঃ সেটা ১৯৫৩-সাল হবে। বেস্‌ ক্যাম্প থেকে এগুচ্ছিলাম টাগিন্‌দের দেশের অভ্যন্তরে। কি দুর্গম দেশরে বাবা! পাহাড়, পর্বত আর জঙ্গলে ঢাকা। অনুর্বর। রুক্ষ মাটি। এবড়ো, খেবড়ো, অসমতল, লালচে মাটি। ফসলের চিহ্ন নেই আশেপাশে কোথাও। পাহাড়ের গা বেয়ে উঠতে ভীষণ কষ্ট হচ্ছিলো। খাদ আর ফাটলের ছড়াছড়ি। পাহাড়ের সারা দেহে ফাটল আর চিড় ধরেছে। প্রায়শ ভূমিকম্পের ফলে পাহাড়গুলোর দেহ ক্ষতবিক্ষত। বিকৃত আর কিম্ভূতাকার। বিরাট শিলা আর পাথর খণ্ড ছড়িয়ে ছিটিয়ে পথ আগলিয়ে রেখেছে বিশ্রীভাবে। টপ্‌কাতে টপ্‌কাতে প্রাণান্ত। তবে এগুচ্ছিলাম খুব সাবধানে।

অজানা দেশ। অচেনা ভূখণ্ড। এ্যাক্সপিডিসান্‌ আর এ্যাক্সপ্লোরেসন্‌। জমি জরীপ করতে হবে। সীমানা চিহ্নিত করতে হবে। ট্রাইবের লোকগুলো যারা এতোদিন লুকিয়ে চুরিয়ে বেড়াতো তাদের সভ্যতার আওতায় আনতে হবে। মেন্‌ ক্যাম্প ছিলো জিরো। তারপর ডাপোরাজিও। তারপর কয়েকটা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হয়ে আমরা ছড়িয়ে পড়েছি। একা একটা দলে জনা পনেরো আমর্ড বা সশস্ত্র লোক। জরীপ করবার লোক। রেকর্ড রাখবার লোক। রান্না আর ফুট-ফরমাস খাটবার লোক। সব মিলে আমাদের দলে জনা ত্রিশেক লোক হবে। কোনো দল গেছে টালিহার দিকে। কোনো দল লিমেকিঙ্‌-এর পথে। কেউ

কেউ নিয়াপিন্ অভিমুখে। তবে আমাদের গন্তব্য স্থলই সবচেয়ে বেশী দুর্গম এবং অভিযান অনেকটা দুঃসাধ্যও বটে।'

চোপরা গল্প বলে যাচ্ছে। গলায় ঢালছে আপঙ্। বিদেশী ছেড়ে দেশী বস্তু ধরেছে চোপরা। গল্প শুনছি আমি আর বেদী সাহেব। বাঘের ডাক খুব স্পষ্ট। বাংলোর খুব কাছাকাছি জলপান করতে এসেছে বোধ হয়। ঘন ঘন ফেউ ডাকছে। আবার সুরু করে চোপরা: 'নিস্তব্ধ প্রান্তরে নিজেদের পদ শব্দই শুধু শোনা যায়। আর কোনো শব্দের পাত্তা মেলে না। দাঁড়িয়ে রয়েছে মাথা সমান উঁচু ঘাস। মাইলের পর মাইল। অশান্ত দুরন্ত হাওয়ার মাতোমতি চলেছে অনবরত। মাঝে মাঝে সে হাওয়া ঝড়ের রূপ নেয়। রুক্ষ পাহাড়ের ওপর দিয়ে সে হাওয়া যখন বয়ে যায় তখন বিচিত্র শব্দ তরঙ্গের সৃষ্টি করে। জনমানবহীন প্রান্তরে মনের ভেতর কেমন একটা যেন অস্বস্তির সৃষ্টি করে। এরকম্ অনুর্বর, রুক্ষ, জনমানবহীন প্রান্তর টিরাপের কথা মনে করিয়ে দেয়। টিরাপের খোনসা, চ্যাংলা, লোন্‌কাও, সেন্নুয়া আর লঙ্‌ফঙ্ ছাড়িয়ে যে ভূখণ্ডের সঙ্গে পরিচয় ঘটেছিলো তার চেহারাও যেন অনেকটা এরকমই ছিলো। হাঁটছি আর হাঁটছি। শ্রান্তি আর ক্লান্তি দূর করবার জন্যে মাঝে মাঝে ক্যাম্প খাটাতে হয়। আবার ক্যাম্প তুলে সব কিছু গুটিয়ে রওনা দিতে হয়।'

প্রশ্ন করেছিলাম, 'লোকজনের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হয়নি?'

'তা হয়েছে, প্রথমদিকে হয়েছিলো। পাহাড়ের ঢালের ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছে ওদের বাঁশের ঘরগুলো। ওরা পাহাড়ের ওপর থেকে আমাদের দেখেছে। কাছে আসেনি। কিন্তু শেষের দিকে প্রান্তর, পাহাড় আর অরণ্য যেন জনমানবহীন বলে মনে হয়েছে।'

এরপর আমার প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে চোপরা বলেছিলো, 'ট্রাইবদের ভেতর অনেক জাত রয়েছে যারা অনেককাল থেকে ব্যবসা বাণিজ্য চালাচ্ছিলো। মন্‌পা, খাম্বা আর মেম্বা

তিব্বতের সঙ্গে ব্যবসা করতো। টিরাপের ট্যাঙ্গসা ব্যবসা করতো ব্রহ্ম দেশের সঙ্গে। শের ডুক্‌পেন আর আকারা পাহাড় থেকে নেমে আসামের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছিলো। লোহিতের মিস্‌মীরা সওদা নিয়ে অনেক দূরের পথে পাড়ি জমাতো। মৃগনাভি, বেতের জিনিষপত্তর, নানারকম জীবজন্তুর ছাল চামড়া, নানাবর্ণের পাথর এবং আরো অনেক কিছু দ্রব্য থাকতো তাদের সঙ্গে। মনপারা পাহাড়ের গায়ে চাষ আবাদ করতো। কার্পেট পর্য্যন্ত বানাতো। লোহিতের ট্রাইবস্‌ তাঁরাও আর কামানরা বুনতে সিদ্ধহস্ত। উল আর সূতো মিলিয়ে মিশিয়ে চমৎকার রঙচঙে কোট বানায়। মেয়েরা সুন্দর স্কার্ট পড়ে ঘুরে বেড়ায়। সব নিজেদের হাতের তৈরী। টিরাপের ওয়াংচুরা হাতীর দাঁত, মহিষের শিং, শামুকের খোল, নেকড়ে বাঘের হাড়ে চমৎকার গয়না বানায়। পাথরের মালা আরো চমৎকার। উত্তর সিয়াং এর খাম্বা আর মেম্বা চমৎকার মুখোশ বানাতে পারে। সব কাঠের তৈরী। লোহিতের খামটিরা কাঠের ওপর চমৎকার কাজ করে। আকাদের বাঁশের তৈরী চুড়ি আর কানের গয়না চমৎকার। কিন্তু টাগিন্‌দের এ অঞ্চলটা যেন সভ্যতার সংস্পর্শ সযত্নে এড়িয়েছে। আমরা ধীর পদক্ষেপে এগুতে থাকি।

জরীপ ছাড়াও অনেক কাজ। জায়গা সম্বন্ধে নানারকম নোট নেওয়া। পররর্ত্তী দলের কাজকর্মের সুবিধের জন্যে চিহ্ন এঁকে রাখা। সন্ধান আর হদিশ পাবার জন্যে জমী, পাহাড়, মাঠঘাট, অরণ্য চিহ্নিত করা। সীমানা নির্দিষ্ট করা।' চোপরা চুপ করে। কি যেন ভাবছে সে। খানিকটা যেন অন্যমনস্ক।

'আর কিছু নেই?' প্রশ্ন করি। শেষ অঙ্কে পৌছেছি। এখন সুরু হবে আসল গল্প। গল্প শুনেবার জন্যে নড়ে চড়ে বসি। কফি এসে গেছে। বিস্কুট আর কেক সঙ্গে। চোপরা সুরু করে, 'আজ কদিনে টাগিন্‌দের দেশের অভ্যন্তরে অনেকটা এগিয়েছি। মাথা সমান

উঁচু ঘাসে প্রান্তর ছেয়ে রয়েছে। যে অঞ্চলটায় তাঁবু ফেলা হয়েছে সেখানকার আশেপাশে প্রকৃতি যেন অতো নির্মম আর নিষ্ঠুর নয়। এধার ওধারে জলা জায়গার সন্ধান মিলেছে। ধূসর, অনুর্বর পাহাড়ের বুকে জেগেছে শ্যামলিমার আভাষ। অরণ্যের সঙ্কেত মিলেছে। ক্যাম্প থেকে বেশ খানিকটা দূরে একলা ঘুরে ফিরে বেড়াচ্ছিলাম। জলের খোঁজ যখন পাওয়া গেছে তখন কাছাকাছি লোকালয় নিশ্চয়ই রয়েছে। আমি হাঁটতে হাঁটতে জঙ্গলের ভেতর অনেকটা পথ চলে এসেছি, সঙ্গে রিভলভার রয়েছে। মনে ভয়ডর ছিলো না। বড়োবড়ো ঘাসে ঘেরা একটা জলা জায়গার ধারে এসে দাঁড়িয়ে ছিলাম। হঠাৎ একটা করুণ আর্ত্তনাদে বনভূমি, জলাভূমি সচকিত হয়ে ওঠে। আর্তনাদ কোন নারী কণ্ঠের।' চোপরা থামে।

আমাদের বাংলোর পাশে বুনো হাতী মড় মড় করে ডালপালা ভাঙ্গছে। চোপরা সুরু করে, 'আর্তনাদ যেদিক থেকে এসেছিলো বলে মনে হয়েছিলো সেদিক লক্ষ্য করে ছুট্ লাগাই। মাথা সমান উঁচু ঘাসের জঙ্গল সরিয়ে পথ করে ছুটতে হয়। আর্তনাদের উৎপত্তিস্থলে পৌঁছে সমস্ত কিছু দেখে তাজ্জব বনে যাই। একটা পাহাড়ী মেয়েকে প্রকাণ্ড একটা অজগরে জড়িয়েছে। তখন পর্যন্ত সম্পূর্ণভাবে জড়িয়ে পাক দিতে সুরু করেনি। তাহলে হাড়গোড় আস্ত থাকতো না। মেয়েটির পা থেকে খানিকটা অংশে পাক দিয়ে অজগরটা ওর হাতটা গিলতে সুরু করেছিলো। সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটা আর্তনাদ সুরু করেছে। আমি এক মুহূর্ত সময় নষ্ট করিনি। অজগরের দেহের যে অংশটা মাটিতে পড়েছিলো সে অংশে ভোজালি চালাতেই অজগরটা যন্ত্রণায় ছটফটিয়ে উঠেছিলো। মেয়েটার দেহ থেকে নিজেকে মুক্ত করে কঠিন জমির ওপর নিজের দেহটাকে বার বার আছড়াচ্ছিলো। মেয়েটার হাতটা মুখ গহ্বর থেকে বের করে দিয়ে মাথাটা সোজা করতেই মাথা লক্ষ্য করে আমি গুলী চালিয়েছিলাম। পর পর তিনটে গুলী, অজগরের

মাথাটা থেৎলে গিয়েছিলো। লেজটা জমিতে কয়েকবার আছড়িয়ে অজগরটা নিস্তব্ধ হয়ে যায়। মেয়েটা অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলো। সময় নষ্ট না করে ওর মুখে চোখে জল ছিটিয়েছি। হাওয়া করেছি। তারপর ও চোখ মেলতেই ওকে কোলে তুলে হেঁটে ক্যাম্পে চলে এসে ফার্স্ট'এড্‌এর বন্দোবস্ত করেছি। মেয়েটা কেমন যেন বিহ্বল আর হতবাক হয়ে গিয়েছিলো। সারাটা পথ নিঝুম অবস্থায় পড়েছিলো। আপাটানি ট্রাইবের মেয়ে হবে হয়তো। গায়ের রঙ ফরসা। গাল দুটোতে লালচে আভা। শরীরের নিম্নাংশে মিথোনের চামড়ার স্কার্ট। বুকে ঘাস আর লতাপাতার ব্রেসিয়ার। দুকানে ইয়া বড়ো বড়ো মাকড়ি। নাকের দু ফুটোতে পাখীর হাড়ের গয়না।'

'চোপরা সাহেব মেয়েটির প্রেমে পড়ে গিয়েছিলো বলে মনে হচ্ছে।' আমি ঠাট্টা করি।

'প্রেম নয়। তবে হ্যাঁ, আকৃষ্ট করবার মতো শরীরের গড়ন। নাক চোখ মুখ প্রশংসা পাবার যোগ্য। চোখদুটো কথা কইতে জানে। ক্যাম্পে নিয়ে আসার সময় ওকে কোলে তুলেছিলাম। শরীরে কেমন যেন একটা বোঁটকা গন্ধ। কতেদিন স্নান করেনি কে জানে। ক্যাম্পে পৌঁছে মেয়েটার কি ছটফটানি। মাঝে মাঝে কি যেন সব বলে, কেউ বুঝতে পারে না। মেয়েটা পালাবার জন্যে ব্যস্ত। পোর্টারদের খবর পাঠানো হলো। ওরা বেশ খানিকটা দূরে বসে আফিং খাচ্ছে, গাঁজা টানছে, মাথার উকুন মারছে। ব্যাটেল্‌ গ্রীন্‌ ড্রেসে সভ্যজগতের অতোগুলো মানুষ মেয়েটা একসঙ্গে নিশ্চয়ই কখনো দেখেনি। পালাবার পথ খুঁজছিলো সে। একটা সুযোগ মিলতেই মেয়েটা ছুট লাগায়। বন্য হরিণীর মতো লাফাতে লাফাতে চলে যায়। যাবার আগে ঘুরে দাঁড়িয়ে গ্রীবা হেলিয়ে একবার আমাকে দেখে নেয়। হরিণীনয়না, আমিও তাকিয়ে তাকিয়ে দেখি। সহরের মেয়েদের সঙ্গে এর

কতো প্রভেদ। এরা অরণ্যে মানুষ হয়েছে, তবু দৃষ্টিতে কি অপূর্ব মাদকতা, যৌবনের ঢল নেমেছে সারা অঙ্গে। ঘাসের অরণ্যের ভেতর মেয়েটা একসময় অদৃশ্য হয়ে যায়। পোর্টাররা ওকে এক ঝলক দেখেছিলো। বললে, কাছাকাছি আপাটানিদের একটা গ্রাম রয়েছে। মেয়েটি ও গ্রামেরই হবে।' বাইরে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছে। অন্ধকার নেমে এসেছে। চোপরার কেমন যেন উদাস দৃষ্টি।

আবার চোপরা সুরু করে, 'সারাদিন ক্যাম্পে বসে এটা ওটা নাড়াচাড়া করেছি। জিন, হুইস্কি টেনেছি। নাটক নভেল পড়েছি। সন্ধ্যের দিকে হঠাৎ একটা খস্‌খস্‌ শব্দ শুনে তাকিয়ে দেখি ক্যাম্পের ক্যানভাস্‌ তুলে মেয়েটা ঠিক জন্তুর মতো হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে আসছে। আমি চমকে উঠি। ও এবার দুপায়ের ওপর ভর করে দাঁড়ায়। ওর চোখে মুখে একটা দুষ্টুমির হাসি। বুঝলাম বাইরে পাহারারত সেপাই দুটোর চোখে ধুলো দিয়ে তাঁবুতে ঢুকেছে। আমি ছিলাম সেই কোম্পানীর সেকেণ্ড ইন্‌ কমাণ্ড। ওর হাতের মুঠোয় কি যেন ধরা রয়েছে। ওটা কি? মুখ থেকে বেরিয়ে যায়। ও আমার ভাষা বুঝবে না সে খেয়াল আমার ছিলো না। আমার কোলের ওপর একটা জিনিষ প্রায় ছুঁড়ে দিয়ে ও চোখের পলকে তাঁবুর পরদা তুলে অন্ধকারের ভেতর অদৃশ্য হয়ে যায়।

মেয়েটা আমাকে মৃগনাভি উপহার দিয়েছিলো। কৃতজ্ঞতার নিদর্শন। সেদিন যে ওকে আমি বাঁচিয়ে ছিলাম। এর কয়েকদিন পরে একটা জলার ধারে ওর সঙ্গে দেখা হলো। লজ্জার ভাবটা অনেকখানি কেটেছে। হয়েছে অনেকটা সহজ, সরল। চোখের দৃষ্টি অনেকখানি কোমল হয়ে এসেছে। বসলো আমার গা ঘেঁষে। পরণে সেই প্রথম দিনের মতোই সাজসজ্জা। কথাবার্তা ছাই কি বলবো। ওর কথার একবর্ণ আমি বুঝিনে। ও একবর্ণ আমার কথা বোঝে না। আমার হাতটা টেনে নিয়ে রিস্টওয়াচটা খুব

মনযোগ দিয়ে দেখে। আমি রিস্টওয়াচটা ওর কানের কাছে ধরতেই ও ভীষণ খুসি। ঘড়ির টিক্ টিক্ শব্দ শুনছে আর শুনছে। দুচোখ থেকে কৌতূহল উপচে পড়ছে। চমৎকার দাঁতগুলো ছিলো ওর। চাউনিতে ছিলো মাদকতা। গালের টোলটা অপূর্ব। আমার হাতের আঙ্গুলের আংটিটা নিয়ে খানিকক্ষণ নাড়াচাড়া করলে। হীরের দ্যুতি মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করলে। হাত বোলালে আংটিটার ওপর খানিকক্ষণ। সঙ্গে সঙ্গে আমার হাতের আঙ্গুলের ওপর। আমার সার্টের ঝকঝকে বোতামগুলো নেড়েচেড়ে দেখলে। ওর লোভ হয়েছিলো, না আমার লোভ হয়েছিলো? ওর বোধকরি লোভ হয়েছিলো ঝকঝকে বোতাম আর আর ঘড়ির ওপর। আর আমার! ওর সান্নিধ্য খারাপ লাগছিলো না। হয়তো খানিকটা এগিয়েও ছিলাম। পাঁকাল মাছের মতো হাত গলিয়ে ও পালালো। ধরতে চেষ্টা করেছিলাম। অসম্ভব। জঙ্গলের পথে হরিণীর পেছনে ধাওয়া করে লাভটা কি। নাগাল পাওয়া অসম্ভব। ও পালালো। আমাদের ক্যাম্প গোটাবার সময় হলো। আর একদিন মাত্র সময়। তারপর সমস্ত গুটিয়ে আমরা রওনা দেবো। ফিরে যাবো সভ্যজগতের এলাকায়। নির্জন পরিবেশে মনটা হাঁফিয়ে উঠেছিলো।

ক্যাম্প থেকে অনেকটা দূরে একলা পায়চারি করছিলাম। দুপুরবেলা খাওয়া-দাওয়া হয়নি, ভাবছি ক্যাম্পে ফিরবো। হঠাৎ মেয়েটা এসে উপস্থিত। ও আঙুলের ইসারায় আমাকে ওর পেছু পেছু যেতে বললে। আমার মনটা সেদিন ভালো ছিলো না। আমি যেতে রাজী হইনি। ও তবুও ইঙ্গিত করে। সঙ্গে সেই মিঠে হাসি। চকচকে দাঁতগুলো, টোল খাওয়া গাল। দেহের ফরসা রঙ। দৃষ্টিতে সেই মাদকতা, দেহ সৌষ্ঠব অপূর্ব। ও ডাকছে আমাকে। কিন্তু আমার জেদ, আমি যাবো না। আমি যতোই মাথা নেড়ে আপত্তি জানাচ্ছি ও ততোই ওকে অনুসরণ করতে বলছে। ইসারা

ইঙ্গিতে বোঝাচ্ছে সবকিছু। চোখ দুটোতে কাতর অনুনয় বিনয়ের ভাব ফুটে উঠেছে। শেষ পর্য্যন্ত এসে আমার হাত ধরে টানাটানি সুরু করলে। ও আমাকে কোনোখানে নিয়ে যেতে চায়। আমি যাবো না। ক্যাম্পে ফিরে যেতে চাই আমি।'

চোপরা থেমে যায়। জানালা দিয়ে বাইরে তাকায়। শেয়ালের দল ঐকতান সুরু করেছে। প্রান্তরে ঝিঁঝিঁ ডাকছে। জোনাকি পোকার দল জ্বলছে আর নিভছে। চোপরা কেমন যেন অন্যমনস্ক। একটা হুইস্কী বোতলের ছিপি খুলে খানিকটা তরল পানীয় গ্লাসে ঢেলে ওর মুখের কাছে ধরলাম। চোপরা হাত থেকে গ্লাসটা টেনে নিয়ে এক চুমুকে সবটা শেষ করে বলতে সুরু করলে: 'সেদিনও মদটা একটু বেশী টেনেছিলাম। তবে হুঁশ হারাইনি। চোখে নেশা ছিলো। মনে আমেজ ছিলো। কিন্তু সংযমের বাঁধ ভাঙ্গিনি। নির্জন প্রান্তরে, জনমানবহীন অরণ্যে একটা তরুণীর আহ্বান উপেক্ষা করেছিলাম বারে বারে।

ওর অঙ্গে যৌবনের ঢল নেমেছে। তাকিয়ে দেখছিলাম ওর পোষাক পরিচ্ছদ। ওর বুক কোমরে ঘাসের তৈরী আবরণ। আর কোথাও কিছু নেই। নগ্নতাকে ঢেকেছে ঘাসের ঢাকনা দিয়ে। সম্পূর্ণ ঢাকা পড়েনি। চুলে গুঁজেছে জংলী ফুল। চোখে ইসারা আর ইঙ্গিত। মেয়েটা হঠাৎ অদ্ভুত এক কাজ করলে। একটান দিয়ে বুকের আবরণ টেনে সরিয়ে ফেললে। বেরিয়ে পড়লো প্রস্ফুটিত গোলাপ। কুঁড়ি থেকে মুক্তি পাওয়া সদ্য প্রস্ফুটিত গোলাপ। হেলছে, দুলছে। আমার ধমনীতে রক্তস্রোত বয়ে চললো তীব্রবেগে। ছুটলো আগুন ছড়াতে ছড়াতে। বাধা নিষেধের আগল ভেঙ্গে কামনা বাসনাগুলো প্রচণ্ডবেগে ঘুরপাক খেতে সুরু করলো। নেশা হয়েছিলো। উদ্দাম আর অস্থির মনটাকে বেধে রাখা রশিটা ছিঁড়ে শতটুকরো হয়ে গেলো। ছুটলাম মেয়েটার পেছনে। মেয়েটা যেন এরকমই কিছু একটা চাইছিলো। সে যেন প্রস্তুত হয়েই

ছিলো। কাঠবিড়ালীর মতো ক্ষিপ্রগতিতে সে ছুটলো। এধার থেকে ওধারে ছুটলো। ওর সারা শরীরে রয়েছে মাত্র ঘাসের স্কার্টটা। বড্ডো ক্ষণভঙ্গুর। কতোটা পথ পার হয়েছিলাম খেয়াল ছিলো না।

ও একবার এ গাছের পেছনে, পরক্ষণেই অন্য গাছের আড়ালে। গাছের পেছনে পৌঁছে দেখি ও ঘাসের বনে হামাগুড়ি দিয়ে অদৃশ্য হবার চেষ্টায় ব্যস্ত। কিন্তু সব বলেকয়েও শেষ পর্য্যন্ত থেকে যায় যে ও মেয়ে। আর আমি শক্ত, সামর্থ্য, বলবান পুরুষ। পরাজয় ওকে এক সময় মানতেই হলো। চুমোয় চুমোয় ওর মুখখানা ভরিয়ে দিয়েছিলাম। বাহুতে পিষ্ট হয়ে ও হয়েছিলো ক্লান্ত। ও হাঁফাচ্ছিলো, ওর উঁচু বুকটা ঘনঘন ওঠানামা করছিলো। কিন্তু লক্ষ্য করলাম ওর সারা মুখে একটা প্রশান্তির ভাব। সফলতার স্নিগ্ধ প্রলেপ।

ঠিক ওই সময়। হ্যাঁ, ওই সময়। ওই মুহূর্তে শুনলাম টাগিন্‌দের বিজয়োল্লাস। টাগিন্‌দের চীৎকারে, রণহুঙ্কারে জঙ্গল কেঁপে উঠলো। আর সেইসঙ্গে জেগে উঠলো মৃত্যপথযাত্রী কতোগুলো লোকের আর্তরব। বেশ বুঝতে পারলাম আমাদের ক্যাম্প্‌ আক্রান্ত হয়েছে। হামলা আর হুজ্জতির মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে কতোকগুলো অসহায় লোক। হঠাৎ আক্রান্ত হয়েছে আর তাই বোধ করি এ মরণ চীৎকার। মেয়েটাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। মেয়েটা বিদ্যুৎগতিতে উঠে আমাকে দুহাত দিয়ে জড়িয়ে ধরলো। বেশ বুঝতে পারলাম মেয়েটা আমাকে যেতে দিতে চায় না। তাই বাধা দিচ্ছে। আমি এ বাধা মানতে রাজী নই। ওকে ধাক্কা দিয়ে দৌড়লাম। এক ফাঁকে রিভলবারটা পকেট থেকে বের করে নিয়েছিলাম।

ক্যাম্পের কাছাকাছি এসে আমি নীচু হয়ে ঘাসের অরণ্যে ঢুকে হামাগুড়ি দিয়ে এগুতে থাকি। টাগিন্‌দের জয়োল্লাসের

সঙ্গে সঙ্গে এটা বুঝেছিলাম যে টাগিন্‌দের জয় হয়েছে, আর আমাদের ঘটেছে পরাজয়। আমি ঘাসের ভেতর হামাগুড়ি দিয়ে এগুচ্ছিলাম। এগিয়ে প্রায় ক্যাম্পের কাছাকাছি এসেছিলাম। না, ক্যাম্পের কেউ জীবিত ছিলো না। ততোক্ষণে যুদ্ধ শেষ। আক্রমণকারীরা পালিয়েছে। সঙ্গে নিয়ে গেছে পতিত মুণ্ডগুলো।'

আমি বলি, 'তুমি বলতে চাও মেয়েটার জন্যেই তুমি বাঁচলে।'

'তা নয়তো কি। মেয়েটা যেমন করেই হোক আগেভাগে সবকিছু জানতে পেরেছিলো। তাই আমাকে প্রলুব্ধ করে জঙ্গলের পথে টেনে নিয়ে গিয়েছিলো, নিয়ে গিয়েছিলো আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে।'

'টাগিন্‌দের উপস্থিতি তোমাদের ক্যাম্পের লোকেরা টের পায়নি?' জিজ্ঞেস করি মেজর চোপরাকে।

'না। টাগিন্‌দের ওই দলটা বিরাট বিরাট ঘাসের ভেতর আত্মগোপন করে বসেছিলো। ধারাল দা নিয়ে সুযোগের অপেক্ষায় ছিলো। দুপুর বেলা যখন ক্যাম্পের সবাই নানা কাজকর্মে ব্যস্ত। কেউ রান্না করছে, কেউ তাসপাশা খেলছে, কেউ কিতাব পড়ছে, ঠিক তখুনি ওদের ভেতর থেকে দুজন বেরিয়ে এসে পাহারারত সান্ত্রীর কাছে কম্পানীর কমাণ্ডারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার অনুমতি প্রার্থনা করলে। অনুমতি না দেবার কোনো কারণ ছিলো না। ক্যাম্পের ভেতর দাঁড়িয়ে কম্পানীর কমাণ্ডারের সঙ্গে আলোচনা করতে করতে, ইন্‌টারপ্রেটার অবশ্যি একজন ছিলো, ওরা এক অদ্ভুত কাজ করলে। মুখে আঙুল পুরে শিস্‌ দিলে। কর্কশ এবং তীব্র ধ্বনি। অনেকটা সাইরেনের মতো শব্দ। সঙ্গে সঙ্গে মানুষ সমান উঁচু ঘাসের জঙ্গল থেকে দুশো টাগিন্‌ শাণিত দা নিয়ে ক্যাম্পের ওপর অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়লো।

তাঁবুর লোকগুলো বাধা দেবার সুযোগ পর্য্যন্ত পেলে না। আমি ছাড়া গোটা কম্পানীর লোকগুলো নিশ্চিহ্ন হলো। মেয়েটা আমাকে বাঁচালো। আর ওরই দয়ায় সভ্য জগতের সীমানা পর্য্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিলাম। ওকে ছেড়ে আসার সময় আমি কান্নায় ভেঙ্গে পড়েছিলাম। মেয়েটা আমার হাতে হাত বোলাচ্ছিলো। আমারা দুজগতের মানুষ। কেউ কারু ভাষা বুঝিনে। শুধু অন্তরে অন্তরে আর দৃষ্টি বিনিময়ের মাধ্যমে ভাবের আদান প্রদান হয়েছিলো।' চোপরা চুপ করে। সে কি যেন ভাবতে থাকে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

সার্কেল অফিসার মুখার্জীর সঙ্গে সারাটা সিয়াং ঘুরে বেড়িয়েছি। গেছি পাশিঘাট থেকে উত্তরে আলং এর পথে। সেখান থেকে মেচুকা, ডামরো, কারকো, টুটিং আর গেলিং ছাড়িয়ে আরো বহুদূরে চলে গিয়েছি। গেছি মেগা, বোয়িং, বোগা, গামেঙ্, পাশেঙ্, গাটে পাঙ্বাঙ্ আর ইয়াকিং। উত্তর সিয়াং এর বিভিন্ন জাতের সঙ্গে মিশেছি। উত্তরে গালং ট্রাইবদের ভেতর ছড়িয়েছে কতো শাখা প্রশাখা। টাগিং, ডলুং, বরি, পাবিং, মিনঙ্ আর পাঙ্গু। আমাদের সমস্ত যাত্রার সহচর হয়েছে টাপিক্ টাপুং। মুখার্জীর আরদালী। স্বল্প আচ্ছাদনে আচ্ছাদিত। ছোট ছোট চোখ। চিবুকে দুচার গাছা দাড়ি। হাওয়ায় ফুর ফুর করে উড়ছে। পুরোপুরি মঙ্গোলিয়ান ফিচার্স। ডামরোর বাংলোতে বসে টাপিকের সঙ্গে কথাবার্তা হচ্ছিলো। মুখার্জী ট্যুরে পাশিঘাট গিয়েছিলো। টাপিকের কাছে বসে রামায়ণ মহাভারতের গল্প বলছিলাম। ওসব ও শোনেনি কোনো-দিন। ওসব সম্বন্ধে ওর এতোটুকুন ধারণাও ছিলোনা। কুম্ভকর্ণের ইতিহাস শুনে ও বেজায় খুশী। টাপিক্ হেসে গড়িয়ে পড়ে। সে বলে, 'জানো মিগম্। আমার বউটা জাতিতে টাগিন্। আর আমি বরি। জানো, আমার বউটা খালি পড়ে পড়ে ঘুমোতো। ব্বাপ্, কি নাকই না ডাকতো। ঠিক তোমাদের ওই কুম্ভকর্ণের মতো। ঘুম ভাঙলেই ক্ষিদের জ্বালায় বউটা চেঁচামেচি সুরু করে দিতো। আমার কাজ ছিলো শুয়োরের ঠ্যাং ওর সামনে রেখে দেওয়া। যাতে ঘুম থেকে জেগে উঠেই ও চিবুতে পারে। তাছাড়া ভালুকের কলিজা ভাজা। গিরগিটির মাংস খেতে ও খুব ভালবাসতো। ওসব না পেলে কান্না জুড়ে দিতো। বউটার

কুম্ভকর্ণের মতো কারু সঙ্গে বিয়ে হলেই বোধকরি ভালো হতো। বেশ মজার ব্যাপার হতো। দুজনে পড়ে পড়ে ঘুমোতো।' পোকা খাওয়া দাঁত বের করে বলে টাপিক্ টাপুং।

ওকে বলেছিলাম কি করে স্বর্ণলঙ্কা পুড়ে ছাই হয়েছিলো। টাপুক্ মাথাটা চুলকায়। দাদে আঁচড় কাটে। ও প্রশ্ন করে, 'এটা কেমন ধারা কাজ হলো বলো দেখি? গোটা লঙ্কাটা পুড়িয়ে কি লাভটা হলো? কাজটা মোটেও সুবিধের হয় নি। সীতাকে না হয় রাবণ কেড়েই নিয়েছিলো। তাতে রামচন্দ্রের কোন্দল করতে যাওয়া কেন? এতো যুদ্ধটুদ্ধর কি দরকারটা ছিলো শুনি? রামচন্দ্রের কি আর অন্য মেয়ে মানুষ জুটতো না। ঢের ঢের জুটতো। একটা মেয়েমানুষের জন্যে অতো হৈচৈ। অতো সোরগোল। ঝগড়াঝাটি না করাই উচিত ছিলো।' অকাট্য যুক্তি। আমি ওর যুক্তির নমুনা আর বহর দেখে থ বনে যাই। 'আমার দ্বিতীয় বউটাকে আমি ফুস্‌লিয়ে, একরকম জোর জবরদস্তি করেই নিয়ে এসেছিলাম। বউটা অন্যের ঘরে ছিলো। কই এমনটি তো ঘটেনি।'

মনে মনে ভাবি কি বোঝাবো ওকে। তবু ওকে বলি, 'জানো টাপুক্। নেফার বাইরে একটা বিরাট দেশ রয়েছে। তার নাম ভারতবর্ষ। আমার দেশ। তোমারও দেশ। আমরা একদেশেরই মানুষ। ভারতের অধিবাসীদের সঙ্গে তোমাদের এখানকার সবাইকার রক্তের টান রয়েছে। তোমাদের ভারতকে ভালো করে চিনতে হবে। জানতে হবে।' আমি ওকে বোঝাতে চেষ্টা করি। ও কি বোঝে কে জানে। একমনে শুনতো। প্রশ্ন করতো, 'তোমাদের দেশটা এই টুটিং, গেলিং, কারকো আর গেলিং অঞ্চল থেকে বড়ো?'

'অনেক অনেক বড়ো। তোমাকে আমাদের দেশে নিয়ে যাবো।'

ও আমার সঙ্গে যাবে বলে কথা দেয়। টাপিক্‌কে পঞ্চতন্ত্র থেকে অনেক কাহিনী শুনিয়েছিলাম। ওকে শুনিয়েছিলাম

মহর্ষি অগস্ত্যের কীর্তি কাহিনী, বাতাপি বধের কাহিনী। সুর্পণখার কাহিনী।

শুনে ও খুব খুশী। আমাকে বলেছিলো : 'জানো মিগম। ডামরোর জঙ্গলে একটা মেয়ে আমার পেছনে ঘুরতো। যতো ওকে তাড়িয়ে দিই ততোই এসে আমার আশে পাশে ঘুর ঘুর করতো। এখন ভাবি সুর্পণখার মতো সেদিন ওর নাকটা কেটে দিলে বোধ করি ভালো হতো।'

ওকে বলেছিলাম মহাভারতের অর্জুনদের পাঁচ ভাইএর এক স্ত্রী গ্রহণের কথা। ও আমাকে গালংদের রীতিনীতির কথা কিছুটা শুনিয়েছিলো। ওদেরও ওই একই নিয়ম। পাঁচ ভাই এর এক স্ত্রী হতে পারে। অথবা ভাই এর স্ত্রীর ওপর ওদের যৌন অধিকার থাকে। হনুমানের শৌর্যবীর্যের কাহিনী ওকে ভীষণভাবে আকৃষ্ট করেছিলো। এ ছাড়া ওকে শুনিয়েছিলাম বিভীষণকাহিনী। ভরতের আত্মত্যাগ। অর্জুনের লক্ষ্যভেদের কাহিনী। অশোক, আকবর, রাণাপ্রতাপ আর শিবাজীর গল্প ও মন দিয়ে শুনেছিলো।

'ছাখো মিগম্, আমাদের পিংবু গ্রামে রাণাপ্রতাপের মতো দুর্দ্ধর্ষ একটা লোক বাস করতো। সারাটা তল্লাট ওর ভয়ে কাঁপতো, ভীষণ সাহসী আর যোদ্ধা ছিলো সে। একবার রটুং আর পিবুং গ্রামে যুদ্ধ হলো। ঐ লোকটা একাই তিনজনকে ঘায়েল করে মুণ্ডুগুলো কচাং কচাং করে কেটে নিলে।'

এরপর টাপিক্ আরো অনেক কিছু বলে। বলে, 'আমাকে নিয়ে যাবে তোমাদের ওখানে?'

'নিশ্চয় নিয়ে যাবো।' আমি জবাব দিই।

'শক, হুণ, পাঠান, মোগল। কতো জাতকে আমরা থাকতে দিলাম। তোমাকে দেবো না।' ও কি বুঝলে ভগবান জানেন। ওকে চৈতন্ত, আচার্য্য শঙ্কর, সন্ত তুলসীদাস, সন্ত কবীর, মীরা, ত্যাগরাজ, তুকারাম, গুরুনানক, শঙ্করদেব, মাধবদেব, রামকৃষ্ণ,

বিবেকানন্দের কথা এবং আরো অনেক সন্তদের কথা শুনিয়েছিলাম। ও হা হয়ে শুনেছিলো। হয়তো কিছুই বোঝেনি। ভারত এবং ভারতের সংস্কৃতি, তার ইতিহাস সম্বন্ধে অনেকের মতো ওর ধারণা নেহাতই মামুলী। কাছের ভাটিখানায় হাতীটা এসে বড্ডো উপদ্রব সুরু করেছে। আপঙের জন্যে গুণ্ডামি সুরু করেছে। কে কবে হাতীটাকে আপঙের অভ্যেস করিয়েছিলো। এখন হাতীটা সোজা জঙ্গল থেকে চলে এসে আপঙের জন্যে হা পিত্যেস্ করে। না দিলে উপদ্রব সুরু করে। নেশা এমনি একটি চিজ। মানুষ জন্তুতে কোনো প্রভেদ নেই। হঠাৎ বাংলোর পাশের জঙ্গল থেকে একটা ঘড় ঘড় শব্দ জেগে ওঠে। মনে হয় একটা জানোয়ারের চাপা ক্রুদ্ধ গর্জন।

আমি ফিস্ ফিস্ করে বলি : 'বাঘ'।

'বেইমানটা আবার এসেছে। নিমকহারামটার লজ্জা সরমের বালাই নেই।' দাঁতে দাঁত ঘষে আমাদের টাপিক্ টাপুং।

'কে বেইমান?' প্রশ্ন করি।

'কেন? জঙ্গলে যে কোঁকাচ্ছে।' টাপিকের চেহারাটা কেমন যেন নির্মম আর ক্রূর হয়ে উঠেছে।

'বাঘটা সম্বন্ধে তুমি কিছু জানো নাকি?'

'জানিনে আবার। লজ্জা সরমের মাথা খেয়ে বিশ মাইল পথ ভেঙ্গে এসেছে ভালোবাসা আর মরম কুড়োতে। শয়তান, নেমকহারাম, বেইমান। তাড়িয়ে দিয়েছি, তবু ঘুরে ফিরে আমার এখানে।'

'এ সব তুমি কি বলছো টাপিক। কাকে উদ্দেশ্য করে এমন গালাগাল দিচ্ছো?'

'কেন বাঘটার সম্বন্ধে বলছি। যার মায়া দয়া নেই। নেমকহারামি করলে যে। এই এতোটুকুন অবস্থা থেকে যাকে ডাগর করে তুললাম তার কথাই বলছি। এই এতোটুকুন অবস্থায় ওকে কোলে তুলে

নিয়ে এসেছিলাম। বাপ-মা মারা পড়েছিলো সাহেবের বন্দুকের গুলীতে। জঙ্গলের ভেতর বাঘের বাচ্চারা মার স্তনে মুখ ঠেকিয়ে জিভ দিয়ে চেটেছে। দুধের কৌটা পড়েছে জমির ওপর। পড়ে শুকিয়ে চুণের মতো হয়ে রয়েছে। সারা জঙ্গল ঢুঁড়ে সেই চুণ যোগাড় করে এনেছি। খাবলা খাবলা মাটি তুলে নিয়েছি। বাঘের দুধ গো। বাচ্চাটাকে খাওয়াতে হবে যে। মাটি শুদ্ধ চুণের মতো দেখতে গুঁড়ো জলের সঙ্গে গুলে ওকে খাইয়েছি আর একটু ডাগর হয়ে উঠলে নরম মাংস এনে ওর মুখের কাছে ধরেছি। কাঠবিড়ালীর মাংস খেতে ও এমন ভালোবাসতো।'—টাপিকের কেমন যেন উদাস দৃষ্টি।

'জানো মিগম্ ও বেইমানি করলে। ভালবাসার দাম কড়ায় গণ্ডায় চুকিয়ে দিলে।'

'কি করলে?'

'তখন ও বেশ বড়ো হয়ে উঠেছে। এক সন্ধ্যায় আমার বউটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লে। নখ আর দাঁত দিয়ে টুটি ফুটো করে দিলে। পেট চিরে পাকস্থলী বের করে আনলে। আমার বউটাকে ও মারলে, মানুষের রক্তের স্বাদ কি রকম তা প্রথমবার চেখে দেখলে। হলো মানুষখেকো। চাবকাতে চাবকাতে ওর ছালই তুলে ফেলেছিলাম। ল্যাজটা গুটিয়ে মাথা নীচু করে ঘরের এক কোণে চুপ করে দাঁড়িয়ে সব হজম করলে। চোরের মতো মাথা নীচু করে রইলে। কিন্তু আমার মাথায় তখন খুন চেপে গেছে। গলায় দড়ি বেধে ওকে জঙ্গলের পথে মাইল বিশেক নিয়ে ছেড়ে দিয়ে এসেছিলাম।

সেকি কান্না! আমি ওর সঙ্গে একটি কথাও বলিনি। তখনো পুরো ডাগড়া জোয়ান হয়ে ওঠেনি। সামলাতে খুব কষ্ট হয়নি। মিগম্ তোমার কাছে মিথ্যে কথা বলবো না। বড্ডো কষ্ট হতো আমার। প্রাণটা হু হু করে কেঁদে উঠতো। কিন্তু নেমকহারামের

বাচ্চা। অতো দূরের পথ পাড়ি দিয়ে ঠিক আমার ঘরের কাছের জঙ্গলটাতে এসে কাঁদতে সুরু করতো। কাঁদতো, গজ্‌রাতো, আছড়াতো, দাপ্‌ড়াতো। প্রাণটা আমার হু হু করে উঠতো। শুনতে পারতাম না ওর কান্না। কানে আঙুল দিয়ে থাকতাম। কিন্তু না, মনটা কোমল হলে চলবে কেন। কান বন্ধ করে দাওয়ায় পড়ে থাকতাম। জানো মিগম্‌, আমি আগেই টের পেয়েছিলাম বউটাকে বাঘে খাবে। আমি বউএর মৃত্যুর আগে স্বপ্ন দেখেছিলাম যে একটা মিথোনের গলায় দড়ি বেধে নিয়ে চলেছি। না, না, ওকে আর কখনোই ডাকবো না। কখনো ডাকবো না।' টাপিক্‌ টাপুং চুপ করে উদাস দৃষ্টি মেলে বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকে।

বাঘটা জঙ্গলের ভেতর গজ্‌রাচ্ছে। অদ্ভুতভাবে ডাকছে। স্বর অভিমানে ডোবানো নাকি? আমি আর কি বলবো। নেফার সব কিছুই অদ্ভুত। সব কিছুই যেন রহস্যে ডোবানো।

* * *

গভীর রাত। ঘুমটা হঠাৎ ভেঙ্গে গেলো। গত রাত্রিরের মতো আজ রাতেও টাপিক্‌ টাপুং শয্যা ছেড়ে পা টিপে টিপে অগ্রসর হচ্ছে। প্রথমে ঘরের দরজার আগল খুলে বারান্দায়। তারপর উঠোনে। এতোক্ষণ তাকিয়ে থেকে টাপিকের কাণ্ডখানা দেখছিলাম। এবার লাফিয়ে উঠে পড়লাম। এ গভীর রাত্রিবেলা ও যায় কোথায়? ধুতিটা মালকোঁচা মেরে নিলাম। মুখার্জী নেই, পাশিঘাট গেছে। ওর ড্রয়ার থেকে লোডেড্‌ রিভলবারটা বের করে পকেটে নিলাম। তারপর এক লাফে বারান্দা থেকে উঠোনে। টাপিক্‌ ততোক্ষণে জঙ্গলের ভেতর ঢুকে পড়েছে। আজ আমি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। ওকে অনুসরণ করবো। দেখতে হবে ও কোথায় যায়। ওকে অনুসরণ করবো ওর সম্পূর্ণ অজ্ঞাতে। মনে মনে ভাবছি ওকি ঘুমন্ত ভ্রমণকারী? ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে হাঁটে? নিশাচর প্রমোদ ভ্রমণকারী? অনেক নিশাচর প্রমোদ

ভ্রমণকারী বিছানা থেকে উঠে বাইরে বেরোয়। বেরুবার আগে পোশাক পরে নেয়। তারা থাকে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। চেতনাহীন অবস্থায় ঘুমন্ত ভ্রমণকারীরা নাকি থাকে আঘাত থেকে নিরাপদ, হয় অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন। প্রতিবন্ধক এড়াবার জন্যে হয়ে ওঠে অতিমাত্রায় সচেতন। টাপিক্ টাপুং কি সেই শ্রেণীভুক্ত? জানিনে।

আমি টাপিকের পেছন পেছন ততোক্ষণে গভীর অরণ্যের ভেতর প্রবেশ করেছি। এক অজানা আশঙ্কায় বুকটা দুরু দুরু কাঁপছে। টাপিক্ টাপুং থেকে অনেকটা দূরত্ব বজায় রেখে গাছপালার আড়ালে নিজেকে যথাসম্ভব গোপন রেখে এগিয়ে যাচ্ছি। ধীর, স্থির, সতর্ক পদক্ষেপ। রাত্রি অরণ্যের বুকে মসীলেপন করেনি। ওটুকুই যা রক্ষে। তা হলে হয়তো এগুতে ভরসা পেতাম না। অরণ্য প্রান্তরে জ্যোৎস্নার বন্যা বয়ে যাচ্ছে। রূপোলী জ্যোৎস্নার ঢেউ, ইচ্ছে হয় খাবলা খাবলা জ্যোৎস্না মাটি থেকে অঞ্জলি ভরে তুলে নিই। শান্ত, সমাহিত অরণ্যভূমি। বিরাট বিরাট এবং অতি প্রাচীন সমস্ত মহীরুহ। ডালপালা, শিকড় বাকড় ছড়িয়ে কতো যুগ ধরে দাঁড়িয়ে রয়েছে কে জানে! তলায় তলায় জমাট অন্ধকার। গাছের ডালপাতা ভেদ করে জ্যোৎস্নার আলো সেখানে পৌঁছুতে পারেনি। মাঝে মাঝে মনে হয় মনের ভুল। গাছের তলায় ও বোধকরি অন্ধকার নয়। বোধ করি একটা ভালুক পা তুলে দাঁড়িয়ে রয়েছে। আর সত্যিই তো। একটা জামগাছের নীচে একটা ভালুক দু পায়ের ওপর ভর করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। গাছের ডালের প্রকাণ্ড মৌচাক থেকে মধু পড়ছে টুপ্ টুপ্ করে। আর তা মুখে নিয়ে চাখছে ভালুকটা। পাশের টিলার পাশ দিয়ে থপ্ থপ্ শব্দ করে আর একটা ভালুক মাতালের মতো টলতে টলতে চলেছে। মহুয়ার রস পান করেছে নাকি? গাছের আড়ালে আত্মগোপন

করে লোডেড্ রিভলভারটা বাগিয়ে ধরি, খুব শক্তিশালী অস্ত্র। মুখার্জী আমেরিকা থেকে আনিয়েছে। বাঘের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো যাবে। আর একটা গাছের আড়াল থেকে দাঁতালো শূকরটা মাথা নীচু করে দৌড় দিলে।

এই অরণ্যের সঙ্গে সমান্তরাল ভাবে বয়ে চলেছে সিয়াং নদী। এক বিশাল বালুকাময় প্রান্তর অরণ্য আর নদীর মধ্যে যোগসাধন করেছে। গত বর্ষাতে নদীর জল নদীর পাড় কূল ছাপিয়ে, বালুভূমি ভাসিয়ে অরণ্যের ভেতর ঢুকেছিলো। জল সরে গেছে অনেক দিন। কিন্তু এখনো পথ চলতে চলতে পায়ের গোড়ালি কাদাজলে ডুবে যায়। জল সরে গেছে। রেখে গেছে পলিমাটির স্তূপ। মাঝে মাঝে ছোট ছোট বালির ঢিবি। কেঁচকি কাঁটা। হিন্তালের ঝোপ। গোলপাতার ঝাড়। বাঁদিকে গাছের ফাঁক দিয়ে তাকালে দূরে দেখা যায় বালির রাশি। বালি আর বালি। তাতে রূপোলী জ্যোৎস্নার বান ডেকেছে। বালি ঝকমকিয়ে উঠছে। সেই শুভ্রতা চোখ ধাঁধিয়ে দেয়। দূরে চোখ ফেরালে নদীতে ঢেউএর ওঠানামা চোখে পড়ে। বনভূমিতে বাতাসের সোঁ সোঁ শব্দ। পাগলা ঝড়ো হাওয়া নদীর ওপর দিয়ে বয়ে এসে প্রচুর বালি ওড়াতে ওড়াতে ঢুকছে অরণ্যের ভেতর। চারদিকে বালুকণা ছড়াচ্ছে। দোল খাচ্ছে অরণ্য প্রান্তরের গাছ লতাপাতা।

এক বিরাট প্রশান্তি অঙ্গে মেখে বয়ে চলেছে নদীটা। তিব্বতে এর নাম সাঙ্গপো। নেফাতে সিয়াং নয়তো ডিহাং। আসাম উপত্যকায় পৌঁছে ডিবং এবং লোহিতের সঙ্গে মিশে এর নাম হয়েছে ব্রহ্মপুত্র। অরণ্যের কোথায়ও নেই সামান্যতম কর্মব্যস্ততার অভিব্যক্তি, নেই কোলাহল। নেই চঞ্চলতা। পাখীদের কাকলি স্তব্ধ হয়ে রয়েছে। নীড়ে নীড়ে তারা বিশ্রামসুখ উপভোগ করছে। পায়ের কাছ দিয়ে দাঁড়া মেলে সন্ন্যাসীকাঁকড়া চলেছে। আশেপাশে আম, জাম, জামরুল

বৃক্ষের ছায়া। গাছের লক্ষ লক্ষ শিকড়বাকড় মাটির সঙ্গে এক অচ্ছেদ্য বন্ধনে নিজেদের জড়িয়েছে। বট আর অশ্বত্থ থেকে অসংখ্য ঝুরি নেমেছে।

মাঝে মাঝেই জলের তিরতিরে রেখা। গাছের শাখা প্রশাখায় জড়িয়ে রয়েছে থোকা থোকা কুয়াশা। হালকা কুয়াশার আবরণ দিয়ে চারদিকটা ঢাকা। তাতে চাঁদের আলো পড়ে এক অপূর্ব কুহেলিকাময় পরিবেশের সৃষ্টি করেছে। টাপিক্ টাপুং আমার কাছে থেকে হাত পঞ্চাশেক দূরে। সে হেঁটে চলেছে। ক্ষিপ্রগতি তার। আমি সন্তর্পণে একগাছের আড়াল থেকে অন্য গাছের আড়ালে নিজেকে যথাসম্ভব লুকিয়ে রেখে এগুচ্ছি। আমার এক চোখ টাপিক্ টাপুং এর দিকে। অন্য চোখ নিবদ্ধ জঙ্গলের দিকে। শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্যভূমির দিকে। এ অরণ্য রোমাঞ্চ আনে। স্বপ্নের জাল ছড়ায়। বিশেষ করে এমন একটি জ্যোৎস্না ডোবানো রাত্রি। অরণ্যে মর্মর ধ্বনির ভেতর কান পাতলে বোধ করি অনেক কিছু শোনা যায়।

সন্ধ্যামালতী লতাটা যেন আমাকে আদর করে ছুঁয়ে গেলো। টুপ্ টুপ্ করে ঝরে পড়লো কতোকগুলো বেগুনি ফুল। লতাটা দুলছে এধার থেকে ওধার। ইচ্ছে করে দুটো ফুল কুড়িয়ে নিই। লোভ সংবরণ করি। স্থানে স্থানে কচি কোমল ঘাস। যেন শ্যামল কার্পেট বিছিয়েছে। ইচ্ছে হয় একটু গড়াগড়ি দিয়ে নিতে। কিন্তু এ যে অরণ্য। লোভকে সংযত করি। ফণিমনসার ঝোপ পথ আগলিয়ে রাখে। বোধ হয় চায় না এ বিপদসঙ্কুল অরণ্যে আমি আর এগুই। কাঁটার দঙ্গল এসে ধুতিতে বেধে। লতাপাতা নিজেদের জড়ায়। ঘাসের ভেতর গুড়িসুড়ি দিয়ে জংলী এই এতোটুকুন ফুলগুলো দোল খাচ্ছে। ছড়িয়েছে রঙের বাহার আর বৈচিত্র্য। বনস্পতিরা মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। বনভূমিতে তারা

অতন্দ্র প্রহরী। মাথায় মাথায় কুয়াশার ঘেরা টোপ। আবেশ জড়ানো, স্বপ্ন ছড়ানো মায়ামদির এ রাত্রিতে আমার শিল্পী মনের সত্ত্বাটুকু মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। মনের ক্যামেরায় ছবি তুলতে তুলতে এগুচ্ছি।

একটা গিরগিটি বড়ো বড়ো চোখ তুলে তাকায়। ওর জিভটা মুখগহ্বর থেকে ঘন ঘন বেরুচ্ছে আর ভেতরে ঢুকছে। ও জিভ বের করে কাদামাটি চাখছে। শুকনো পাতার ওপর ও কিসের শব্দ? মনে হলো কেউ যেন চলে ফিরে বেড়াচ্ছে। ঠিক আমার পেছনটায়। চট্ করে ঘুরে দাঁড়ালাম। রিভলভারটা বাগিয়ে ধরলাম। না কেউ কোথাও নেই। শব্দ বন্ধ হয়ে গেছে। আমি নিশ্চল অবস্থায় খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে পুনরায় এগুতে সুরু করলাম। জঙ্গলের পথে সতর্ক হওয়া প্রয়োজন।

কোথায় যাচ্ছি কে জানে। মিনিট পনেরো কি বিশ হলো। হাঁটছি আর হাঁটছি। টাপিক্ টাপুং কোথায় চলেছে কে জানে। হঠাৎ মনের কোণে ঝিলিক দিয়ে ওঠে গজদন্তের সন্ধানে নয় তো? এ অঞ্চলে শুনেছি অনেক হাতীর বাস। তাছাড়া মৃত্যুর ঠিক পূর্বমুহূর্তে হাতী নাকি দল কর্তৃক স্থিরীকৃত নির্দ্দিষ্ট গুপ্তস্থানে চলে যায়। সেখানে শুয়ে থেকে ধীরে ধীরে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। টাপিক্ কি সেই গুপ্তস্থানের সন্ধান পেয়েছে? কে জানে। বকুল ঝরছে। বন্য গোলাপের পাপড়ি খস্‌ছে।

সামনে একটা টিলা, তাকে ঘুরে যেতে হয়। টিলাটা প্রকাণ্ড একটা খাদের পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে। খাদের ভেতর দিয়ে হাতী চলার পথ। কাছের পাহাড় থেকে একটা ঝরণা সশব্দে নীচে আছড়িয়ে পড়ছে। কাছেপিঠে হাতীর দল মুলি বাঁশের জঙ্গল মটমট করে ওপড়াচ্ছে। আর এগুচ্ছে রূপোলী শীর্ণধারার সন্ধানে। তারা তৃষ্ণার্ত। একটা গাছের ডালে, হ্যাঁ, একটা লেপার্ড বলেই মনে হলো। গাছের

ডালের অন্ধকারের ভেতর ওর চোখ দুটো জ্বলছিলো। আমি রিভলভার নিয়ে প্রস্তুত ছিলাম। কোমরে রয়েছে বিরাট ছুরিটা। কাছেই অজগর একটা হৃষ্টপুষ্ট কাঠবিড়ালীকে গিলছে। এ শান্ত পরিবেশে হিংসা, দ্বেষ বড্ডো বেমানান। এ পরিবেশ প্রাণে দোলা দেয়। সারা জগতটাকে ভালোবাসতে ইচ্ছে করে।

টিলার নীচে স্রোতস্বিনীতে শম্বর মুখ ডুবিয়েছিলো, কিসের শব্দ পেয়ে দৌড়ুতে সুরু করে। আমি এগিয়ে চলেছি। আবার মনে হয় কে যেন শুকনো পাতার ওপর চলে ফিরে বেড়াচ্ছে। ঠিক আমার পেছনে। কয়েক পা পিছিয়ে সন্ধান করি। আততায়ী আমার পিছু নিয়েছে নাকি? কারুর সন্ধান মেলে না। অরণ্য গহন থেকে গহনতর। জলের ধারে এক পা তুলে সারস ঝিমুচ্ছে। মাঝে মাঝে মাথা উঁচু করে দেখছে। আমি ক্রমাগত কার পদধ্বনি শুনতে পাচ্ছি। জন্তু জানোয়ার নাকি? কেউ আমাকে অনুসরণ করছে বলে মনে হচ্ছে। কিন্তু কে আমাকে অনুসরণ করবে? কি তার উদ্দেশ্য? কি চায় সে? সম্প্রতি এ অঞ্চলটা নাকি স্মাগলার্স´ ডেন্ হয়ে উঠেছে। চোরাচালানকারীদের এ একটা পীঠস্থান। ওরা বেশ বহাল তবিয়তে রয়েছে এ অঞ্চলটায়। আবগারী বিভাগ হিমসিম খাচ্ছে। নদীর চরে, শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্যের ভেতর আন্তর্জাতিক চোরা কারবারীর দল ব্যবসা বাণিজ্য চালাচ্ছে। অভিনব উপায়ে পাচার করছে গাঁজা, আফিং, চরস। তাছাড়া রয়েছে চোরাই সোনার লেনদেন। এ ভয়ঙ্কর অরণ্যে ওরা আত্মগোপন করে ওদের অভিযান চালাচ্ছে। ওদের ধরা এক দুঃসাধ্য ব্যাপার।

মনে পড়ে চম্বল উপত্যকার কথা। মনে পড়ে রূপার কথা। মানসিংহ, লক্ষণ সিং, পুত্‌লী বাঈ, হাজুরী আর কাল্লার কথা, অভিশপ্ত চম্বল। মধ্যপ্রদেশের ভিণ্ড আর মরিনা। সেফার অরণ্যে যদি ওরকম হয়। শিউরে উঠি। চোরাই সোনা

সম্বন্ধে কথা উঠেছিলো। টাপিক্ টাপুং প্রশ্ন করেছিলো, 'সোনা দিয়ে কি হয়?' হেসে উঠেছিলাম আমি। মনে মনে ভেবেছিলাম ইতিহাসে স্বর্ণের এক অপ্রতিদ্বন্দ্বী অবস্থা। সভ্যতার আদিযুগ থেকে এর রয়েছে এক গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস। রামায়ণের সীতা জঙ্গলে থেকে সমস্ত খুইয়েও স্বর্ণ হরিণের লোভ ত্যাগ করতে পারেনি। টাপিক্ টাপুং জানে না গোল্ডরাস্ কি বস্তু। মরীচিকার পেছনে ছুটে বেড়ানো। সোনার পেছনে রয়েছে মসীলিপ্ত কলঙ্কময় সব কাহিনী।

আমি এগুচ্ছি। আমার সঙ্গে টাপিকের তখনো হাত পঞ্চাশেকের দূরত্ব। একটা মৃত মনুষ্যদেহ পড়ে রয়েছে। শেয়াল শকুনে দেহ থেকে মাংস খুবলে খুবলে খাচ্ছে। শিউরে উঠি। যা ভেবেছিলাম। স্মাগলারস্‌দের এলাকার ভেতর ঢুকে পড়েছি। জানিনে অদৃষ্টে কি রয়েছে। হাওয়ায় বালি উড়ছে। টাপিকের কথাগুলো কানে বাজছেঃ 'জানো মিগম, আমি আগেই বুঝেছিলাম কিছু একটা ঘটবে। স্বপ্নে দেখেছিলাম আমার বউটার পা জড়িয়ে রয়েছে প্রকাণ্ড একটি সাপ।' সাপের কথা মনে পড়তেই শরীরটা কেমন যেন করে ওঠে। পা ফেলতে কেমন যেন সঙ্কোচ বোধ হয়। গোখরা আর কেউটের যতো না ভয় তার চেয়ে অনেকগুণ বেশী ভয় 'কালাচের' কথা ভেবে। ওরা লম্বায় দেড় থেকে দুহাত পর্যন্ত হয়। শরীরে কালো রং এর ওপর সাদা দাগ। ফণাহীন, বিষের তীব্রতা সাংঘাতিক। পাতার আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে টুক্ করে একটি ছোবল, ব্যস। আর কথাটি বলতে হবে না। বিষের জ্বালায় ধুঁকতে ধুঁকতে মরতে হবে। চিতে এলে রিভলভার থেকে গুলী করবো। প্রয়োজন বোধে অজগরের ওপর ছুরি চালাতে পারি। কিন্তু 'কালাচ' সাপ। কি করতে পারি আমি? শিরদাঁড়া বেয়ে একটা ভয় ওঠানামা করতে থাকে। তবুও

বলছি, বড্ডো শান্ত সমাহিত জীবন এখানে। মাঝে মাঝেই আলো আঁধারের খেলা। পাতার আড়ালে আলো ঝিলমিল করছে। অরণ্যভূমি জ্যোৎস্নায় স্নান সেরে উঠেছে। সভ্যজগতের আর শহুরে জীবনের টানাপোড়েন নেই এখানে। এখানে শুধু আম, জাম আর শিরিষের ছায়া। বন মুরগীরা গাছের ডালে ডানার ঝাপটা মারছে।

কতোক্ষণ ধরে হাঁটছি? তা মিনিট পঁচিশ ত্রিশ হবে। জঙ্গল যেন অনেকটা পাতলা হয়ে এসেছে। টাপিক্ টাপুং গতি সংযত করেছে। আমিও দাঁড়িয়ে গেছি। একটা বটবৃক্ষের আড়ালে আত্মগোপন করেছি। আমাদের ভেতর হাত পঞ্চাশেকের দূরত্ব। সামনে খানিকটা খোলা জায়গা। গাছ গাছালি কেটে সাফ করা হয়েছে; একটা ছোট্ট বাঁশের তৈরী বাসা দৃষ্টিগোচর হচ্ছে। বাঁশের ঘরের ভেতর থেকে আলোর রশ্মি উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে। জ্যোৎস্না প্লাবিত বনভূমিতে ঝকেঝকে একটা বস্তু মুখ থুবড়ে পড়ে রয়েছে। এরোপ্লেন না? তাই বটে। ডানা, হাড়গোড় ভেঙ্গে মুখ থুবড়ে মাটিতে পড়ে রয়েছে। মনে হচ্ছে ইঞ্জিনের গোলমাল হয়েছিলো। গোত্তা খেয়ে মাটির বুকে নেমে এসেছে। গাছ গাছড়ায় ধাক্কা খেতে খেতে মাটিতে পড়েছে। ছোট্ট ওয়ান সীটার প্লেন। ফিউলাজ, ডানা, টেল্‌ফিন্, ইঞ্জিন, প্রপেলার, চাকা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মাটির ওপর পড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে একাকার।

এ্যাক্সিডেন্টের আগে ইঞ্জিন বন্ধ করে প্লেনের গতি বোধ করি সংযত করেছিলো। সজোরে ভূমিতে আছড়িয়ে পড়েনি। তাহলে পেট্রোল ট্যাঙ্ক ফেটে গিয়ে প্রজ্জ্বলিত হুতাশনে গোটা প্লেনটা ভস্মীভূত হতো। কিন্তু তা হয়নি। জখম নিয়ে প্লেনটা পড়ে রয়েছে। কিন্তু এ ছোট্ট প্লেন এখানে কি করে এলো? প্লেন এ্যাক্সিডেন্ট। চালক মৃত না জীবিত? কে প্রশ্নের জবাব দেবে? টাপিক্

টাপুং নিশ্চয় সমস্তকিছু জানে। টাপিক্ ফাঁকা জায়গার ওপর দিয়ে বাঁশের ঘরের দিকে পা পা করে এগিয়ে যাচ্ছে। টাপিক্ মাত্র কয়েক পা এগিয়েছিলো। হঠাৎ ঘরের ভেতর থেকে একটা লোক বেরিয়ে আসে। চন্দ্রালোকে খোলা প্রান্তরে রেঞ্জার সাহেব চাকলানবীশকে দেখে আমি চমকে উঠি। রেঞ্জার সাহেব এখানে? এ গহন অরণ্যে চাকলানবীশ কি করছেন? টাপিক্‌ও যেন এর জন্যে প্রস্তুত ছিলো না।

সে চেঁচিয়ে বলে 'এখানে কি চাস্? মেয়েটার খোঁজে এসেছিস্ বুঝি?' হা হা করে হেসে ওঠেন রেঞ্জার সাহেব। বাতাসে সে হাসি চারিদিকে ভেসে বেড়ায়। 'ফাঁকি দিবি ভেবেছিলি তাই না? রেঞ্জার সাহেবের চোখকে ফাঁকি দেওয়া বড্ডো কঠিন কাজ। মেয়েটার জন্যে বাঁশের ঘর অনেক মেহনত করে বানিয়েছিস। মেয়েটার সেবা শুশ্রূষা করছিস্। সেবা যত্নে ভালো করে তুলে ভোগ দখলের ব্যবস্থা করবি। তাই তোর মতলব, সে রকমই মনে হচ্ছে। তা যা দেখতে পাচ্ছি তোর আদর যত্নে মেয়েটা সম্ভবত বেঁচে যাবে। চা বাগানের সাহেবের মেয়েটার বরাত সুপ্রসন্ন। প্লেন ভেঙ্গে পড়ে জখম হয়েছে। কপালগুণে মরেনি। এখন তোর সেবা যত্নে ভালো হয়ে উঠবে।' রেঞ্জার সাহেব আবার হাসতে থাকেন। মাতালের হাসি, মনে হচ্ছে রেঞ্জার সাহেব প্রচুর মদ্যপান করেছেন।

'চুপ শয়তান। মনে মনে যা ভেবেছিস তা আমি প্রাণ থাকতে হতে দেবো না। কখনোই হতে দেবো না। এখানে নোংরামি করতে গেলে তোর বিপদ ঘটবে, আমি সাফ বলে দিচ্ছি। পাখীটা ডানা ভেঙ্গে পড়েছে আর তার সঙ্গে জখম নিয়ে পড়েছে ওই মেয়েটা। আমি দুদিন ধরে ওকে গাছ গাছড়ার রস খাইয়ে, শেকড় বাকড় বেঁটে প্রলেপ মাখিয়ে, ফল-মূল খাইয়ে জিইয়ে রেখেছি। ও একটু ভালো হলেই পলিটিক্যাল্ অফিসের বাবুকে খবর পাঠাবো।' টাপিকের উত্তেজিত কণ্ঠস্বর।

বেশ বুঝতে পারলাম আসামের চা বাগানের কোনো সাহেবের দুহিতা ছোট্ট প্লেন চালিয়ে এসে বিপদে পড়েছে। প্লেনের কলকব্জা নিশ্চয়ই বিগড়েছিলো। আর তারই ফলে প্লেন' গোত্তা খেয়ে মাটিতে নেমে এসেছে। টাপিক্ প্রাণপণে সেবা শুশ্রূষা করছে। আর মেয়েছেলের গন্ধে গন্ধে রেঞ্জার সাহেব এখানে এসে পৌঁছেছেন। উনি ঠিক খবর পেয়েছেন। রমাদির স্বামী রেঞ্জার সাহেব। রমাদি আর ইহজগতে নেই। কষ্টে মনটা ভরে ওঠে। রেঞ্জার সাহেব আর টাপিক্ পরস্পর পরস্পরের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে। রেঞ্জার সাহেব বলেন, 'সেবা শুশ্রূষা করে টাপিক্ তুই উপযুক্ত কাজই করেছিস্। এবার মেয়েটাকে আমার হেপাজতে রেখে চলে যা দিকিন্।'

'খবরদার। তোর নিজের মঙ্গল চাইলে এখান থেকে এই মুহূর্তে বিদায় নে।' চেঁচিয়ে বলে টাপিক্। সঙ্গে সঙ্গে সে তার কোমরের খাপ থেকে দা খানা বের করে। জ্যোৎস্না পড়ে অস্ত্রটা ঝকমকিয়ে ওঠে। আমি গাছের আড়াল থেকে সব দেখছি। শুকনো পাতার ওপর আবার সেই পরিচিত পদ শব্দ। পেছনে তাকাই। কাউকে দেখা যায় না।

'কুকুরের বাচ্চা। আমাকে ভয় দেখাচ্ছিস। ভেগে পড় টাপিক্। তোর মঙ্গলের জন্যে বলছি। এখনো সময় রয়েছে। নইলে ভালো হবে না বলছি। মেয়েমানুষটা এখন আমার হেপাজতে। ওর দেখাশুনো আমি করবো। মেয়েটা আমার সম্পত্তি। আমি ভোগ দখল করবো। আমি রেঞ্জার। বনের মালিক।' বলেন রেঞ্জার সাহেব।

কিছু বলবার জন্যে টাপিক্ বোঁধ করি হাত দু এক এগিয়েছিলো। তার হাতে দা'খানা ধরা ছিলো। রেঞ্জার সাহেব কি মনে করলেন কে জানে। পকেটে হাত ঢুকিয়ে রিভলবারটা বের করে এনে টাপিকের পেট লক্ষ্য করে দুম করে পিস্তল থেকে

গুলী ছুড়লেন। এক ঝলক আগুন। পেট চেপে ধরে টাপিক্ মাটিতে লুটিয়ে পড়লো। আর ঠিক সেই মুহূর্তে হলুদের ওপর ডোরা কাটা একটা ভারী বস্তু আমার পেছনে ঝোপের আড়াল থেকে লাফিয়ে উঠে রেঞ্জার সাহেবের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। বাঘটা রেঞ্জার সাহেবের গলা কামড়িয়ে ধরে মন্থর গতিতে জঙ্গলের ভেতর গিয়ে ঢুকলো। রেঞ্জার সাহেবের দেহটা বাঘের মুখে ঝুলছিলো।

তাহলে বাঘটা এতোক্ষণ আমার পেছনে ঝোপের ভেতর ওৎ পেতে বসেছিলো। রিভলবারটা বাগিয়ে ধরে এগিয়ে যাই। টাপিকের তখন শেষ অবস্থা। শেষ নিশ্বাস বার হবার আগে দুটি কথা সে বলে, 'আমার বাঘ।' এরপর সে চিরনিদ্রার কোলে ঢলে পড়ে। বেশ বুঝতে পারি টাপিক্ টাপুং এর পোষা বাঘটা সারাটা জঙ্গলের পথ আমাদের পেছনে পেছনে এসেছে। এসেছে চুপি চুপি। মাঝে মাঝে আমি ওরই পদ শব্দ শুনেছি। বাঘটা একটু আগে ঝাঁপিয়ে পড়লে হয়তো টাপিক্ প্রাণে বেঁচে যেতো। বাঁশের ঘরে ঢুকে অল্প বয়স্কা ইংরেজ তরুণীকে দেখেছিলাম। আঘাত ততো গুরুতর নয়। শেষ পর্য্যন্ত হয়তো বেঁচে যেতো। কিন্তু গভীর অরণ্যে, রাতের অন্ধকারে, নির্জন পরিবেশে, গোলাগুলীর শব্দে এবং সর্বশেষ বাঘের হুঙ্কারে ভয় পেয়ে মেয়েটি হার্টফেল করেছে। দুর্বল দেহ মন এতোগুলো ঘটনার জন্যে বোধ করি প্রস্তুত ছিলো না। সে রাতে ফিরে গিয়েছিলাম। ভোরবেলা লোকজন নিয়ে এসে দেহগুলোর সৎকার এবং সমাধিস্থ করবার বন্দোবস্ত করেছিলাম।

নবম পরিচ্ছেদ

পাঙ্গিনের বাংলোতে মেজর চোপরার আতিথ্য গ্রহণ করেছিলাম। শিশির ধোঁয়া সকাল। শীতের কুয়াশা মাঠ ঘাট পাহাড় প্রান্তর ঢেকেছিলো। কুয়াশার ঘেরা টোপ বেলা বাড়তে বাড়তে সব পরিষ্কার। রৌদ্রস্নাত পৃথিবী। টিলার ওপর বাংলোটা, সামনে সর্পিল পথ বনের ভেতর অদৃশ্য হয়েছে। টিলার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে রয়েছে দেওদার, পাইন আর পপলার গাছের সারি। নরম নরম রোদ পরশ বোলাচ্ছে কোমল কচি সবুজঘাসে। সবুজের সমারোহ চারদিকে। চন্দন বৃক্ষের বন থেকে ভেসে আসছে চন্দনের সুবাস। ইউকিলিপ্টাসের পাতায় হাওয়ার সিরসিরানি, গোলাপের কোমল পাপড়ি একটি একটি করে বৃন্তচ্যুত হচ্ছে। রৌদ্র কাঁপছে শিরীষ শাখায়, মিসেস চোপরার গ্রীবায় আর গালে। হালকা পেঁজা তুলোর মতো মেঘের দল ভেসে যাচ্ছে। আর হালকা মেঘের ভেতর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে বনহংসীর দল। দূরে পাহাড়ের চূড়োয় চূড়োয় মেঘের মেলা। প্রজাপতি ঘাসের ডগায় বসে পাখনা মেলেছে। লাল, নীল হলুদ, বেগুনী, রং আর রং। বিচিত্র বর্ণের অপূর্ব সমাবেশ।

প্রজাপতির পাখনা কাঁপছে থরথর করে। ধুলো বালিতে গড়াগড়ি দিচ্ছে চড়ুই আর শালিকেরা। চঞ্চু দিয়ে পালকের ভেতর থেকে বের করে আনছে পোকা মাকড়। বাংলোর বারান্দার এক কোণে পায়রা দম্পতি ঘাড় ফুলিয়ে শরীর বেঁকিয়ে ডেকে যাচ্ছে বাক্ বাকুম কুম্। সোহাগ জানাচ্ছে পরস্পর পরস্পরকে। বারান্দায় মোড়া পেতে বসেছে মিসেস চোপরা। বাঙ্গালী মেয়ে পাঞ্জাবী চোপরাকে ভালোবেসে বিয়ে করেছে। পোশাক ছিম্ছাম্

কোমরের চারদিকের পেশীতে, নিতম্বের পেশীর ভাঁজে ভাঁজে মাংস আর চর্বি। গলায়, গালে, কপালের ভাঁজে বয়স হিষেব কষেছে। মিসেস্ চোপরা ব্যবহার করেছে মাসকারা, আই লাইনার, বিবিধ আই শ্যাডো। তার বব চুল। হাতে মেহেদীর প্রলেপ। শাড়ী পড়েছে, জানিনে ধনেখালি না ঢাকাই। রঙীন মোমের মতো মসৃণ ছুটি বাহুতে রক্তাভ কোমলতা, ত্বকের পরিচর্য্যায় ছুধের সর মেখেছে না ভিনিগারে তুলো ভিজিয়ে বুলিয়েছে বলতে পারবো না। গৌর গলায় সরু হারের লকেট।

উল বুনছে মিসেস্ চোপরা। কমলালেবুর গাছের ডালে বসে দোয়েলটা পুচ্ছ নাচাচ্ছে। কালচে বাদামী রঙের পালক। বুকের ওপর নীল অপরাজিতা ফুলের মতো অর্দ্ধচন্দ্রকার চিহ্ন। আশেপাশে রডোড্রেন্ডন্ আর ডালিয়ার সমারোহ। বারান্দায় টেবিল চেয়ার সাজানো রয়েছে। টেবিলের ওপর এমব্রয়ডারী করা টেবিল ক্লথ পাতা। বেতের চেয়ারের ওপরে কুশনে ক্রশ্ স্টিচের কাজ। ফ্লোরে নরম সবুজ গালিচা। দেয়ালে ঝুলছে জলরঙা ও তেলরঙা ছবি। নানা রকম রঙ ও নকশার প্যাটার্ন্। নানাপ্রকারের ডিজাইন। রঙের অদ্ভুত প্রয়োগ। রেখার অপূর্ব বিন্যাস।

একটু দূরে বসে আছে মেজর চোপরা, বন্দুকের নল সাফ করছে। ঘন ঘন শীষ দিচ্ছে। ওয়েষ্টার্ণ মিউজিকের সুর গুন গুন করে গলায় সাধছে। বন্দুক পরীক্ষা করছে। কার্ত্তুজ সাজাচ্ছে। শিকারে যাবার প্রস্তুতি। বাংলোর পাশে প্রাঙ্গনে খেলা করছে আট ন বছরের কয়েকটি ছেলে। তার ভেতর চোপরার একমাত্র ছেলেও রয়েছে। বাবা মার চোখের মণি। প্রাণচঞ্চল, হাসিখুশী ছেলেটি। লাবণ্যমণ্ডিত ঢলঢলে মুখখানি। ধবধবে রং, মাথায় একরাশ কালো কোঁকড়া চুল। ছেলের দল বল লোফালোফি করছিলো। আমি আমার ঘর থেকে দেখছিলাম।

গতরাত্রিরে অতিরিক্ত মদ্যপান করে চোপরার প্রায় বেঁহুশ

অবস্থা, কিন্তু তারই ভেতর যে গল্প সে আমাকে শুনিয়েছিলো তাতে আমি চমকে উঠেছিলাম। প্রথমে চোপরাই সুরু করেছিলো, 'তোমার গল্পের অনেক স্টক্, মদ আর মাতাল নিয়ে একটা গল্প শোনাও দেখি।' চ্যালেঞ্জ লুফে নিয়েছিলাম। তূণ থেকে একটা তীর বেছে নিলাম। বললাম প্রহিবিসান্ অফিসারের গল্প।

এক বিরাট জনসভায় মন্ত পানের বিরুদ্ধে মিনিট পনেরো জোরালো বক্তৃতা করবার প্রহিবিসান্ অফিসার ছুটো বোতল টেবিলের ওপর সাজিয়ে রাখলে। উদ্গ্রীব জনতা তাকিয়ে আছে বোতল ছুটোর দিকে। তার একটাতে রয়েছে টলটলে সাদা জল। অন্যটাতে কড়া ঝাঁঝালো মদ। এরপর প্রহিবিসান্ অফিসার পকেট থেকে একটা গুবরে পোকা বের করে টেবিলের ওপর রাখলে। অফিসার মদের বোতলটা উপুড় করে ঝাঁঝালো উগ্র মদ গুবরে পোকার সারা শরীরে ঢেলে দিলে। ছট্ফট্ করে উঠলো পোকাটা। ঝাঁঝালো তরল পদার্থের সংস্পর্শে এসে পোকাটা কেমন যেন কুঁকড়ে গেলো। ছট্ফট্ করতে সুরু করলে। এরপর অন্য বোতল থেকে খানিকটা ঠাণ্ডা পরিষ্কার জল ভদ্রলোক গুবরে পোকার দেহে ঢেলে দিলে! আর ঠাণ্ডা জল ঢালতেই পোকাটা আনন্দে গা ঝাড়া দিয়ে উঠলে। পাখা নেড়ে, সমস্ত শরীরটা নাড়াচাড়া দিয়ে সতেজ আর চনমনে হয়ে উঠলে। ঘুরে বেড়াতে সুরু করলে এদিক্ থেকে ওদিক্।

প্রহিবিসান্ অফিসার জন সাধারণের উদ্দেশ্যে বললে, 'দেখলেন তো, মদ ঢাল্বার পর গুবরে পোকার দশা। আর এও দেখলেন, ঠাণ্ডা শীতল জল ঢালবার পর ওর স্ফূর্তি আর আনন্দের বহরটা। প্রভেদটা এতোক্ষণে ভালোভাবেই টের পেয়েছেন আশা করি। সুতরাং আমার অনুরোধ এখানো সময় থাকতে মন্তপান থেকে বিরত হোন। পান করুন বিশুদ্ধ ঠাণ্ডা জল।' প্রহিবিসান্ অফিসার বক্তৃতা থামিয়ে খুশীমনে কপালের ঘাম মুছতে সুরু করে। তৃপ্তিতে তার

মন ভরে উঠেছে। লোকগুলো এতোক্ষণে নিশ্চয়ই মত্ত পানের বিষময় ফল সম্বন্ধে ভালোভাবে জেনেছে। এগিয়ে আসে একটি বেঁটেখাটো মতো লোক।

'স্যর। ওই মদের বোতলটা আমাকে দিন।' সে বলে।

'কেন?' প্রশ্ন করে প্রহিবিসান্ অফিসার। ঘাড় চুলকিয়ে লোকটা জবাব দেয়, 'স্যর, আমার পেটে অনেক পোকামাকড় হয়েছে। ওই বোতলের মদটুকু গিলে পেটের পোকামাকড়গুলোকে সবংশে ধ্বংস করবো।'

'সাবাস'। চেঁচিয়ে ওঠে চোপরা সাহেব। 'ওয়াণ্ডার ফুল।'

এরপর চোপরা সশব্দ হাসিতে ফেটে পড়েছিলো। চোপরা একদিন এসে বললো, 'বলোতো ভাই, কাল রাত নটার পর থেকে দশটা পর্য্যন্ত কোথায় ছিলাম? নটা পর্য্যন্ত সময়ের হিসেব মিলে যাচ্ছে। দশটার পর থেকে কোথায় ছিলাম তা বেশ মনে আছে। কিন্তু ওই রাত নটা থেকে দশটা পর্য্যন্ত। এই এক ঘণ্টার কোনো হদিশ করে উঠতে পাচ্ছিনে। আর বউ নাছোড়বান্দা, জানতে চাইছে ওই সময়টুকু কি অবস্থায় ছিলাম।'

আমি বেশ বুঝতে পেরেছিলাম মেজর সাহেব মদ খেয়ে কোথায়ও ঝোপঝাড়, নালার ওপর হয়তো অচৈতন্য হয়ে পড়েছিলো। কয়েক পেগ মদ গেলবার পরই চোপরা সুরু করেছিলো, 'জানো ভাই, দেশ ভাগ হবার ঠিক আগে আমি ঢাকায় বদলী হয়েছিলাম। বেশ মনে আছে আমি ঢাকার প্রেমে পড়েছিলাম। আমি ঢাকার বুড়ীগঙ্গায় সাঁতার কেটেছি। সদরঘাটে কতো সন্ধ্যে ঘুরে বেড়িয়েছি। নবাব বাড়ীতে খানা খেয়েছি। রূপলাল হাউসে বসে গানবাজনা শুনেছি। রমনা এখনো আমাকে হাতছানি দেয়। পুরনো পল্টনের মাঠে কেটেছে কতো গোধূলি আর সন্ধ্যা। ভিক্টোরিয়া ক্লাবে টেনিস নিয়ে মেতে উঠেছি। খেলাটা নেশায় দাঁড়িয়ে গিয়েছিলো। ঢাকা

ইউনিভার্সিটির ঢাকা হলে আর জগন্নাথ হলে বসন্তোৎসব আর শারদোৎসবে কতো হৈ হুল্লোড় দেখেছি। ডিগ্‌নিফাইড এ্যাণ্ড নাইস্ ফাংসনস্। চমৎকার এবং নিখুঁত। ইউনিভার্সিটি ছিলো বিরাট আর প্রকাণ্ড। তার লাইব্রেরীতে কতো বই। প্রাণভরে পড়াশুনো করেছি। মুন্সীগঞ্জে তখনকার দিনে ইয়া বড়ো বড়ো কলা পাওয়া যেতো। তালতলা বাজারের ছানার মিষ্টি, অপূর্ব তার স্বাদ। ওরই ধারেকাছে অঞ্চলের কলাপাতা চাপা দেওয়া ক্ষীর। এখনো মুখে লেগে রয়েছে।

ভালো লাগতো ঢাকার জন্মাষ্টমী উপলক্ষে যে মিছিল বেরুতো তাই ঘণ্টাভর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে। সোনার চৌকি আর রূপোর চৌকির ছড়াছড়ি। মাই গড্। এতো সোনা রূপো ছিলো তোমাদের ঢাকার লোকদের।

মেজর সাহেব ফিরে গেছে পুরাণো দিনগুলোতে। যে দিনগুলো কেটেছে ঢাকায়, কেটেছে হাসি, গান আর উৎসবের ভেতর। সে বলে চলে 'ভাই, তুমি ঢাকার ছেলে, বলো না একটা ঢাকার গল্প। সরস আর মজাদার হওয়া চাই।'

বলেছিলাম শেখ আলির গল্প। শেখ আলি লেখাপড়া জানে না। সরল মানুষ, ঘোড়ার গাড়ী চালাতো। তার সখ হলো ছেলেকে লেখাপড়া শেখাবে। ঘোড়ার গাড়ী চালকের ছেলে লেখাপড়া শিখে যদি কিছু একটা হয়। যদি কেউকেটা বনে যায়। সে ছেলেকে একটা শিশুপাঠ্য পুস্তক কিনে দিলে। বছর আট ন বছরের ছেলে। চেঁচিয়ে পুস্তক পড়ছে। বাপ মানে আমাদের শেখ আলি ঘোড়াকে খানা খাওয়াচ্ছে। দানাপানি দিচ্ছে। ঘাড়ে পিঠে মর্দন করছে। ভালো করে রগড়ে দিচ্ছে বুক পেট। ঘোড়া বাবাজী চিঁহি চিঁহি ডাক ছাড়ছে ঘন ঘন। এরপর গাড়ী নিয়ে তাকে পক্ষীরাজের মতো ছুটতে হবে।

ছেলে চেঁচিয়ে পড়ছে, 'পাখী সব করে রব রাতি পোহাইল, বনে বনে কুসুম কলি সকলি ফুটিল।' খানিকক্ষণ কিতাব পাঠ করে সে বলে 'বাপজান্। অর্থটা বুঝাইয়া দাও।'

'দূর, দূর। ল্যাখাপড়া করছি নাকি যে ওইসব বুঝাইয়া কমু। চালাই গাড়ী, ঘোড়ার পিঠে চাবুক চালাই সপাসপ্।'

ছেলে আবার দুলে দুলে পড়তে থাকে। আবার এক সময় ছেলে বাপকে অর্থ বুঝিয়ে দেবার জন্যে অনুরোধ করে। অনুরোধ বাপ প্রত্যাখান করে। তৃতীয়বার ছেলে যখন আবদার ধরেছে তখন গাড়োয়ান বাবাজী কিতাবখানা টেনে নিয়ে বলে, 'এইসব গুলানের মানে তো জলের লাখান সোজা। বুইঝবার কষ্টটা কই। 'পাখী সব করে রব রাতি পোহাইল।' আরে সকাল হইছে, অন্ধকার যাইবার লাগছে, আলো ফুইট্বার লাগছে। ঐ মাঝের চিপাটা। ওইটার কথা কইছে। আর কাউয়া (কাক) গুলান বেবাক হাক ডাক ছাড়বার লাগছে।' পরের লাইন 'বনে বনে কুসুম কলি সকলি ফুটিল।' শেখ আলি ওই লাইনটা পড়ে বিড় বিড় করছে। ইস্। লেখক ব্যাটা এতো কথা জানলো কি কইরা? কিতাবে সব লিইখা দিছে। কও দেখিন্ বাপ হইয়া ছেইলে পানের কাছে এইসব কওন যায় নাকি। শালা, এতো খোঁজ খবর পায় কি কইরা? লেখকটা শয়তানের বাচ্চা। কুসুম আর কলি নামে মাইয়ালোক গুলানের ঘরে হরদম যাতয়াত কইরছি জানবার পারলো কোনখান থিকা। আমার ঘোড়ার গাড়ীতে চইরছিলো নাকি কোনোদিন। ভাড়া চাইছিলাম হয়তো বেশী। কিতাবের ভেতর জুতাইয়া ছাড়ছে। বেবাক্ ফাঁস কইরা দিছে।'

চোপরা হেসে গড়িয়ে পড়ে। খুব ভালো বাংলা জানে সে। স্ত্রী বাঙ্গালী, অনেকটা মদ সে গিলেছে। টলছে সে। সে আবার ঢাকার গল্প সুরু করে: 'জানো পার্টিশানের আগে ঢাকার

মাহুত গঞ্জে পোস্টেড ছিলাম। মিলিটারীতে তখন আমি জুনিয়র কমিশনড্ অফিসার।'

বললাম, 'মাহুতগঞ্জ নয়, মাহুতটুলী।'

'দ্যাটস্ রাইট্। মাহুতটুলী, মোগলদের সময়ে ওখানে নাকি থাকতো অনেক হাতীর মাহুত। তাদের সঙ্গে থাকতো তাদের হাতীগুলো। ওরই পাশের পাড়া আরমেনীটোলায় বৃটিশ আমলে বাস করতো অনেক আর্মেনিয়ান সাহেব। আর্মেনিয়ান চার্চটার কথা মনে আছে?'

বললুম, 'হ্যাঁ মনে আছে।'

এরপর মেজর সাহেব ঢাকার মসলিনের গল্প করে। ঢাকার মস্‌লিনের জন্যে পারস্যের আর রোমের বেগম আর মেমসাহেবরা অস্থির হতো। সময় মতো ওর আমদানী না হলে গোসাঘরে গিয়ে খিল দিতো। লোক ছুটতো ইরাকের মোসল্ শহরে যেখানে মস্‌লিন বেচা কেনা চলতো। শ্রেষ্ঠ মস্‌লিন তৈরী হতো ঢাকা জেলার সোনার গাঁ, ডেমরা ও তিতবদ্দিতে। শোনা যায় মাদ্রাজের মছলীপত্তন বন্দর থেকে চালান যেতো বলে মসলিন কাপড় ওই নাম পেয়েছিলো।

চোপরা সাহেব আবার শুরু করে, 'মাহুতটুলী তখন দাঙ্গা বিধ্বস্ত অঞ্চল। দিনে দুপুরে চলেছে লুটতরাজ, রাহাজানি, খুনখারাবি আর গুম্ খুন। হিংস্র পশুরা একে অন্যের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে। নিধনযজ্ঞে মেতে উঠেছে। সভ্যতার মুখে চোখে কালি লেপন করে চলেছে। মানুষগুলো যেন আর মানুষ নেই। আমি আমার কম্পানীর লোকজন নিয়ে রাতদিন দৌড়ঝাপ করছি। দুষ্টুলোকগুলোকে সায়েস্তা করছি। আমার কাজ ছিলো দুষ্টের দমন। শিষ্টের পালন। খুনীকে দাঙ্গাকারীকে দরকার মতো গুলী করে মাটিতে ফেলছি। ধর পাকড়। সার্চ। শাসন চালু রাখতে গলদঘর্ম হচ্ছি।' চোপরা গ্লাসে মদ ঢালছে।

আমি বলি, 'আর মদ খাবেন না।'

চোপরা শোনে না। মৃদু হাসে। সে আবার বলতে সুরু করে: 'বিবাদমান দুপক্ষকে বাধা দিতে গিয়ে আমরা ক্লান্ত আর শ্রান্ত। ঠিক এই সময় একটি বাড়ী থেকে একটি কচি বউ এর চীৎকারে আকৃষ্ট হয়ে দৌড়ুলাম সেই দিকে। সমস্ত ফেলে রেখে বাড়ী রক্ষার জন্যে ছুটলাম হন্তদন্ত হয়ে। গুণ্ডাদের তাড়িয়ে রক্ষা করলাম স্বামী স্ত্রীকে। বাড়ী পাহারা দেবার বন্দোবস্ত করলাম। ওদের মুখে চোখে কৃতজ্ঞতার চিহ্ন। ভীষণ খুশী হলো ওরা। আমার আদর আপ্যায়নের কোনোরকম ত্রুটি হলো না। বউটির দিকে ভালো করে তাকালাম। ওদের ড্রয়িংইরুমে বসে বউটি আমার দিকে তাকালো। আর তখুনি ওর পায়ে আমার হৃদয়টাকে আমি সমর্পণ করলাম্। ওর একমাথা কোঁকড়ানো চুল। দীঘল চোখ। দেহে যেন গলানো সোনা ঢেলে দিয়েছে। ওর ঠোঁট দুটো যেন রক্ত গোলাপের পাপড়ি। কথা বলতে গেলে পাপড়ি দুটো যেন কেঁপে কেঁপে উঠতো।' চোপরার হাত খানা কাঁপছে।

'এরপর বেশ কয়েকটা দিন মেতে রইলাম ওদের নিয়ে। আমি ওদের ত্রাণকর্তা। ভীত, সন্ত্রস্থ পরিবারটি আমার প্রসারিত পক্ষপুটের আড়ালে আশ্রয় নিয়েছে। ও বাড়ীতে ছিলো আমার অবাধ গতি। অবারিত দ্বার। গল্পগুজবে দিনগুলো কোথা দিয়ে কেটে যাচ্ছিলো বুঝতে পারছিলাম না। স্বপ্ন আর স্বপ্ন। রঙীন স্বপ্নজালে নিজেকে জড়িয়ে ফেলছিলাম ক্রমশ। মেয়েটি ক্রমেই আকৃষ্ট হচ্ছিলো আমার প্রতি। আমার পৌরুষত্বের প্রতি। আমার সঙ্গে ওর আচরণ ধীরে ধীরে সহজ আর সরল হয়ে এলো। বাড়ীটার প্রতি আমার যে কি আকর্ষণ ছিলো তা বলে বোঝানো অসম্ভব। আমি বোধ করি মোহগ্রস্ত হয়ে বিবেকবুদ্ধি হারাচ্ছিলাম একটু একটু করে।

জয়ের নেশা। ছিনিয়ে নেবার বাসনা রক্তে প্রতিক্ষণ দোলা দিচ্ছিলো।

পৃথিবীর ইতিহাসে এ দোলা বহুকাল ধরে চলে আসছে। 'আমার চাই। আমার প্রয়োজন।' বাকী কোনো কিছুর সঙ্গে মীমাংসা করতে মন রাজী নয়! আর আশ্চর্য। আমি ঠিক যতোদূর এগিয়েছিলাম মেয়েটিও ঠিক ততো দূরই এগিয়ে ছিলো। চাকরিতে আমার প্রমোসন্ হলো, ট্রানস্ফারের অর্ডার এলো। লুধিয়ানার গম ভুট্টার ক্ষেতের হাতছানি প্রত্যাখান করলাম। বুড়ী গঙ্গার কুলুকুলু ধ্বনি শুনে সব কিছু ভুললাম। ঢাকা সহরের মাটি আঁকড়িয়ে পড়ে রইলাম।

মেয়েটির প্রেম আমাকে ও মাটির সঙ্গে এক অচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধলে। মেয়েটির প্রেমে আমি মজলাম। প্রমোসন্ রিফিউজ করলাম। একটা সময় এলো যখন বেশ বুঝতে পারলাম পরস্পর পরস্পরকে ছাড়া বাঁচা অসম্ভব। আর তখুনি মীমাংসা আর ফয়শালার জন্যে প্রস্তুত হলাম। সুযোগ এলো। দাঙ্গাকারীর দল বন্দুক নিয়ে এসে হামলা সুরু করলে। এরা গুলী ছুঁড়লে। আমরা গুলী ছুড়লাম। বন্দুকের নল থেকে আগুন ঝরলো। মিলিটারী রাইফেল গর্জে উঠলো। প্রকাশ্য দিবালোকে গুলীর শব্দে রাজপথ সচকিত হয়ে উঠলো। আমি সময় বুঝে সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করলাম। আমার বন্দুকের নল ঘুরিয়ে দিলাম। দাঙ্গা কারীরা আমার লক্ষ্য নয়। রাইফেলের নল তাক্ করলাম ওদের বাড়ীর দোতালার বারান্দার দিকে যেখানে সেই মুহূর্তে এসে কিশোরীর স্বামী দাঁড়িয়েছিলো। দাঁড়িয়ে রাস্তায় সংঘটিত সব কিছু দেখছিলো। গুড়ুম। নল থেকে গুলী ছুটে বেরিয়ে গেলো। অনেকগুলো শব্দের মাঝখানে আর একটি মাত্র শব্দ। কেউ টের পেলে না। কেউ জানলে না। ওর স্বামী মুখ থুবড়িয়ে বারান্দার ওপর পড়ে গেলো।

বনলতার স্বামী। হ্যাঁ। মেয়েটির নাম ছিলো বনলতা। পড়ে গিয়ে আর উঠলো না। গোলমাল হৈ চৈ এর ভেতর সবকিছু ঘটে গেলো। রক্ত ঝরা একটা ত্নপুর। আমি ত্নবোতল রাম পান করে নিয়েছিলাম। প্রস্তুত হচ্ছিলাম বেশ কয়েক দিন ধরে।' চোপরা চুপ করে। মুখটা মুহুর্মুহু বিকৃত করে। জল ছাড়া, সোডা ছাড়াই সে মদ গিলছে। তার গলা জ্বলছে। বুক জ্বলছে। হৃদয়টা অনেককাল ধরে জ্বলছে। আমি পাঙ্গিনের অরণ্যের দিকে তাকিয়ে থাকি। থেকে থেকে জোনাকি জ্বলছে নিভছে। হায়না ডাকছে। ঝিঁঝি ডাকছে।

প্রশ্ন করি, 'বনলতা তোমাকে সন্দেহ করে নি?'

'সেদিন করেনি। কিন্তু আমাদের বিয়ের পরে কয়েক বছরের ভেতর সন্দেহ করতে সুরু করলো। আমাদের ত্নজনের নেশা ততোদিনে কেটে গেছে। প্রেমের ভিতে চিড় খেয়েছে। আজ ও আমাকে পুরোপুরি সন্দেহ করে। ঝগড়া-ঝাটির মাঝখানে সবকিছু বলে ফেলে। আমি কান দিইনে। জানো, বনলতার মৃত স্বামী ঘুমের ভেতর এসে মাঝে মাঝে দেখা দেয়। কি যেন আমাকে বলতে চায়। হাসতে সুরু করে। ব্যঙ্গের হাসি। আমি বালিশের তলা থেকে পিস্তল বের করলে পালায়।' বেশ বুঝতে পারি যে পাপ চোপরা করেছে সহজে তা থেকে পরিত্রাণ নেই।

চোপরা বলে, 'জানো আমাদের ওই ন'বছরের একটি মাত্র ছেলে। ওর দিকে তাকিয়ে সবকিছু আমরা ভুলে থাকি। ও আমার আর বনলতার ভেতর বিরাট এক সেতু। একমাত্র যোগসূত্র। ওর দিকে তাকিয়ে আমরা ডাইভোর্সের কথা ভুলে থাকি। ও আমাদের ত্নজনের চোখের মণি।' মদের ঝোঁকে চোপরা অনেক গুপ্ত তথ্য আমার কাছে ফাঁস করে দেয়। চোপরা একসময় বলে, 'ভাই, এতোগুলো চোখকে ফাঁকি দিয়েছি। ওপরের চোখকে কি ফাঁকি দিতে পারবো?' চোপরা

আঙুল দিয়ে ওপরের দিকে দেখায়। কি জবাব দেবো, চুপ করে থাকি।

শিশিরস্নাত সকাল বেলায় ওদের তিন জনকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিলাম। চোপরা বন্দুকের নল সাফ করছে। মিসেস্ চোপরা উল বুনছে। ওদের নবছরের ছেলেটি অন্য পাঁচটি ছেলের সঙ্গে উঠোনে বল লোফালোফি করছে। রাতের বর্ণিত ঘটনাগুলো কেমন যেন সব মিথ্যে বলে মনে হয়। হয়তো কোনো কিছুই সত্যি নয়। চোপরা মদের ঝোঁকে মিথ্যে কথা বলেছে। বনলতা দেবী উল আর সোয়েটার নিয়ে ব্যস্ত। তার যৌবনের রূপের সেই প্রচণ্ড দাপট আর নেই। বসন্তের হাওয়া মনের বনে আর মাতামাতি করে না। জীবনের সিঁড়ি টপ্‌কাতে টপ্‌কাতে বনলতাদেবী এখন শ্রান্ত আর ক্লান্ত। প্রৌঢ়ত্বের আসনে জোড়াসন হয়ে বসে সামনের জগতটাকে নির্বিকার দৃষ্টি ফেলে দেখছে।

হঠাৎ দুড়ুম দুড়ুম করে শব্দ। তাকিয়ে দেখি চোপরার হাত থেকে বন্দুকটা মেঝেতে ছিটকে পড়েছে। বন্দুক লোডেড্ ছিলো। গুলী বন্দুকের নল দিয়ে বেরিয়ে জানালার ভিতর দিয়ে ছুটে গিয়ে যেখানে ছেলের দল খেলা করছিলো তার একজনের বুকে গিয়ে বিঁধেছে। প্রাণ কাঁপানো চীৎকার দিয়ে ছেলেটি মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞান হয়ে মেঝেতে ঢলে পড়ে বনলতাদেবী। এক মুহূর্তে সমস্ত ব্যাপারটা ঘটে যায়।

চোপরার বন্দুকের গুলী যার বক্ষস্থল ভেদ করেছে সে আর কেউ নয়। চোপরা আর তার সহধর্মিনীর একমাত্র সন্তান। ওদের চোখের মণি। যে ওদের ভেতর সৃষ্টি করেছিলো এক অদৃশ্য সেতু। যার কথা ভেবে ভেবে ওরা ডাইভোর্সের কথা ভুলে থাকে। চোপরার চোখের সামনে সব ঘটে গেলো। চোপরা পাথরের মতো দাঁড়িয়ে রয়েছে। আমি ছুটে গিয়েছিলাম। কিন্তু

ততোক্ষণে সব শেষ। ছেলেটির নিশ্চল, নিথর দেহটা মাটিতে পড়ে রয়েছে। জমির ওপর চাপ চাপ রক্ত। চোপরা এবং মিসেস্ চোপরার একমাত্র সন্তান। চোপরার একটি কথা আমার কানে বার বার বাজছিলো: ওপরের চোখকে কি ফাঁকি দিতে পেরেছি? চোপরা বোধ করি তার প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গেলো। আমি বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে নেফার মাটিতে দাঁড়িয়ে রইলাম।

দশম পরিচ্ছেদ

সঞ্জয় সমাদ্দারের কাছে ঠিক যেমনটি শুনেছিলাম। তার মুখের কথাগুলো হুবহু তুলে ধরছি। বিবৃতি আর বিবরণ তার নিজস্ব।

জীপটা গুটি গুটি এগুচ্ছিলো। জীপে ছিলাম আমি আর শাশ্বতী। লোহিত ডিভিসানে তেজুর আশপাশটা ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম। দু একদিনের মধ্যেই রওনা দেবো তেজু থেকে হাইউলিয়াং-এর পথে। খুব অল্প কয়েক দিন হলো রোয়িং থেকে তেজু এসে পৌঁছেছি। আমি আর শাশ্বতী। ইচ্ছে ছিলো চৌখাম থেকে তেজু যাবো। সম্ভব হলে ডাফাবুম্ রেঞ্জের ওপর দিয়ে। কখনো তিনশো কখনো বা সাড়ে তিন হাজার ফিট ওপর দিয়ে। অজানা অচেনা পথ। নূতনকে জানবার আগ্রহ ছিলো দুজনের। কিন্তু তা আর হয়ে ওঠেনি। লোহিত ডিভিসানের সদর কেন্দ্র তেজু। লোহিত নদীর ধারে। শাশ্বতী জীপ ড্রাইভ করছিলো। শাশ্বতী মিটার। নেফা সরকারের অধীন বোটানিস্ট। অবিবাহিতা, বেপরোয়া, একগুঁয়ে আর জেদী। ফ্লাওয়ার, লতা, গুল্ম খুঁজে বেড়ানো যার একমাত্র কাজ। অর্কিডের নেশা যার প্রচণ্ড। শাশ্বতী ঘুরে বেড়ায় বনে জঙ্গলে। পাহাড়, পর্বত, কন্দরে। খেয়াল খুশী মতো। ভয়, ভাবনা, সঙ্কোচ পুঁটলী বেঁধে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে যে স্বাধীন আর বেপরোয়া। শাশতী তন্বী নয়। তবে ত্রিশের ঘরে বয়স হলেও দেহে রয়েছে নিটোল বাঁধুনি। তার বাঁশীর মতো টিকালো নাক নয়। পটল চেরা চোখ নয়। তবে মুখাবয়াবে যথেষ্ট শ্রী মাখানো রয়েছে। সুঠাম দেহে ঢেউ খেলানো রেখা শাড়ীর ভাঁজে ভাঁজে ফুটে উঠেছে। বোঝা যায় ম্রিয়মাণ যৌবন নয়। শাশ্বতীর থুতনীতে ভাঁজ পড়েছে। ডাবল্ চিন্ আর গালে টোল। দুটোই আমি পছন্দ করি। শাশ্বতীর দুটোই রয়েছে। শাশ্বতীর

কাজল কালো আঁখি। সুর্মা আর কাজলের ধার ধারে না। ওর গ্রীবাভঙ্গী অপূর্ব। নজর আটকে থাকে। শাশ্বতী খোঁপা বেঁধেছে? অনুরাধা, মেঘমল্লার, বুফো, কোনায়ক, ইয়াকমা? জানিনে। তবে এটুকু বলতে পারি চিকুরচর্চায় সে অযথা সময়ের অপব্যবহার করেনি। শাশ্বতী বহুদিন ধরে নেফায় রয়েছে। নেফার বন জঙ্গল পাহাড় পর্বতের সঙ্গে সে এক অচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধা পড়েছে।

পাহাড়ী পথে জীপ চলেছে। বনজুড়ে পাহাড়ের সারি। অনেক অনেক বছর পরে শাশ্বতীর সঙ্গে নেফার এ অরণ্যে দেখা হলো। তাকিয়ে তাকিয়ে ওকে দেখছিলাম। ফর্সা, ছিমছাম। নির্মেদ শরীর। ওকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'এ জঙ্গলে থাকো কি করে?' কেউটে সাপের মতো ফোঁস করে উঠলো শাশ্বতী। বললে, 'বেশ আছি এখানে। অরণ্য, পর্বত, কন্দরে ঘুরে বেড়াতে বেশ লাগে। জনমানবশূন্য অঞ্চলগুলো। কলকোলাহলের বালাই নেই। সহরের চন্‌মনে ভাবটা এখানে নেই। নেই মানুষে মানুষে ছয়-লাপ। তোমাদের ওখানে মানুষের সংখ্যা গোনাগুণতির বাইরে। মানুষের নিরেট সমাবেশের প্রাচীর টপকিয়ে বেঁচেছি। এখানে শান্ত, সমাহিত পরিবেশ। ডামাডোলের বাজার এড়িয়ে বহাল তবিয়তে রয়েছি।' জীপটা ঘনঘন বাঁক নিচ্ছে। ধূসর পাহাড়। অনুর্বর মাটি। সাল্‌ফার, কপার, নিকেল, লাইমষ্টোন্‌, কোবল্ট, মার্বেল বুকে ধরে পাহাড়গুলো দাঁড়িয়ে রয়েছে। আগামী দিনের ভূতত্ত্ববিদ্‌দের জন্যে দিনক্ষণ গুণছে। মনে মনে ভাবছি কতোদিন আর? ভূতত্ত্ববিদ, জীববিদ্যা বিশারদ, উদ্ভিদ্‌বিদ্যা পারদর্শী, প্রত্নতত্ত্ব আর নৃতত্ত্বে উৎসাহী দলের এসে যাবার আর বেশী দিন বাকী নেই। নেফার লোহিতের যবনিকা উঠছে ধীরে ধীরে। ডিবং উপত্যকা আবিষ্কৃত হলো মাত্র ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে। বললাম, 'মেয়ে হয়ে এ জঙ্গলে, এ পরিবেশের ভেতর পড়ে রয়েছো। তোমার কি এ জীবন সাজে?'

'কেন? একলা রয়েছি। বেশ রয়েছি। স্বাধীন জীবন। বিয়ে করে স্বামী, পুত্র কন্যার জোয়াল্ ঘাড়ে নিয়ে ভারবাহী পশুর মতো ঘুরে বেড়ানোটাই কি সকলের জীবনের আদর্শ হবে? নীতি আর আদর্শের ঢালা রাস্তায় ছুটোছুটি না করে একটু এদিক সেদিক করলে দোষটা কোথায়। অন্যদের চেয়ে খানিকটা ফারাক্ হলে মন্দটা কিসে! হলামই বা একটু অন্য রকম। হলাম ডাঁক-সাইটে। খানিকটা বেপরোয়া। আর যদি ছেলে মেয়ের প্রভেদের প্রশ্নটা তোলো তবে বলবো ছেলে মেয়ের পার্থক্যের জগদ্দল বোঝাটা কতোদিন আর বুকে চেপে থাকবে। ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিলেই মঙ্গল। তাতে পৃথিবী যদি রসাতলে যায় যাক্ না। দেখি না কতোটা রসাতলে যায়। মেয়েরা সমুদ্রের নীচে যাবে। আকাশে উড়বে। চাঁদে যাবে। পর্বতের শিখরে উঠবে। সিংহাসনে বসবে। ভূগর্ভে উঁকিঝুঁকি দেবে। প্লেন ভেঙ্গে চুরমার হোক্। মেয়েরা পর্বত শিখর থেকে গড়িয়ে পড়ুক্। সিংহাসন থেকে কাত হয়ে পড়ে যাক। হাড় পাঁজর মজবুত হোক। চিন্তাধারায় মেয়েরা ঝড় তুলুক। যুগান্তকারী পরিবর্তনে মেতে উঠুক। ভেবে ছাখো, জন্মশাসনের ব্যাপারে লজ্জাসরমের মাথা খেয়ে মেয়েরাই প্রথম এগিয়ে এসেছিলো। আমেরিকায় জন্মশাসনের নেতৃস্থানীয়া প্রবক্তা ছিলেন শ্রীমতী মারগারেট স্যাঙ্গার। তিনি ১৯১৬ সালে জন্মশাসন ক্লিনিক্ খোলেন এবং এজন্য তাঁকে একমাস কারাদণ্ড ভোগ করতে হয়েছিলো।' জীপ চলেছে। ড্রাইভ করছে শাশ্বতী। একটি সুউচ্চ মালভূমির ওপর দিয়ে জীপ চলেছে। আশেপাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে বয়োবৃদ্ধ দেওদার, পপেলার। ওকগাছ রয়েছে আর রয়েছে দীর্ঘ পাইন্‌বন। অনেক নীচে সমতল ভূমিতে রয়েছে সাল, সেগুন, আবলুস আর মেহগিনি।

শাশ্বতী বললে, 'সিনকোনা গাছের চাষ হয় এখানে। ওই গাছের ছাল থেকে কুইনাইন্ প্রস্তুত হয়। পাইন্ গাছের আঠা

থেকে হয় ধূনো। খাড়া পাহাড়ের ঢালে ঝুম্ ক্ষেতিতে ব্যস্ত মিস্‌মী ছেলেমেয়েরা। মিস্‌মী মেয়েদের পোষাক পরিচ্ছদে যথেষ্ট বৈচিত্র্য রয়েছে। বর্ণচ্ছটা চোখ ধাঁধায়। মিসমীরা জাত তাঁতী। বুনতে সিদ্ধ হস্ত। মিস্‌মী কোটের সুনাম রয়েছে সর্বত্র।

শাশ্বতী বলে, 'জানো, ভারতসরকারের সৈন্যবাহিনীতে মেয়ে বাহিনী থাকলে মন্দ হতো না। সম্পূর্ণভাবে মেয়ে দ্বারা পরিচালিত হবে এ বাহিনী। মেয়েদের দুচারটে রেজিমেন্ট থাকবে। হবে আমর্ড টু দি টিথ্।'

'তোমার ইচ্ছেটা ভারত সরকারকে জানাবো।'

'ষষ্ঠ দশ শতাব্দীতে বিজয়নগর সাম্রাজ্যে কৃষ্ণদেব রায়ের রাজত্বকালে মেয়ে সৈন্যবাহিনী ছিলো। যুদ্ধ বিদ্যায় হ্যাণ্ড্রেড পার্সেন্ট্ পারদর্শী। অসিচালনা, অশ্বপৃষ্ঠ থেকে যুদ্ধ, শারীরিক নানারকম কসরৎ, কোনোকিছু থেকে পিছিয়ে আসা বারণ ছিলো। উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে পাঞ্জাব কেশরী রণজিৎ সিংহের সৈন্যবাহিনীতে যুদ্ধ বিদ্যায় পারদর্শী নারী বাহিনী ছিলো। অযোধ্যার নবাবের রাজত্ব কালে অর্থাৎ উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে নবাবের প্রাসাদ নারী রেজিমেন্টের সৈন্য দিয়ে পাহারা দেওয়া হতো।'

আমি আরো একটু বলে কেসটা জোড়দার করি: 'নেতাজীর সৈন্যবাহিনীতে, মেয়ে রেজিমেন্ট ছিলো। তোমার এ মিনতি মনে হয় ভারত সরকার টার্নডাউন করবে না।' কথাটার সঙ্গে বোধকরি হাল্কা সুর মেশানো ছিলো। শাশ্বতী কটমট করে আমার দিকে তাকায়।

'এখান থেকে পাততাড়ি গুটোবে কবে?' ওকে আমি জিজ্ঞাসা করি।

'যদি বলি কখনোই নয়। নেফার মাটি কামড়িয়ে পড়ে থাকবো। তোমাদের সহর বন্দরের প্রতি আমার লোভ নেই। আমার সমস্ত মায়া মমতা নেফার অরণ্য আর মাটির জন্যে।' জবাব দেয় শাশ্বতী।

'সেকি কথা। এক অন্ধকার জগতে মুখ থুবড়ে পড়ে আছো। সভ্যতার দিকে পেছন ফিরে রয়েছো। লেখাপড়া শিখে এই কি তুমি চেয়েছিলে?' আমার মনে হয় তুমি বরণ করেছো এক মানসিক মৃত্যু।'

'আমি কিন্তু ঠিক উল্টোটা মনে করি। এখানে যারা রয়েছে তারা তথাকথিত সভ্যতা আর প্রগতির নিশান উড়িয়ে ডঙ্কানিনাদে মেতে ওঠে না। তোমাদের সভ্যতার ওপর আমার আস্থা নেই। তোমাদের সভ্যতায় ভেজাল রয়েছে। সোনার ভেতর খাদের পরিমাণ অনেকগুণ বেশী। এখানে কায়দা আর কেরামতি দেখাবার অপচেষ্টা নেই। ভড়ংবাজীর স্কোপ অনেক কম। তোমাদের ওখানে বিপন্ন সভ্যতা পড়ে পড়ে মার খাচ্ছে। তোমাদের ওখানে হাঙ্গামা হুজ্জতি বড্ডো বেশী। অঞ্চলগুলো উপক্রুত। তোষণ, নিপীড়ন, অকাজ, কুকাজ বড্ডো বেশী।'

'এখানে সময় কাটাও কি করে?'

'ডক্টর মার্টিন লুথার কিং এর নিগ্রোদের সিভিল রাইটস্ সম্বন্ধীয় বক্তৃতার পাতা ওলটাই। কাফ্কা, ক্যামু সার্তর জীবন দর্শন আলোচনা করি। জঁা পল্ সার্তর অনুবাদ পড়ি। নয়তো পাঠ করি টলস্টয় আর ডস্টয়েভস্কির অনুবাদ। নিয়ে বসি আরনেষ্ট হেমিংওয়ের কিংবা টি. এস. এলিয়টের বই। পড়ি রবীন্দ্রনাথ নয়তো তারাশঙ্কর। পাব্লো পিকাসোর চিত্রকলার দিকে তাকিয়ে রহস্য উদ্ঘাটন করি। এ ছাড়া রয়েছে বোটানিস্টের কাজ। ফুলপাতা নিয়ে রিসার্চ করি।' বাইসনের একটা দল চলেছে। শাশ্বতী ষ্টীয়ারিং হুইলে মোচড় দিয়ে গাড়ীর মুখ ঘুরিয়ে দেয়। বড্ডো একরোখা জানোয়ার। জীপটা পাহাড়ের গা বেয়ে গুবরে পোকার মতো ধীরে ধীরে নামছে। নেমে সমতলভূমিতে পড়েছে। দুদিকে গভীর জঙ্গল। আঙুল দিয়ে শাশ্বতী দেখায় ওয়াইল্ড ফ্ল্যামিন্ গো। পাহাড়ের সারি প্রাচীরের

মতো দাঁড়িয়ে জলের উপর ছায়া ফেলেছে। প্রশ্ন করি, 'আচ্ছা তোমাদের শাসনে ওরা খুশী কি? ওরা মানে এখানকার বাসিন্দারা।'

'খুশী কিনা বলতে পারবোনা। তবে প্রশাসনিক দুর্বলতা নিয়ে তোমাদের সহরের মানুষগুলোর মতো মন কষাকষি নেই। কথার কচ্‌কচানি নেই। নেই ভাষার মার প্যাঁচ। যা বলবে লোকগুলো সোজাসুজি বলবে। সব কিছুতে দুর্বোধ্য বনবার অপচেষ্টা নেই। তোমাদের সহুরে লোকগুলোর শুধু বাকপটুতা সর্বস্ব। আয়োজন আর ঠাঁটের বাহার আছে। ভেতরটা সব ফাঁকা। কাজের চেয়ে কথা বেশী। কাজের বেলা অষ্টরম্ভা। লোকগুলো ভাঁওতা দেবার তালে সদা সর্বদা ঘুরে বেড়ায়।'

জীপ চলেছে। কেওড়া গাছের ডালে ঘুঘুটা অবিশ্রান্ত ডেকে চলেছে। ঘাসের মধ্যে গ্ল্যাডিওলা ফুল হাওয়ায় দুলছে। তাকিয়ে দেখছি ফুলের বাহার। ডেইসী, ডালিয়া, মাউন্টেন্ এবনি, টিউব রোজ, লেডিজ লেস্ ও ক্যালিওপ্‌সিসের অপূর্ব বর্ণচ্ছটা আর বর্ণ বিন্যাস। আমার চোখের সামনে ভেসে বেড়াচ্ছিলো সেই ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল! ঢলঢলে মুখখানি। স্কুলের গেটের কাছে শিউলি গাছের নীচে মেয়েটা ফুল কুড়োচ্ছিলো। কতো বয়েস। বারো কি তেরো। নির্জন পরিবেশ। এমন সময় তিনটে ছেলে, খুব সম্ভব ওরা কাছের বস্তীতে থাক্‌তো, হঠাৎ এগিয়ে এসে মেয়েটিকে ঘিরে দাঁড়ালো। তারপর নোংরা কথা ছোঁড়াছুড়ি সুরু করলে। অল্পক্ষণের ভেতরই গড়ে তুললে একটা নোংরা, অশ্লীল পরিবেশ। মেয়েটির মুখে শঙ্কার ছায়া। চোখে বিহ্বল দৃষ্টি। ছেলে তিনটে ওকে ঘিরে রয়েছে। বেরুবার পথ পাচ্ছে না মেয়েটি। আমি সেদিনের সেই ক্ষীণ, দুর্বল ছেলেটি ভোরের বিশুদ্ধ হাওয়াতে স্বাস্থ্যটা ঝালিয়ে নিতে বের হয়েছিলাম। মেয়েটি একটি ভীরু পাখীর ছানার মতো জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। আমার দিকে সে চোখ তুলে বার কয়েক তাকাল।

আমার সাহায্য ভিক্ষা করছে সে। আশেপাশে কেউ নেই। স্রোতস্বিনীর তীব্র স্রোতে মেয়েটি যেন ভেসে যাচ্ছে। হাতের কাছে খড় কুটো যা পাওয়া যায় তাই সে আকড়িয়ে ধরতে চায়। দুর্বল ছেলেটি মুহূর্তের জন্যে নিজের অদৃষ্টের কথা, ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করলে না। ঝাঁপিয়ে পড়লে তিনটি গুণ্ডা ছেলের ওপর। ঠিক যেন একটা মেষ শাবকের তিনটে চিতে বাঘের সঙ্গে লড়াই। প্রচণ্ড মার খেলো সে। ঠোঁট কাটলো। জামাকাপড় ছিঁড়লে। মুঠোমুঠো চুল মাথা থেকে খসলো। মারের ছোটে সারা শরীর টন্‌টন্‌ করতে সুরু করলে। তবু ও এক অনির্বচনীয় সুখ। দুর্বল ছেলেটি যুদ্ধ করেছে। অন্যায়, অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে। পৃথিবীর অনেক সমস্যার সমাধান হয়ে যেতো যদি এই ভাবে রুখে দাঁড়ানো যেতো।

আরো সুখের কথা, মারপিটের সুযোগ নিয়ে মেয়েটি পালিয়েছে। পালিয়েছে নেকড়ে বাঘগুলোকে বোকা বানিয়ে। সেই সকালবেলাটিতে মেয়েটির দোতালার বারান্দার নীচে এই ছেলেটি রুমালে ঠোঁট চেপে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলো। মনে আশা যদি মেয়েটি ডেকে ওপরে নিয়ে যায়। তার কাছে খানিকটা সময় বসতে বলে। দুটো মিষ্টি কথা বলে। আঘাত পাওয়া স্থানের চারপাশটা তার চাঁপাকলি সদৃশ্য আঙ্গুল দিয়ে খানিকটা সময় বুলিয়ে দেয়। এসব যদি একান্তই কিছু না ঘটে তাহলে অন্ততঃ ওদের বাড়ীর জানালা থেকে দুটি চোখ ছেলেটির দিকে খানিকটা সময় তাকিয়ে থাক। দৃষ্টিতে মাখানো থাক কৃতজ্ঞতা আর সম-বেদনা। না কিছুই হলো না। ঘটলো না কিছু। ছেলেটি নিরাশ হয়েই সেদিন ঘরে ফিরে গেলো। কেউ এলো না। কেউ কাছে ডাকলে না। জানালায় দেখা গেলো না দুটি উৎসুক নয়ন। দুটি ছোট্ট জলে ভেজা চোখ। সমবেদনায় কাঁদলে না কেউ। সেদিনকার ঐ মেয়েটির সঙ্গে আজকের এ মেয়েটির অনেক প্রভেদ। দুটি ভিন্ন

ছবি। সে চোখ আর আজকের এ চোখে অনেক পার্থক্য। সে চোখ দুটিতে সেদিন ছিলো পিলসুজের আলোর ছটা। আজ ও চোখদুটিতে সার্চ লাইটের ঝলকানি।

শাশ্বতীকে বললাম সব কিছু। খানিকটা তার জানা ছিলো। মনে করিয়ে দিলাম সেটুকু। বাকীটুকু শোনালাম: 'আমি আমার ঘরে টিনচার আইডিন, তুলো নিয়ে অনেকক্ষণ বসেছিলাম। ভেবেছিলাম তুমি আসবে। বসবে। শুনবে। জানবে। ভালোবাসবে। আমার গুপ্তভাণ্ডার থেকে সেদিন বের করেছিলাম তিলের নাড়ু। মুড়ির মোয়া আর নকুলদানা। ভেবেছিলাম তোমাকে খেতে দেবো। বসে বসে দেখবো তোমার খাওয়া। খেয়ে ওঠার পর জল দিয়ে তোমার হাত ধুইয়ে দেবো। তুমি কিন্তু এলে না। মনে প্রচণ্ড অভিমান হলো।' একি শোনালে শাশ্বতী। এতোদিন পরে নেফার জঙ্গলে এসব কি কথা বললো শাশ্বতী। এসব কি সত্যি? একসঙ্গে এতোগুলো মিষ্টি কথা। এ শোনার জন্যে কি দিন গুনছিলাম। নেফার জঙ্গলে জীপের ভেতর শাশ্বতীর পাশে বসে আছে এক পরম সৌভাগ্যবান পুরুষ। বহুদিনের পুরোনো ক্ষতটার ওপর কেউ যেন বুলিয়ে গেলো সান্ত্বনার প্রলেপ। নেফা তুমি সত্যি সুন্দরী। দয়ামায়াতে তুমি ভরপুর।

আমি বলি, 'সহরের সভ্যতার ওপর তোমার দেখতে পাচ্ছি পুঞ্জীভূত ক্রোধ। মনে হচ্ছে নেফার ওপর তোমার অশেষ দুর্বলতা। নেফা তোমাকে যাদু করেছে।'

'তোমাদের সহুরে সভ্যতায় সর্বব্যাপারে কেবলমাত্র চৌর্য্যবৃত্তি। আর্ট্ কালচারের নামে যৌবনের নিলর্জ্জ মাতন। পরকীয়া প্রেম যেন কালচারের মাপকাঠি। শুধু অবৈধ প্রেম।' পাহাড়ী পথে গাড়ীর স্পীড বাড়িয়েছে শাশ্বতী। ওকে চটাবার জন্যে বলি, 'ওই যে তোমার বাংলোতে ট্রাইবল লোকগুলোকে একফালি ন্যাকড়া সামনে ঝুলিয়ে ঘুরতে দেখলাম ও দেখে তোমার

লজ্জা করে না। ওদের শিখিয়ে পরিয়ে সভ্যভব্য করে নিতে পারো না?'

'কেন, সহরে বন্দরে মেয়েগুলো যে পেট, বুক, নিতম্ব দেখিয়ে বাহাদুরী লুঠবার চেষ্টায় রয়েছে। পুরুষের যৌন আকাঙ্খার গোড়ায় সুড়সুড়ি দিচ্ছে। তাদের কিছু বলছো না কেন? এখানে যারা নগ্ন তারা সহজ সরলভাবে নগ্ন। মাতৃকোলে নগ্ন শিশু সুন্দর। প্রকৃতির কোলে অনাড়ম্বর, অল্প বেশভূষায় সজ্জিত, সরল সহজ মানুষগুলো তেমনি সুন্দর। হনোলুলুতে কিংবা অন্য কোনোখানে কেউ টপ্‌লেস্ হলে মুহূর্তে তোমাদের কাগজ-গুলোতে হেডলাইন সহ ফলাও করে তা ছাপা হয়। ছাপা হয় সেই সুন্দরীর ছবি যিনি টপলেস্ হয়েছেন। তার হাত পা কোমর ধরে টানা হেঁচড়া সুরু হলো। পাবলিসিটির জোরালো আলোয় উনি বটম্‌লেস্ হলেন। প্রশস্তি, স্তুতিবাক্যের ঠেলায়, সম্মান, প্রতি-পত্তির জৌলুসে চোখ ধাঁধিয়ে, টাকার চোরাবালিতে হাবুডুবু খেতে খেতে শেষ পর্য্যন্ত উনি ন্যুড হলেন। মহাভারতে একজন দ্রৌপদীর বস্ত্র হরণের চেষ্টা হয়েছিলো তা শেষ পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণের দয়া দাক্ষিণ্যে আর তাঁর ভেলকির মাহাত্ম্যে সম্ভব হয়নি। এখানে তোমাদের সহরে শত শত দ্রৌপদীকে টাকার ভেলকি দেখিয়ে দুঃশাসনের দল ন্যুড করে ছাড়ছে। তোমাদের নাইট ক্লাবগুলোতে ষ্ট্রীপ্‌ষ্টীজের বিজয় উল্লাস। সহরের পথেঘাটে, উৎসব মণ্ডপের আশেপাশে, তোমাদের মাবোনেরা বন্যা, মহামারী, দুর্ভিক্ষের কশাঘাতে ধুঁকছে। ন্যুড করতে হয়নি। বস্ত্রের অভাবে নিজেরাই ন্যুড হয়ে পড়ে রয়েছে। তোমরা বারোয়ারী পূজোর প্যাণ্ডেল সাজাচ্ছো। জাঁকজমকে পাল্লা দিচ্ছে একের সঙ্গে অন্যে। দুর্গা প্রতিমার মুখের ভিতর খুঁজে বেড়াচ্ছো নিজেদের প্রিয় চিত্রতারকাদের মুখের আদল। কোর্টে কেস্ উঠলে কালী আর দুর্গামাকে তোমাদের মনে পড়ছে। ছেলে মৃত্যু শয্যায় শায়িত থাকলে পূজোর নৈবেদ্য

ভোগ নিয়ে ছুটছো মার মন্দিরে। রেসের ঘোড়ার বাজী মাৎএর জন্যে দৌড়ুতে হচ্ছে শিব নয়তো কালী মন্দিরে। সহরে বন্দরে ষ্ট্যাটিস্‌টিক্ নাড়াচাড়া করে দেখো বারবণিতার সংখ্যা কতো দাঁড়ায়। বিভিন্ন রূপে, বিভিন্ন সজ্জায়, বিভিন্ন ভঙ্গীতে কর্তৃপক্ষের চোখকে ফাঁকি দিয়ে তারা আসরে নেমেছে। এখানে নেফার এ অরণ্য প্রান্তরে এসব তুমি খুঁজে পাবে না। আর যতোদিন তুমি খুঁজে পাবে না ততোদিনই এ স্থান পবিত্র। বাস করে আরাম।'

জীপটা যেভাবে বাঁক ঘুরছে শাশ্বতীকে সতর্ক করে দিলাম। ডান হাতে কিছুটা দূরে গভীর খাদ। একটু অন্যমনস্ক হলেই জীপ্ ছিট্‌কে পড়বে খাদের ভেতর, তখন আমাদের একটি হাড়ও খুঁজে পাওয়া যাবে না। বাঁহাতে পাহাড়ের সর্বত্র, ভাঙ্ গাছের জঙ্গল। ভাঙ্ গাছ ছ'ফিট পর্য্যন্ত উঁচু হয়। এ থেকেই চরস তৈরী হয়। টিরাপে নক্টে, ট্যাংসা আর সিংফো ট্রাইব অধ্যুষিত এলাকার সর্বত্র পপিগাছের জঙ্গল রয়েছে। এগাছ নেশাতে বুঁদ হবার মালমশলা যোগায়। শাশ্বতীর তপ্তকাঞ্চন বর্ণ। সুগঠিত সুগোল ললাটে বারবার উড়ে পড়ছে অলক গুচ্ছ। ওর পরণে ঢাকাই শাড়ী। সাদামাঠা পোশাক। কপালে কাঁচপোকার টিপ। এলো খোঁপাটা কাঁধের ওপর ভেঙ্গে পড়েছে। ওর এক হাত ষ্টিয়ারিং হুইলের ওপর রয়েছে। মণিবন্ধে ছোট্ট এইটুকুন একটি ঘড়ী। ওর মুখে অনাবিল হাসি। ব্লুথ্রোট্ বা নীল পাখীটা গাছের ডালে কি যেন ঠুকরে ঠুকরে খাচ্ছে।

'ওই যে বাঁশপাতা দেখছো ওর একমুঠো গরুকে খাইয়ে দিলে রাতারাতি গরু অনেক বেশী দুধ দেবে।' বোটানিস্ট শাশ্বতী গাছপালা, লতাপাতা সম্বন্ধে অনেক খোঁজ খবর রাখে।

'কিন্তু ওই বাঁশের ঝাড় আর বাঁশ কাটতে যেয়োনা কখনো। বিপদে পড়বে। এখানে ট্রাইবের কোনো লোকের মৃত্যু হলে ঐ বাঁশ ঝাড়ের দরকার পড়ে। তুকতাক্, ঝাড়ফুক্ প্রভৃতির জন্যে

দরকার পড়ে। বাঁশ চেছে বেতের তৈরী নানারকম বস্তু ওরা বানায়। মন্ত্র পাঠ করে ওগুলোকে করে তোলে মন্ত্রপূত। তখন দোর গোড়ায় ঝুলিয়ে দেয়। অপদেবতা, ভূত প্রেতের হাত থেকে বাঁচবার জন্যে ব্যবস্থা নেয়।' বলি আমি। নেফা সম্বন্ধে ইদানীং জ্ঞান আমার অনেকটা বেড়েছে।

সমতলভূমির ওপর দিয়ে জীপ্ চলেছে। শাশ্বতী ঝোপঝাড়ের দিকে হাত তুলে বলে, 'ওই দেখো বেতো শাক। লিভারের ওষুধ। এরপর তোমাকে চিনিয়ে দেবো পটোল পত্র। পিত্তদোষ ভালো করে। আর চেনাবো গুলঞ্চ পত্র। বায়ুনাশ করে।'

'চিকিৎসে বিজ্ঞানের দিকে ঝুঁকেছো বলে মনে হচ্ছে। আয়ুর্বেদীয় শাস্ত্র নিয়ে নাড়াচাড়া করছো।' শাশ্বতী মাথা দুলিয়ে আমাকে সমর্থন করে।

কতোক্ষণ দুজনেই চুপ করে আছি। খানিকক্ষণ পরে শাশ্বতী বলে, 'জানো তোমাদের সভ্যতা আজ বিপন্ন। সভ্যতা এগুচ্ছে না পেছুচ্ছে বলা মুস্কিল। লোভ, হিংসা, দ্বেষ, হানাহানি। ছলচাতুরী, প্রবঞ্চনা নিয়ে সভ্যতার অগ্রগতি বাধা পেয়েছে। দলগত, শ্রেণীগত স্বার্থের মারপ্যাঁচে পড়ে সাধারণ মানুষগুলো নাজেহাল হচ্ছে। আইডিয়ালিজিমের ধোঁয়ায় লোক বিভ্রান্ত। রাজনীতির বুলি কপচিয়ে মানুষগুলো চরম দুর্গতির পথে। একমুঠো ভাত, মোটা বস্ত্রখণ্ড আর মাথার ওপর একটা আচ্ছাদন সংগ্রহের চেষ্টায় লোকগুলো হাবুডুবু খাচ্ছে। পাথর ও অন্যান্য বস্তুর সঙ্গে ভেজালরূপে যে তণ্ডুলকণা দেওয়া হচ্ছে তার নাম চাল এবং তারই জন্যে লাইন আর কিউ। তোমাদের ওখানে চুরি, রাহাজানি, ছিনতাই এর খবর ফলাও করে ছাপা হয়। যে যার নিজের সাফাই গাইছে। তোমাদের ওখানে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে লোক মেরে আনন্দ উপভোগ করে। এখানকার জঙ্গলে বাঘের পেট ভরা থাকলে সে অকারণে মানুষ মারেনা। এখানে চাওয়া পাওয়ার জোর তাগিদ নেই। তোমাদের ওখানে

চাওয়া-পাওয়ার শেষ নেই। আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি নেই। ওখানে সব কিছুরই চুলচেরা বিচার। তিলকে অতি সহজে তাল করা হয়। তোমাদের ওখানে খোল, করতাল বাজিয়ে জেলী, কন্‌ডোম্‌, আর এ্যাবরসনের কীর্তন সুরু হয়েছে। লজ্জা সরমের মাথা খেয়ে ওর আলোচনায় যুবক, কিশোর, কিশোরী আর যুবতী সোচ্চার। সবকিছু সহজ সরলকে জটিল আর বীভৎস করে ছেড়েছে। এখানে নীরবে নিভৃতে গাছ গাছড়ার শিকড় বাকড় খেয়ে ফ্যামিলি প্ল্যানিং হয়। ঢাকঢোল বাজায় না কেউ। মা মেয়েকে গোপনে সবকিছু শিখিয়ে দেয়।' শাশ্বতীর কথাবার্তা কেমন যেন বেপরোয়া। আর গাড়ীও চালাচ্ছে সে বেপরোয়া ভাবে। পাহাড়ের বাঁক ঘুরছে তীব্র বেগে। ডানদিকে গভীর খাদ। নীচের দিকে তাকালে মাথা ঘোরে। শিশির ধোঁয়া সকাল। রৌদ্রস্নাত পৃথিবী। বিচিত্র বর্ণ সমাবেশ নিয়ে স্টর্কের দল পাহাড়ের গায়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আগাছা আর জঙ্গলের ভেতর সোয়াম্প ডিয়ার আর ব্ল্যাক বাক্‌। এক দৃষ্টিতে স্রোতস্বিনীর দিকে তাকিয়ে রয়েছে। সজাগ আর সতর্ক। মাথার ওপর কপোত কপোতীর দল উড়ে চলেছে। বার্তাবাহী কপোত-কপোতী। এসব কপোত-কপোতীর সাহায্যে দুর্গম এলাকায় বার্তা পাঠানো হয়। শূন্য পরিক্রমা রত পায়রা পিওন।

'জানো এ অরণ্যে দীর্ঘকাল বাস করে মাঝে মাঝে আমার কি ইচ্ছা হয়?' বলে শাশ্বতী।

'কি ইচ্ছে?' আমি জিজ্ঞাসা করি।

'ইচ্ছে হয় মুর্শিদা গান, পাঁচালী আর কথকতা শুনতে। যাত্রা দেখতে খুব ইচ্ছে করে। ইলিশ মাছ ভাতে সেদ্ধ করে খেতে ইচ্ছে করে। লালপাড় শাড়ী পরণে, নথ্‌ নাকে, টুকটুকে কচি বউ দেখতে ইচ্ছে করে। চাঁটগাঁএর লোকের হাতে কট্‌কটে ঝাল দেওয়া শুঁটকী মাছের ব্যঞ্জন্‌ খেতে ইচ্ছে করে। অনেক দিন খাইনি। জমকালো দুর্গোপূজো দেখতে ইচ্ছে করে। গলায় আঁচল্‌

দিয়ে কাউকে প্রণাম জানাতে ইচ্ছে করে। খোকার তুলতুলে গাল টিপতে ইচ্ছে করে।' শাশ্বতীর কেমন যেন বিহ্বল দৃষ্টি।

'সবকিছু মনইচ্ছে পূরণ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তবে গলায় আঁচল দিয়ে তুমি আমাকে প্রণাম করতে পারো।' বলি আমি।

'ধ্যেৎ।' বলে শাশ্বতী।

বললাম, 'জানো যখন কলেজে পড়তাম তখন তোমাদের আর আমাদের বাড়ী ছিলো একেবারে পাশাপাশি। সাগ্রহে তোমার জানলার দিকে তাকিয়ে থাকতাম। কবে তুমি ছোট্ট একখানা চিঠি আমার উদ্দেশ্যে আমাদের ছাদে ছুঁড়ে দেবে। কতো রাতে স্বপ্ন দেখেছি তুমি চিঠি ছুঁড়ে দিয়েছো। চিঠি ছুঁড়েছো আমাদের বাড়ীর ছাদে। চিলে কোঠায় সযত্নে চিঠির ভাঁজ খুলে আমি পড়তে সুরু করেছি। এতোটুকুন চিঠি। কিন্তু আমি পড়েই যাচ্ছি। পড়ছি আর পড়ছি। চিঠি পড়া যেন আর শেষ হচ্ছে না। স্বপ্নের ভেতরও বেশ বুঝতে পারছি এ যেন নেহাৎই অসম্ভব। এতোক্ষণ ধরে পড়ে যাচ্ছি অথচ চিঠি শেষ হচ্ছে না। অতোটুকুন ছোট্ট একটা চিঠি। আমার পড়া যেন আর শেষ হচ্ছে না। কথা আর কথা। ছোট্ট চিঠিতে হাজার হাজার কথা। ছেপে বের করলে হয়তো দুশো পাতার বই হয়ে বেরুতো। ঘুম ভেঙ্গে যায়। মনে মনে ভাবি বরাত ভালো ঘুম ছিলো, স্বপ্ন ছিলো, না হলে তোমার চিঠি পেতাম না। এতোক্ষণ ধরে চিঠি পড়া হয়ে উঠতো না। কিন্তু তুমি আমাদের ছাদে চিঠি কোনোদিনই ছুঁড়লেনা। বৃথাই তোমার চিঠির জন্যে আকুল হৃদয়ে অপেক্ষা করলাম। কিন্তু সেই চিঠি শেষপর্য্যন্ত তুমি ছুঁড়লে। কিন্তু আমার ছাদে নয়। তোমার প্রতিবেশী অন্য একটি ছেলের ছাদে। বুক ভরা অভিমান নিয়ে সারাটা সন্ধ্যে ঘুরে বেড়ালাম। চোখ থেকে ছুটলো কান্নার বন্যা।'

'সে চিঠি ছুঁড়ে ছিলাম তোমারই উদ্দেশ্যে।' বলে শাশ্বতী।

'মিথ্যে কথা। আমার চিঠি ওদের ছাদে।'

'তোমার মাকে ভীষণ ভয় পেতুম। তাই ওদের ছাদে। ধরা পড়লে ওর মা ক্ষমা করবেন বলেই ভেবেছিলুম।'

'আমি বিশ্বাস করি নে। চিঠি কোনো দিনই আমার হাতে পৌঁছয়নি,' আমি জবাব দিই। শাশ্বতী বলে, 'আমি কি করে বুঝবো ছেলেটি তোমার একজন প্রতিদ্বন্দ্বী। আমার কাছে তার মনটা উজাড় করে ঢেলে দেবে। সব কিছু সঁপে দেবার জন্যে উৎসুক আর ব্যগ্র হবে। শান্তশিষ্ট ছেলেটিকে আমি ভুল বুঝেছিলাম। একটি চিঠির বদলে সে দশটি চিঠি লিখেছিলো।'

'তুমি গলে জল হয়ে গিয়েছিলে। তুমি যে পুরোপুরি নিরাসক্ত ছিলে একথা আজও আমি বিশ্বাস করতে পারছিনে।'

'বেশ। বিশ্বাস করো না আমার কথা। কিন্তু ভেবে দেখো তুমিও ছুঁড়তে পারতে একটা চিঠি। মনের কথাগুলো কাগজে মুড়ে শূন্যে ছুঁড়ে দিতে পারতে। একরাশ কথা, আবেগে ডোবানো, লজ্জা সরম মেশানো, শঙ্কা দ্বিধায় জড়ানো—জানালা গলে ঝুপ্ করে আমার কোলে এসে পড়তো।' বলে শাশ্বতী।

'তোমার বাবা ছিলেন জাঁদরেল উকিল। রাশভারী লোক। আমার প্রাণে ছিলো প্রচুর ভয়।' শাশ্বতী জীপ থামিয়েছে। ড্রাইভারের সীটের নীচ থেকে বের করেছে মদের বোতল। স্কচ্, জিন্ না হুইস্কী? আমি বলতে পারবো না। ওরা আমার সম্পূর্ণ অপরিচিত। ছোট্ট গ্লাসে ঢেলে শাশ্বতী আমাকে ড্রিঙ্কস্ অফার করে। আমি মাথা নেড়ে না করি।

'তুমি মদ খাও?' ওকে জিজ্ঞেস করি।

'হ্যাঁ খাই।' পর পর দুপেগ্ উড়িয়ে দেয় শাশ্বতী।

'প্রথম প্রথম মনটা ছি ছি করতো। এখন আর করে না। সব কিছু দিব্যি ভুলে থাকা যায়।' শাশ্বতী সিগারেট ধরিয়েছে।

আমাকে দিয়েছে একটা। একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে সে জীপে ষ্টার্ট দিলে। আমি শাশ্বতীর দিকে তাকিয়ে রয়েছি।

'শাশ্বতী, মন্দ লাগছে না তোমার অরণ্য রাজ্যের এ গুণ-কীর্তন। তুমি নেফার যোগ্য পাবলিসিটি অফিসার।'

'আরো শুনতে চাও। তবে শোনো নেফার গুণকীর্তন। তোমাদের শহরের অপযশ। এখানকার অধিবাসীরা সম্মুখযুদ্ধে বিষাক্ত তীর ছুঁড়ে মানুষ মারে। তোমাদের মতো পেছন থেকে আচমকা ছুরিকাঘাত করে না। তোমরা ওষুধে, দুধে, তেলে, ঘিএ ভেজাল দিয়ে ধীরে ধীরে জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটাচ্ছো। স্লো পয়জেনিং এ্যাণ্ড আলটিমেট্‌লি ডেথ্‌। তোমরা ডেকে আনো স্নায়বিক দুর্বলতা। পক্ষাঘাত রোগ। হার্টকে করে দাও পঙ্গু, অকেজো। ডেমোক্রেসীর নামে সবই সম্ভব। টিপ সই দিয়ে তোমাদের ওখানে গদীতে বসা যায়। রক্‌বাজী নয়তো গলাবাজি করে তোমরা ডেমোক্রেসীর গুণকীর্তন করো। তার মহিমা প্রচার করো। তোমাদের ওখানে শুধু কমিশন আর কমিটি। প্রকল্পের ধূম ধাড়াকা। আন্দোলন, হরতাল, ছাঁটাই। লকআউটের ছড়াছড়ি। সহঅবস্থিতি অসম্ভব। ঠাণ্ডা লড়াই চালিয়ে যাচ্ছো অনবরত। তোমাদের ওখানে শুধু মিছিল। জমায়েত আর ভাষণের ছড়াছড়ি। নীতি আর আদর্শের গুঁতোগুঁতি। পুঁজিবাদী আর সমাজবাদীর মধ্যে অন্তবিহীন মুষ্টিযুদ্ধ। বৈঠকে কেউ বসতে রাজী নয়। সবাই শুধু পায়তারা কষে। অর্থনীতির কাঠামো ভেঙে ফেলার হুমকি। ব্যাপক বেকারি। উৎকোচকে তোমরা বলো উপরি। মুনাফাকারী, চোরাকারবারীদের শুধু কেরামতি আর কায়দা। একদিকে মগজে পুরে পুরে ক্লান্ত হচ্ছো। অন্যদিকে মগজ ধোলাই হচ্ছে। বিক্ষোভ আর অশান্তির ঢেউ সর্বত্র। শ্লোগানে শ্লোগানে সহরের আকাশ বাতাস সোচ্চার। দিনে রাতে কুশপুত্তলিকা দাহ। মোট কথা

তোমাদের ওখানে সভ্যতা, সংস্কৃতি, কৃষ্টি, ঐতিহ্য সব বিপন্ন। শান্তি খুঁজে খুঁজে লোকগুলো হয়রাণ। শুধু মৌরুসী পাট্টা সম্বল করে জাঁকিয়ে বসবার মতলব। একের অন্যের প্রতি বিমাতাসুলভ আচরণ। একই বুলির হেরফের। শিক্ষা যতো পাও ততোই নিজেদের ওপর আস্থা হারাও। খালি চুলচেরা বিচারের প্রবৃত্তি। চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি দাঁড়াবার শক্তি নেই তোমাদের। তোমাদের ওখানে শান্তি, আরাম, আয়েশ, যেন মানুষের সবচেয়ে অবাঞ্ছিত বস্তু। আমাদের এখানে, অরণ্যে ভরা রাজ্যে সমৃদ্ধি না থাকতে পারে, শান্তি আছে। আয়েশ এখানে দুর্লভ বস্তু নয়। তোমাদের জনারণ্যে নিজস্বতা বোধ হারিয়ে গেছে। মনে হয় কবরস্থ হয়েছে। এখানে নিজস্বতা বোধ এখনো জাগ্রত। আপন সত্ত্বাকে কেউ গলাটিপে মারেনি। আমার এ সাম্রাজ্যই ভালো। আমি এ ছেড়ে কোথায় মরতে যাবো।' শাশ্বতী কথায় ফুলঝুরি ওড়াচ্ছে। তপ্ত বালুভরা কড়াতে যেন খই ফুটছে।

বললাম, 'বলে যাও। শুনতে মন্দ লাগছে না। আচ্ছা দেশ বিভক্ত হবার পর নিশ্চয়ই খুব অসুবিধার ভেতর পড়েছিলে।'

'প্রথম প্রথম অসুবিধে হয়েছিলো বৈকি। চৌদ্দপুরুষের ভিটেমাটি ছেড়ে, চোখে অসহায়তার দৃষ্টি নিয়ে, মুখমণ্ডলে দুশ্চিন্তার কালিমা লেপন করে, চরণে শঙ্কা জড়িয়ে, ছিন্নমূল মানুষের স্রোতের সঙ্গে আমিও ভেসে বেড়ালাম। দধিচীর হাড়ে দেবতারা বেঁচে ছিলো। নিহত হয়েছিলো বৃত্রাসুর। দুঃখকষ্টে অভিভূত লোকগুলো, এদের হাড়ে বাকী দেশের লোকগুলো বাঁচবে।'

'ফিরবে না দেশে? নিজের জন্মভূমিতে কোনোদিন?'

'যেদিন ওরা আদর করে ডেকে নিয়ে যাবে। সেদিন যাবো। তার আগে নয়।' বলে শাশ্বতী। সাইবেরিয়ার প্রান্তর থেকে উড়ে এসেছে বিহঙ্গেরা। হুইস্‌লিংটিল্‌ গার্গেনিটিল্‌, পিন্‌টেইলড্‌ পাখীর দল। এ ছাড়া আরে কতো পাখী। চড়ুই, বাবুই, ব্যাবলার, ফিঙে

পাখী জলের ধারে লম্বা খুঁটির ওপর বসে পুচ্ছ নাচাচ্ছে। সামনের বিরাট প্রান্তরটা দেখে শাশ্বতী বলে, 'জানো এই মুহূর্তে টলষ্টয়ের সেই বিখ্যাত গল্পটা মনে পড়ছে। মানুষের ক হাত জমির দরকার হয়? মাত্র সাড়ে তিনহাত। মনুষ্যরূপী শয়তানের কবলে পড়ে লোকটা বিরাট ফাঁকা প্রান্তরের ওপর দৌড় সুরু করেছিলো। যতোটা জমি দৌড়িয়ে সে পার হবে ততোটা জমি তার ভোগ দখলে আসবে। ভোর থেকে লোকটা দৌড়ুচ্ছে। যতো দৌড়ুচ্ছে ততোই জমির লিপ্সা বাড়ছে। আরো খানিকটা দৌড়ুলে আরো খানিকটা জমির মালিকানা স্বত্ব পাওয়া যাবে। আরো খানিকটা জমি চাই। মাথার ওপর মধ্যাহ্নের জ্বলন্ত সূর্য্য। লোকটা দৌড়ুচ্ছে আর দৌড়ুচ্ছে। মুখ দিয়ে তার ফেনা গড়াচ্ছে। ক্রমে ত্বকশ বেয়ে রক্ত গড়াতে সুরু করলো। তবু আকাঙ্খার নিবৃত্তি, পরিসীমা নেই। আশার শেষ নেই। আশা ছলনাময়ী। মানুষের রূপ ধরে শয়তান হাসছে। আরো জমি চাই। শেষ পর্যন্ত লোকটা মাটিতে গড়িয়ে পড়লো। রক্ত বমি করতে শুরু করলো সে। তবুও হামগুড়ি দিয়ে এগিয়ে যায় সে। আরো খানিকটা। আরো খানিকটা জমি। শেষ পর্যন্ত মরলো লোকটা। অতো জমির দরকার হলো না ওর। কবরের জন্য দরকার পড়লো মাত্র সাড়ে তিনহাত জমির। শূন্য বিরাট প্রান্তর পড়ে থাকতে দেখলে আমার ও গল্পটার কথাই মনে পড়ে।'

সমতলভূমি ছেড়ে পাহাড়ী পথে ওপরের দিকে জীপ্‌টা উঠছে। পাহাড়ী পথ চলার পক্ষে এখন মন্দ নয়। কিন্তু বর্ষাকালে ল্যাণ্ড স্লাইডের ভয়ে প্রাণটা কাঁপে। ভূমিকম্প লেগেই রয়েছে। লাগাতার ভূমিকম্পে পাহাড় ধ্বসে পড়ে। পাহাড়ের চাকলা খসে পড়ে। পাহাড়ী স্রোতস্বিনীগুলোর এখন মুখে রা'টি নেই। মাছটিও যেন উলটিয়ে খেতে জানে না। কিন্তু বর্ষাকালে তার কি রূপ! বাপ্‌। স্রোতস্বিনীর ওপর বেতের তৈরী ঝুলন্ত সেতুগুলো। নদীর

একতীর থেকে থেকে অন্যতীর পর্য্যন্ত। দু'তীরের গাছগুলোর সঙ্গে বেত দিয়ে বাধা রয়েছে। পাহাড়ী লোকগুলো অনেক কষ্টে নদী পার হচ্ছে।

'জানো শাশ্বতী, আমার একটা জিনিষ ভেবে খুব আশ্চর্য্য বোধ হয়। নেফার কতোকগুলো ট্রাইবের সঙ্গে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার এবং ছোটনাগপুরের ট্রাইবের যেমন নানা ব্যাপারে মিল রয়েছে তেমনি নাগাদের সঙ্গে উত্তর ফিলিপিনের লুজোন দ্বীপের কোনো কোনো ট্রাইবের সঙ্গে অদ্ভুত মিল আর সাদৃশ রয়েছে। সাদৃশ রয়েছে রীতিনীতি, হাবভাব এবং সামাজিক আদবকায়দায়। নাগা অধ্যুষিত অঞ্চল টুয়েঙ্সাঙ প্রথমে এই ফ্রন্টিয়ার ডিভিসানের সঙ্গে যুক্ত ছিলো। পরে চলে গেলো নাগা হিলসের সঙ্গে। ফ্রন্টিয়ার ডিভিসান ভেঙ্গে পাঁচ টুকরো হয়ে সৃষ্টি হলো কামেঙ, সুবণসিরি, সিয়াং, লোহিত আর টিরাপের, যাকে আজ তোমরা সংক্ষেপে নেফা বলো।' শাশ্বতী চুপ করে শোনে। পাহাড়ী মেয়েরা পাহাড়ের গায়ে শস্য বপন করছে। জানিনে ওদের সাজ সজ্জা কিসের ইঙ্গিত জানাচ্ছে। টিরাপে দেখেছি ওয়াংচু সর্দ্দারের মেয়ে মাথায় বড়ো চুল রাখে। অন্যেরা চুল ছোটা করে ছাঁটে। বিবাহিতা রমণীদের সাজসজ্জা পোষাক এবং গয়না অবিবাহিতা মেয়েদের চাইতে স্বতন্ত্র। শেরডুক্পেন্ ট্রাইবের ভেতর বিভিন্ন বয়সের মেয়েরা বিভিন্ন ভাবে চিকুর চর্চ্চা করবে। বিভিন্ন ধরণের খোঁপা বাঁধবে। বিনুনী রচনা করবে বিভিন্ন স্টাইলে। হয়তো তাই থেকে বয়সের আন্দাজ করা সহজ হবে। আগে কে জানতো যে ট্রাইবল মেয়ের বাহুতে গহনা না থাকলে বৈধব্যের ইঙ্গিত সূচনা করে।

শাশ্বতী বলে, 'আচ্ছা তোমার শান্তিধ্বজকে মনে আছে? শান্তিধ্বজ বাগচীকে?'

'হ্যাঁ খুব মনে আছে।'

'সেই কলেজের শান্তি। মনে আছে কলেজে প্রথমদিন এসে সংস্কৃতের মাষ্টার মশাইকে কি বলেছিলো ?'

'মনে পড়ছে না। মনে করিয়ে দাও।'

'সংস্কৃতের মাস্টার মশাই ওর নাম জিজ্ঞেস করেছিলো। ও দাঁড়িয়ে বললে, শান্তিধ্বজ মৈনাক বক্ষ বাগচী। তারপর ভাইদের নাম গড়গড় করে বললে। মৃণালধ্বজ সুঠামবক্ষ বাগচী। পরের ভাই ব্রজধ্বজ বিরাট বক্ষ বাগচী। তার পরের ভাই কপিধ্বজ কপাট বক্ষ বাগচী। বোনেদের নাম বলতে ছাড়লে না। টুন্‌টুন্ দি টানার। অন্য বোন, গুমগুম্‌দি গানার। পণ্ডিত মশাই চেয়ারে কাৎ হয়ে পড়ে গেলো।' হা হা করে হেসে ওঠে শাশ্বতী। 'বড্ডো ফানি ছিলো ছেলেটা। ব্রাইট্ বয়, হাসি খুশীতে ভরপূর। আমার পেছনে কিছুদিন ঘুরঘুর করেছিলো। অনেক আশা নিয়ে বোনটাকে ওর হাতে তুলে দিয়েছিলাম।' শ্বাশতী কিছুক্ষণের জন্যে চুপ করে। সেই ছেলেটা, আমাদের শান্তি বিয়ের কয়েক বছরের ভেতর কেমন যেন হয়ে গেলো। চাকরি বাকরি ছাড়লে। একদিন গঙ্গায় বান দেখতে গিয়েছিলো ওরা দুজন। শান্তি আর আমার বোন। একটা নীচু সিঁড়িতে ওরা দাঁড়িয়েছিলো। বানের জল বিশফুট উঁচু হয়ে তীরে এসে ধাক্কা দেয়। সিঁড়ি, কোঠাবারান্দার ওপর দিয়ে জল গড়িয়ে যায়। ওরা দুজনেই পালিয়ে যেতে চেষ্টা করে। শান্তি সিঁড়ি টপকিয়ে উঠে আসে। ওপরে ওঠবার আগে বোনটাকে ধাক্কা দিয়ে জলে ফেলে দেয়। বোনটা জোয়ারের জলে ভেসে যায়। কেউ টের পেতো না কোনোদিন। নদীর তীরে বসে থাকা পাগল গোছের লোকটা সব কিছু দেখেছিলো। অতো-গোলমাল চেঁচামেচির ভেতর এ দৃশ্য তার নজর এড়ায়নি। লোকটা আমাকে সব বলেছিলো। পরের দিন গিয়ে লোকটার আর খোঁজ পাইনি। এরপর কোনো দিনই আর তার খোঁজ খবর পাইনি। শান্তি কেন একাজ করলে ঠিক বুঝি উঠতে পারলাম না।' এর

ভেতর শাশ্বতী আরো কয়েক পেগ মদ গলায় ঢেলেছে। ওর হাত ধরে আর খেতে বারণ করলাম। অদ্ভুতভাবে হাসছে শাশ্বতী। 'জানো। সারাটা জীবন সংগ্রাম করেছি। ঠকেছি পদে পদে। তাই এখন আত্মগোপন করেছি নেক্সার জঙ্গলে।'

'কিন্তু তাই বলে এতো মদ গেলার যুক্তিকে তুমি দাঁড়া করাতে পারছো না।' বলি আমি।

'পারবোই না কেন। মদ না খেয়ে উপায় আছে। সব কিছু ভোলবার অন্য রাস্তাটা বাতলাতে পারো? ফ্রাস্ট্রেশান্ আর ফ্রাস্ট্রেশান্। ওর হাত থেকে মুক্তি নেই। মুক্তি পাবোনা কোনদিন। বাবার অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে শাড়ীতে কেরোসিন ঢেলে মা জ্বলে পুড়ে মরলো। তখন আমি কিশোরী। ঘুম ভেঙ্গে দেখলাম মার সারা শরীরে আগুণ জ্বলছে। মার আর্তনাদ শুনলাম। আগুন নেভানো হলো। কিন্তু জ্বলে পুড়ে যাওয়া জীবের কি করুণ কান্না, দাপানি আর গোঙানী। কখনো স্মৃতিপটে ভেসে উঠলে শিউরে উঠি। দুঃস্বপ্ন বলে মনে হয়। বাঁচানো গেলোনা মাকে। এরপর বাবা বন্দুকের নল মুখে পুরে গুলী ছুঁড়লেন। আমি মাত্র কলেজ থেকে বের হয়েছি। বাবার মৃত্যু হলো। আমাদের সহায় সম্বলহীন অবস্থা। তোমার বোধ হয় কিছু অজানা নেই। তুমি সবকিছু শুনেছিলে সেদিন। হতাশায় ভেঙ্গে পড়লাম। ইউনিভার্সিটিতে একটা ফার্স্ট ক্লাশের লোভ দেখালো প্রবীণ, বিচক্ষণ, জ্ঞানী, গুণী প্রফেসর। বিদ্যের দৌড় অনেকদূর। তার বুদ্ধির দীপ্তি আর চমক আমার দৃষ্টি বিহ্বল করেছিলো। ফার্স্ট ক্লাসের লোভ দেখিয়ে আমার কাছ থেকে প্রফেসর অনেক কিছু কেড়ে নিলে। আমার যৌবন, মান, সম্মান পথের ধূলোয় গড়াগড়ি খেলো। সম্বল রইলো প্রবঞ্চনা। আর নিষ্ঠুর ছলনা। এক মানসিক ক্লেশ দেহ মনকে পঙ্গু করে ফেললে। ফার্স্ট ক্লাশ ঘরে এলো না। প্রফেসর আমাকে একটা জীর্ণ ময়লা কাপড়ের

মতো পথের ধুলোয় ফেলে দিলো। ফাস্ট´ক্লাশ পেলো সীমা। ওর বোধ করি যৌবনের সীমা পরিসীমা ছিলোনা। অঢেল, অফুরন্ত যৌবন। ও মীমাংসা করতে জানতো। জোড়াতালি দেওয়া ভাঙ্গা ছাতা নিয়ে ঝড় বাদলার মুখোমুখি হতে জানতো। জলের কলে জল না বেরুলে, ফুটো ছাদ থেকে গড়িয়ে পড়া বৃষ্টির জল দিয়ে কাজ সারতে জানতো। ও দিতে জান্‌তো। নিতেও জান্‌তো।' লেন্‌-দেনের কারবারে পাকা ব্যবসায়ী।'

খামতি পোর্টারদের দল মাথায় মাল নিয়ে পাহাড়ী পথে চলেছে। লোহিতে তাঁরাও, মিজু আর ইদু মিস্‌মী ছাড়াও রয়েছে সিংফো আর খামটি ট্রাইব। খামটিরা অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ব্রহ্মদেশের সান্‌ স্টেট্‌ থেকে এসেছিলো। আর সিংফোরা উত্তর ব্রহ্মদেশের কাচিনদের একটা শাখা ছিটকে বের হয়ে এসেছিলো।

'আমাদের শেষ পিক্‌নিক্‌টার কথা মনে আছে? যেটা আমরা হাজারিবাগের জঙ্গলে ব্যবস্থা করেছিলাম। মেয়ে আর ছেলে মিলে কলেজের প্রায় জনা বিশেক লোক জড়ো হয়েছিলাম। খুব দাওয়া দাওয়া হয়েছিলো। আর প্রচুর স্ফুর্তি হয়েছিলো।'

'মনে আছে।' বলে শাশ্বতী।

'তোমাকে কিছুতেই খুঁজে পাচ্ছিলাম না। অনেক খোঁজ করবার পরে তোমাকে একটা ঝোপের ভেতর পেলাম। বীরেশের হাঁটুর ওপর মাথা রেখে তুমি শুয়েছিলে। বীরেশ তোমার মাথায় শরীরে হাত বোলাচ্ছিলো।'

'হ্যাঁ মনে আছে। তুমি তাই দেখে পালিয়ে এসেছিলে। সাহস হয়নি আমার মুখোমুখি দাঁড়াবার। ভীরু, কাপুরুষ সেজে চম্পট দিলে।'

'তুমি বলো ও দৃশ্য দেখার পর কেউ নিজেকে ঠিক রাখতে পারে। না কারু ভালো লাগে কিছু। আমি সত্যি বলছি আমার সেদিন যথেষ্ট হিংসে হয়েছিলো।' আমি নিঃসঙ্কোচে বলি।

'সেদিন খানিকটা সময় দাঁড়িয়ে থেকে যদি আমার অবস্থাটা বুঝবার চেষ্টা করতে তবে বোধ করি ভালই হতো। হিংসে অভিমান কর্পূরের মতো উবে যেতো। মেয়েটা গ্যাস্ট্রিকের ব্যথায় মারা পড়ছিলো। প্রায় অজ্ঞান হবার অবস্থা। ভাগ্যিস বীরেশ ধারে পাশে ছিলো। নইলে কি যে হতো। বীরেশ সেদিন যথেষ্ট সেবা শুশ্রূষা করেছিলো। তোমার মতো তার মনেও খানিকটা অভিমান ছিলো। তাকে আমি অবজ্ঞা দেখিয়েছি। দূরে সরিয়ে দিয়েছি অনেকবার। কিন্তু সেদিন সে পালিয়ে যায়নি। এগিয়ে এসেছিলো। বীরেশের ছিলো সেবা করবার আকাঙ্ক্ষা। তোমার ছিল শুধু দ্বেষ আর হিংসে। অভিমান আর অহঙ্কার। তোমার ভেতর মহৎ গুণগুলো সেদিন মাথা গুঁজে মুখ লুকিয়েছিলো।' আরো মদ খেলো শাশ্বতী।

'বন্ধ করো তোমার এ ছেলেমানুষী। ভুলে যেয়োনা তুমি মেয়েছেলে। জীপের স্পীড্ কমাও। এ তোমার শোভা পায় না। যতোই থাক তোমার দুঃখ কষ্ট। ভুলে যেয়ো না এ দুর্গম পথে বিপদ ওৎ পেতে রয়েছে। আমাদের জীবন বিপন্ন হতে পারে।'

'তাই নাকি? কেমন যেন ব্যঙ্গের সুরে কথা বলে শাশ্বতী। ষ্টিয়ারিং হুইল ধরে থাকা হাতটা কাঁপছে।

'মরতে এতো ভয় পাও তুমি।' বলে শাশ্বতী।

'নাটকীয় ঢংএ কথাবার্তা বলা বন্ধ করো তুমি। গাড়ীর স্পীড্ কমাও।' আমি দৃঢ় কণ্ঠে বলি। শাশ্বতী কি পুরোপুরি মাতাল হলো? মনে প্রশ্ন জাগে।

'জানো বাবার রক্ত দূষিত ছিলো। হ্যাঁ। বিশ্রী রোগ। আমাদের শরীরে ঢুকে গেলো রোগের বীজগুলো। মা প্রথমেই আক্রান্ত হয়েছিলো। এসে গেলো টেম্পোরারী ইন্স্যানিটি। পাগলামীর বীজ আমায় রক্তে ও রয়েছে। মাঝে মাঝে পাগল

হই। নিজে বুঝতে পারিনে। কয়েকদিন পাগলামী করি। আবার ভালো হয়ে উঠি। সুস্থ হয়ে উঠি। অনেক ডাক্তার দেখিয়েছি। প্রচুর ওষুধ খেয়েছি। হয়নি কিছু। টেম্‌পোরারি ইন্‌স্যানিটি। এ রোগ সারবার নয়। উন্মাদ হতেই বা কতোক্ষণ আর ভালো হয়ে যেতেই বা কতোক্ষণ। ফ্রাস্‌ট্রেশান্‌ এ্যাণ্ড ফ্রাস্‌ট্রেশান্‌। আমার পেছন দিকে অন্ধকার। সামনের দিকে ঘোর অন্ধকার। মাঝখানে আমি। পরাজিত, লাঞ্ছিত, বঞ্চিত পরিত্যক্ত। আশা আকাঙ্খার সর্বাঙ্গে মেখেছি কালিমা। বাইরে খোলসটা হয়েছে জীর্ণ, দীর্ণ, অন্তরটায় ঘুণ ধরেছে। দেহটাকে যেন আর টানতে পারছিনে। ক্লান্ত। আমি ক্লান্ত। কি নিয়ে আমি থাকবো বলতে পারো? তুমি বলছো মদ খাও কেন? মদ না খেয়ে কি করবো? সংসারটা তাসের ঘরের মতো ভেঙ্গে পড়লো। সবাই ঠকালে। পদে পদে আমি ঠকলাম। স্নেহ, মায়া, মমতা, প্রীতি, প্রেম, ভোগ, সুখ, কামনা, বাসনা সব কিছু পড়ে পড়ে মার খেলে। লোকগুলো মুখ ফিরিয়ে রইলে। ভগবান বিমুখ হলেন। অদৃষ্ট হলো নির্মম আর নিষ্ঠুর। একটা মেয়েকে পরাজিত করবার জন্যে চললো চক্রান্ত আর ষড়যন্ত্র। অদৃশ্য হস্তের নিপীড়ন। নিয়তির নিষ্ঠুর পরিহাস।'

'তুমি অনেক বকেছো। এবার চুপ করো'। আমি বলি।

'চুপ করবো।' হা হা করে হেসে ওঠে শাশ্বতী। মনে হলো এ সুস্থ লোকের হাসি নয়। একটা উন্মাদই হাসছে যেন।

'একেবারে চুপ করিয়ে দেবার অপচেষ্টা চলেছে বহুদিন থেকে।' শাশ্বতীর কথাবার্তার ধরণ ধারণটা যেন ক্রমশঃ বদলাচ্ছে।

'সবভুলে গিয়ে সুস্থ মন মেজাজ নিয়ে সামনের দিকে তাকাও।' আমি শাশ্বতীর মাথায় পিঠে হাত বোলাতে থাকি। জানিনে ক্ষতটাতে সান্ত্বনার প্রলেপ দিতে চেষ্টা করি কিনা।

'জানো, শাস্তিটা শুধু শুধু আমার বোনটাকে মারলে। পরে শুনেছিলাম সে নাকি অন্য মেয়ের প্রেমে পড়েছিলো। আমি শান্তির জন্যে আনক কিছু করেছিলাম।' বলে শাশ্বতী।

'কাপুরুষ। নেমকহারাম।' আমার কণ্ঠ থেকে বেরোয়।

'কে কাপুরুষ? নেমকহারাম?' জিজ্ঞেস করে শ্বাশতী।

'কেন শান্তি?' বলি আমি।

'আর তুমি? তুমি কাপুরুষ নও? নেমকহারাম নও।' শাশ্বতী একথা বলার সঙ্গে সঙ্গে আমি চমকে উঠি। জীপের সীটে নড়ে চ'ড়ে বসি। ওর মাথা থেকে হাত নামিয়ে নিই। ওর চোখের দিকে তাকাই। মনে হয় ওর চোখে কেমন যেন একটা উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি। চোখ দুটো জ্বলছে।

'আমি কাপুরুষ। আমি নেমকহারাম। এ তুমি কি বলছো শাশ্বতী।'

'ঠিক বলছি। কিছু মনে পড়ে না। সব বেমালুম ভুলে বসে আছো। আমাকে একলা ফেলে, বানের জলে ভাসিয়ে দিয়ে, লজ্জা কলঙ্ক দিয়ে সারা অঙ্গ মুড়ে দিয়ে পালিয়ে গেলে। শান্ত সুবোধ ছেলেটি সেজে গুটি গুটি নিজের গর্ত্তে গিয়ে ঢুকলে। বেরিয়ে এসে বুক ফুলিয়ে দাঁড়াবার সাহস তোমার হলো না। কাঁধে বোঝা তোলবার সৎ সাহস হারালে। কে তোমাকে কি বললে্। কি বোঝালে। কাদের কথায় তুমি নাচলে তুমিই বলতে পারবে। তুমিই জানো সে কথা। শেষ পর্যন্ত পেছপা হলে তুমি। বৃথাই ম্যারেজ রেজিষ্ট্রেশন্ অফিসে বসে সারাটা দিন আমি হাই তুললাম। অপেক্ষায় অপেক্ষায় ঝিমিয়ে পড়লাম। রেজিষ্ট্রেশন্ অফিসার আমার সঙ্গে ঠাট্টা তামাশা করলে, বিদ্রূপ বাণ ছুঁড়লে। ওৎ পেতে ছিলো। সময় সুযোগ বুঝে নিজের সাহচর্য দেবার জন্যে অধীর আগ্রহ প্রকাশ করলে। ভাবলে এ মেয়ে সহজলভ্যা। এ হয়তো সঙ্গ পেলে খুশী হবে। এ মেয়ে রেজিষ্ট্রেশন অফিসে এসে

জামাই এর খোঁজে বসে থাকে। হা পিত্যেস্ করে। পুরুষসঙ্গ এ চেয়েও পায় না। একে ঘরে তুলতে কেউ চায় না। তুমি আমাকে কথা দিয়ে শেষ পর্য্যন্ত এলে না। তুমি আমাকে স্ত্রীর মর্য্যাদা দিতে পেছপা হলে।' শাশ্বতী একটু থেমেছে। হাঁফাচ্ছে সে।

'একি শাশ্বতী। গাড়ীর স্পীড্ কমাও। জীপ্ ওপথে নিয়ে চলেছো কেন? শোনো, আমার কথা শোনো। আমি সব বলছি। সব খুলে বলছি।' শাশ্বতী জীপ্ খাদের দিকে চালিয়ে দিয়েছে। পাহাড়ী পথ। হাজার দেড় হাজার ফুট নীচে স্রোতস্বিনী বয়ে চলেছে। 'হা হা হা।' শাশ্বতীর হাসিতে আকাশ বাতাস ভরে ওঠে। এ পাগলের হাসি। ওর চোখে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ। মনে নিশ্চয়ই ঝড়ের মাতামাতি।

'শাশ্বতী, কারণ একটা ছিলো। তোমাকে বলছি সবকিছু।

'কোনো কারণ ছিলোনা। আমি বিশ্বাস করিনে কিছু। তুমি সেদিন আমার সঙ্গে অপূর্ব খেলা খেলেছিলে। আজ আমাকে একটু খেলা খেলতে দাও। সেদিন তুমি দাবার চাল চেলেছিলে। আজ আমাকে দাবার চাল চালতে দাও। আজ এই লগ্নে, এই শুভ মুহূর্তে আমি এক নূতন খেলায় মাতবো। ধৈর্য্য ও তিতিক্ষার পরীক্ষা শেষ হয়েছে। এবার। এবার।' আমি শাশ্বতীর হাত চেপে ধরেছিলাম। পরে জীপের ষ্টীয়ারিং হুইল ধরে জীপের মুখ ঘোরাতে চেয়েছিলাম। সঙ্গে সঙ্গে চেয়েছিলাম জীপের গতি সংযত করতে। কিছু করতে না পেরে শেষপর্য্যন্ত চলন্ত জীপ থেকে মাটির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লাম। পথের ওপর অনেকক্ষণ অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলাম। পরে মিস্‌মী ছেলেমেয়েরা আমাকে পথ থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে আমার জ্ঞান ফিরিয়ে এনেছিলো। অজ্ঞান হবার পূর্বমুহূর্তে স্পষ্ট দেখতে পেয়েছিলাম জীপটা জমি থেকে কয়েক ফুট লাফিয়ে উঠেছে তারপর শাশ্বতীকে নিয়ে গড়াতে গড়াতে

বহু নীচে নেমে গেলো। পরমুহূর্তে সব অন্ধকার। শুধু অন্ধকার। শাশ্বতী মিটার। নেফার বোটানিস্টের অপমৃত্যু ঘটলো। টেমপোরারি ইন্‌স্যানিটি থেকে চির মুক্তি পেলো সে।' সঞ্জয় সমাদ্দারের কাহিনীর এখানেই শেষ। রহস্যময়ী নেফা, তোমাকে কোনোদিন ভুলতে পারবো না।

শেষ